আসাম পর্য্যটক—

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত

ঘাটেশ্বরা, জেলা—২৪ পরগণা

১৩৩৯—জ্যৈষ্ঠ

[প্র]থম সংস্করণ]

[আড়াই টাকা

উপক্রম

মানুষের পক্ষে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার বিষয়। আদিম কাল হইতে এ পর্য্যন্ত জীবন-ধারার বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশের ইতিহাসের অপেক্ষা মহত্তর, বিস্তৃততর, গভীরতর অথচ কৌতুককর এবং প্রীতিপ্রদ এবং লাভজনক বিদ্যা আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের এই গ্রন্থকার শ্রীযুত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইলেও তাঁহার এই নূতন পুস্তকখানি আমাদের প্রিয়তম জন্ম-ভূমির একটি অংশের অধিবাসী কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নর-নারীর জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতির চমৎকার চিত্রাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার বাঙ্গলা সাহিত্যে এক নূতন এবং বিশিষ্ট পথের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পাঠক-পাঠিকাবর্গের জ্ঞান এবং আনন্দ বৃদ্ধির সুন্দর সাহায্য করিয়াছেন। আমরা সানন্দ এবং সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

স্বদেশ অথবা বিদেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব, সামাজিক রীতি-নীতির রহস্য, অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মবিনির্ণয়ের ধারা নিপুণতার সহিত বিস্তৃতভাবে অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন, অনুসন্ধান, এবং আলোচনা করিয়া তাহার ফল দেশবাসিগণের সম্মুখে মাতৃভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে যে অধিক নাই, তাহা সকলেই জানেন। আর, বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সকল বিষয়ের যে দুই এক খানি পুস্তক আছে, সেগুলিও প্রায়ই কোনও না কোন বিদেশী পণ্ডিতের সংগৃহীত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই রচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, নিজের

চক্ষুতে দেখিয়া, নিজের কানে শুনিয়া এবং নিজের মনে স্বাধীনভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া কোনও নিকটস্থ বা দূরবর্ত্তী দেশ বা প্রদেশের অধিবাসীদিগের সামাজিক অথবা ধর্ম্মনৈতিক জীবনযাত্রার পরিচয় জনসাধারণের নিকট যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ লেখক আমাদের দেশে দুর্লভ বলিলেই চলে। দেশী বা বিলাতী কোন বিরাট বিশ্বকোষ (Encyclopædia) বা তজ্জাতীয় গ্রন্থাবলী কিংবা কোনও এক বা ততোহধিক বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির লিখিত কোনও পুস্তক বা প্রস্তাব হইতে মাল মশলা সংগৃহীত করিয়া এবং তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরস্থিত এবং সাধারণের অজ্ঞাত এবং অপরিচিত কোনও দেশ, দ্বীপ বা জনপদের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক অবস্থার পরিচয় এবং প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলী ছাপাইয়া সাধারণের বিস্ময় উৎপাদন অথবা প্রশংসা উপার্জ্জন করা আদৌ যে কঠিন কাজ নহে, এবং প্রচলিত মাসিক পত্র-পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই যে সেই শ্রেণীর কোনও না কোন প্রবন্ধ আলোক-চিত্রে সুভূষিত হইয়া বাহির হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু আমাদের নিকট প্রতিবেশী বাগদি এবং বাউরি প্রভৃতি জাতির ভিতরে যে সকল বিশেষ বিশেষ ধার্ম্মিক এবং সামাজিক প্রথা, প্রবাদ, অনুষ্ঠান, ছড়া, মন্ত্র-তন্ত্র এবং গান-বাজনা আদিমকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের প্রকৃত এবং নিগূঢ়রহস্য আমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই জানেন। কীর্ত্তিকুশল এবং স্বনামধন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত নিজের শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা এমন কি প্রাণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ এবং তাহাদের অপেক্ষাও ভয়ানক জিঘাংসু সশস্ত্র অসভ্য জাতির বিষদিগ্ধ অস্ত্রাঘাত

এবং সাংঘাতিক সংক্রামক বিবিধ ব্যাধির ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পাহাড় পর্বত এবং জল-জঙ্গলপরিপূর্ণ দুর্গম ও অপরিচিত প্রদেশের জন-বিরল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তথাকার উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর অধিবাসীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করত তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নানাবিধ ধার্মিক এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারের প্রকৃত এবং নিগূঢ় সংবাদ সংগ্রহ করিবার পর, সরল সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সেইগুলিকে সাহিত্যের রুচিসঙ্গত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ পরিশ্রমী এবং সত্যনিষ্ঠ কোনও সুলেখক বাঙ্গলাদেশে আছেন, আমরা জানিতাম না। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া শুধু যে আমাদের অজ্ঞানতা দূর করিয়া দিয়াছেন তাহা নহে; পরন্তু, তিনি তাঁহার প্রাণপাত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমাদের আনন্দলাভের সহিত অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; এবং তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার নিকট আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

প্রাচীন যুগের প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মধ্যযুগের কামরূপ এবং বর্ত্তমান কালের আসাম আমাদের বাঙ্গালা দেশের পূর্বোত্তর সীমান্তে অবস্থিত সুতরাং প্রতিবেশী প্রদেশ হইলেও বাঙ্গালীদের মধ্যে অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সাক্ষাৎ সম্পর্কে উক্ত দেশের প্রকৃত পরিচয় অবগত আছেন। মধ্যযুগ হইতে গিরি-দরী-নদ-নদী-কানন-কান্তারপরিপূর্ণ দুর্গম এবং বিকট ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাকিনী যোগিনীদলের উৎকট মন্ত্র তন্ত্রময়ী এবং মোহিনী-মায়া-পরিপূরিত জাদুবিদ্যার দেশ সুতরাং বিস্ময় ও বিভীষিকার ক্ষেত্র 'কাঙুর' বা কামরূপ, শুধু বাঙ্গালা বলিয়া নহে পরন্তু সমগ্র ভারতখণ্ডে, একটা বিশেষরূপ অখ্যাতিলাভ করায়,—এমন কি "মানুষ তথায় একবার পদার্পণ করিলেই ডাকিনী যোগিনীদের মায়ায় সত্বই ভেড়ায় পরিণত হইয়া যায়" এইরূপ

একটা উৎকট জনপ্রবাদ সাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত থাকায়,—খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদ অথবা ঐ প্রদেশে ইংরেজী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত ক্বচিৎ দুই একজন তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনার দ্বারায় অতি অমানুষ দৈবশক্তিলাভ-লোলুপ এবং অসম-সাহসিক সাধু-সন্ন্যাসী ভিন্ন সাধারণ শ্রেণীর লোকের প্রায় কেহই তথায় যাইতেন না। ইংরেজের রাজত্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর আলোকের প্রভাবে পথের দুর্গমতা, পথিকের প্রাণের আশঙ্কা, মনের ভয় এবং কুসংস্কার অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে সত্য, তথাচ সাধারণ লোকেরা বঙ্গদেশের নিকটবর্তী গৌহাটী মহকুমায় অবস্থিত শ্রীশ্রীকামাখ্যা মহাপীঠ এবং ধনবান্ সুসভ্য সজ্জনেরা রাজধানী এবং স্বাস্থ্যনিবাস দেবদারুতরুবীথিশোভিত সুন্দর শৈলনগর শিলঙ ভিন্ন দূরপ্রসারিত উপর-আসামের বহু স্থানের সম্বন্ধে কোন সংবাদই কেহ বড় একটা রাখেন না। অথচ, অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রাচ্য ভারতের প্রত্যন্তস্থিত এই প্রদেশের গ্রামে গ্রামে একদিকে যেমন অত্যুন্নত আর্যসভ্যতার অবিসংবাদী দায়াদ স্বধর্মনিষ্ঠ এবং সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক দ্বিজগণের বাস রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই আবার অসুর, দানব এবং কিরাতাদি নানাপ্রকার প্রাচীন এবং আবর, কুকি, নাগা এবং মিশমী প্রভৃতি নূতন নামে পরিচিত আদিম এবং হীন হইতে হীনতর নানাপ্রকার স্তরের পর্বতীয় অথবা আরণ্য অসভ্য মানব-সম্প্রদায় ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অথচ স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের নির্বাচিত নিরাপদ আশ্রয়স্থানসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পশুপ্রায় আদিম অসভ্যাবস্থা হইতে মানবের সভ্যতা কুটিল গতিতে এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ বিকসিত এবং পরিণত হইতে হইতে এবং উচ্চ হইতে

উচ্চতর বহু স্তর অতিক্রম করিয়া তবে তাহার আধুনিক উন্নত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে সকল তত্ত্বান্বেষী জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি উক্ত ক্রমবিকাশের এবং তাহার পরিণতির বিবিধ স্তরে মানবের জীবনযাত্রার নানাবিধ ঋজু বা কুটিল বৈচিত্র্যময় রূপ এবং গতির আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, ধার্মিক ও সামাজিক বিবিধ রীতি-নীতির এবং আচার-ব্যবহারের তন্ন তন্ন ভাবে অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং আলোচনা করিতে কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে আসাম প্রদেশের ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা উপত্যকা এই দুই বিভাগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ক্ষেত্র সমগ্র ভারতখণ্ডের মধ্যে আর একটি খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব না হউক, দুর্লভ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের এই যুবক গ্রন্থকার নিজের সর্বপ্রকার শারীরিক এবং মানসিক সুখ-সুবিধা, স্বচ্ছন্দতা এবং বিপৎপাতের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না রাখিয়া, বহুসময়ে দুর্গম আরণ্য এবং পার্বত্য প্রদেশের শত শত চতুষ্পদ পশু অপেক্ষাও হিংস্রতর স্বভাবের বর্বর মানুষ এবং তাহাদের অপেক্ষাও ভয়াবহ বিষধর সর্পসরীসৃপ-জলৌকা-কীটপতঙ্গাদি প্রাণী এবং সর্বোপরি ভীষণ অদৃশ্য অথচ সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বর, কালা-আজার এবং উদরাময় প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার আক্রমণে প্রতিমুহূর্তে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কাকেও তুচ্ছ করিয়া, এবং যৌবনের শত শত সুখস্বপ্নকে নির্মমচিত্তে বিসর্জন দিয়া, জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বহুবৎসর ধরিয়া সেই বহুবিস্তৃত প্রদেশের প্রাচীন এবং নবীন "হিন্দু" নামে পরিচিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত বা তাহার সহিত অচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট বৈবাহিক ও তদ্রূপ অন্যান্য গৃহ্য-সংস্কার এবং আরাধ্য দেব-দেবীর পূজা, পিতৃ-পুরুষের সেবা, এবং

শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ধার্মিক কর্তব্যপালন প্রভৃতির বিচিত্র অথচ রহস্যপূর্ণ আচার, অনুষ্ঠান এবং তাহাদের সুস্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন্ন পরিবর্তন এবং পরিণতির অসংখ্য সূক্ষ্ম গতিবিধির রহস্য স্বয়ং অগাধ ধৈর্য, অপরিমেয় পরিশ্রম, অবিচলিত শ্রদ্ধা অথচ বিশেষ সতর্কতার সহিত এবং সুনিপুণভাবে, অথচ কাহারও মনে কোনরূপ দ্বিধা, দ্বেষ বা সংশয় না জন্মে সে বিষয়ে সর্বদা সাবহিত দৃষ্টি রাখিয়া এবং অতিশয় কৌশলের সহিত স্বাভিলষিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে ছোট বড় প্রত্যেক আবশ্যক তথ্যগুলিকে সংগ্রহ, স্বয়ং নিগূঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দ্বারা সংগৃহীত সংবাদগুলির সমালোচনা করিবার পর, তাঁহার নিজের অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার ফলে উপার্জিত এবং পরিশ্রমলব্ধ যাবতীয় তথ্যগুলিকে দেশপ্রচলিত প্রাচীন এবং নবীন শাস্ত্রাদেশ এবং পরম্পরাগত শিষ্টাচারের সহিত সযত্নে একে একে তুলনা করিয়া এবং মিলাইয়া লইয়া তবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ধৈর্য, উৎসাহ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং পর্যালোচন শক্তির পরিমাণ ও প্রসারের বিষয়ে চিন্তা করিয়া প্রকৃতই আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সুসভ্য পাশ্চাত্য ভূভাগে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাত্নতত্ত্বিক সভা এবং ভূগোল ইতিহাসাদির গবেষণা-সমিতি প্রভৃতি ধনজনসহায়সম্পৎ-পরিপূর্ণ সুসংহত এবং সঙ্ঘবদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী যেরূপ কার্য করিয়া সমগ্র বিশ্বে শিক্ষাবিস্তারের সাহায্য করিয়া যশোমণ্ডিত হইতেছেন, আমাদের দীনা মাতৃভূমির দরিদ্র অথচ সহায়-সম্পত্তিবিহীন এই যুবক সন্তান নিজের অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা মাত্রকে মূলধনস্বরূপ আশ্রয় করিয়া একাকী বহুধনজনসাহায্যসাধ্য এই দুষ্কর কার্য করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, গ্রন্থকারের স্বদেশবাসী উন্নত এবং উদারহৃদয় বিদ্যোৎসাহী এবং গুণগ্রাহী সজ্জনবৃন্দ তাঁহার প্রাণপাত এই পরিশ্রমের যথোপযুক্ত মর্যাদা এবং

পুরস্কার প্রদান করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন। তাঁহাদের উৎসাহ পাইলে তিনি যে তাঁহার আরব্ধ কার্য আরও সুষ্ঠুতর এবং সম্পূর্ণতররূপে সুসম্পন্ন করিয়া মাতৃভাষার সাহিত্যকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান যুগে—"মানুষের পক্ষে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষণীয় বিষয়"—এই নীতি প্রত্যেক সুসভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত এবং সুগৃহীত হইয়াছে এবং সর্বত্রই মানবতত্ত্বশাস্ত্র বা নর-বিজ্ঞানের (Anthropology) অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে অথবা হইতেছে। সুখের বিষয়, আমাদের কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়েও উহার নিয়মিত পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত মানবতত্ত্ব বিদ্যার উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত, শিক্ষণীয় মূলসূত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হওয়ায় উহা উক্ত পরীক্ষার্থী বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিলে যে কোন বিদ্যার উপদেশ যে বিদ্যার্থিবর্গের পক্ষে অনেক পরিমাণে সুগম এবং সহজবোধ্য হয়, তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, উক্ত বিভাগের অধ্যপক এবং ছাত্রছাত্রীগণ এই গ্রন্থকারের রচিত পুস্তকের অধ্যাপনা এবং অধ্যয়ন করিলে তাঁহাদের নিজের উপকার ও সাহায্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারকেও উৎসাহিত এবং অনুগৃহীত করিতে পারিবেন,—বিস্তরেণালম্।

ভারতী ভবন,
কোচবিহার রাজধানী।
শ্রীশিবচতুর্দশী তিথি,
সংবৎ ১৯৮৭।

ভারতীভূষণোপনামক
(স্বাক্ষর) শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত

University of Calcutta.
July 18th, 1930.

Foreward

All over India the Social Customs are undergoing a rapid change under the impact of European Civilisation. Assam is less changed than most of the other provinces, but here also with the rapid spread of education, the ancient manners and customs are fast disappearing. It has become urgently necessary, therefore, to record thes customs before they die out. Mr. Bijay Bhushan Ghose Chaudhuri, therefore, deserves the best thanks of all students of Social Anthropology for the great trouble that he has taken in giving an accurate account of the marriage customs of the Assamese people. Some of the elements of the Assamese marriage rites, no doubt, owe their origin to the many Mongoloid and other primitive people in the country ; but the ceremonies, in the main, appear to be Aryan, or rather, Brahmanical. There are very good reasons to think that the Indo-Aryans had settled over a large part of the country in very early times. From the Mahabharata it appears that Pragjyotisha or Kamarupa was occupied by a people with Brahmanic culture. In my opinion the whole of Northern India was known to the Vedic Aryans ; does not Rigveda itself speak of the Vedic Munis roaming at pleasure over the country stretching from the 'Purva' or the Eastern Ocean to the 'Apara' or the Western Ocean ? The Vedic Dharma Sutras again, speak of the whole of the area having the Indus as its western

boundary, and extending up to the region where the Sun rises, as included in the 'Aryavarta' or Vedic Aryandom. Palakapya-Muni of the well-known Vedic gotra or family of the Kapyas, composed the 'Hastyayurveda-Sutra', the earliest Indian work on elephants, in the country through which the Lauhitya (Brahmaputra) flows to the sea. Kautilya, in the fourth century B. C. also speaks of Assam as 'Para-Lauhitya', or the 'Trans-Brahmaputra country'. In later times, we find Yuan Chwang a guest at the court of King Bhaskara-Varman of Kamarupa ; evidently, therefore, a great part of Assam had formed an integral part of Brahmanic India before the Ahoms arrived there under Chukupha at the beginning of the thirteenth century. For a time this Mongoloid influence predominated, but Brahmanic missionaries soon made their appearance, and converted the new arrivals to one or other form of Hindu faith.

The culture of Assam is therefore built upon a very ancient Indo-Aryan nucleus, upon which was imposed, for a time, the culture of the Mongoloid immigrants, which, however, soon lost itself in the great Synthesis called Hinduism. Besides, there is the Pre-Dravidian element, manifest in the somatology and culture of many of the primitive tribes, and lately, Dr. J. H Hutton has discovered traces of the presence of a Negrito people and culture in Assam. It is not a very easy problem to analyse the different streams of culture that have entered into a compound to produce the culture that we find today

in Assam and the difficulty is enormously increased by the absence of a trustworthy and unsophisticated account of the social institutions as they are found among the people. This want is considerably removed, so far as the marriage customs of a large section of the Assamese people are concerned, by this valuable monograph (*Asamiya Hindudiger Vivahapaddhati*) of Mr. Ghosh Chaudhuri. The author has taken immense pains, as a cursory look over the book will convince every one, to collect accurate facts from many sources. He has also made many valuable comparisons with the marriag customs of Bengal with which Assam has many things in common. The old marriage songs collected by him n the fourth chapter of this book acquire a special value rom the fact that the language in which they are worded shows an affinity with the Maithil language whose influence is also visible in early Bengali literature.

This book will be of immense help to the students in the Anthropology Classes of the Calcutta University who will get here, within a short compass, an accurate account of one of the most important Social institutions of a country where many streams of Indian culture have met, and I have the greatest pleasure in introducing this worthy book to the reading public of India.

(Sd.) H C. **Chakladar,** M A.
Lecturer in Anthropology and ancient Indian History—Calcutta University.

সূচীপত্র

আসাম ও বঙ্গদেশের হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ১—৩৬০

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ক্ষেণ, কোচ ও রাজবংশী

বিশেষ ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	টুপি	তুপি
২২	বরে ষুয়া ...	বর শুয়া
৩৬	ডামলি ভার	ডাবলি ভার
৪৭	হোমাগ্নি ক্রিয়া	হোমক্রিয়া
৬১	গোপিনীদিগের	গোপীদিগের
৬২	প্রধূমিত ...	প্রশমিত
১৪৯	চারিজনে	চারি জনের
১৫১	দুর্গা ...	দুনা
১৬২	বৈশ্যখন্দ বণিক্	বৈশ্যখণ্ড সাহা
১৬৩	শণ্ডি বণিক্	ষণ্ডি খণ্ড বণিক্
১৭৩	দক্ষিণ প্রান্ত ...	মধ্য-ভাগ
১৭৬	কে, সি, আই,	সি, আই, ঈ
১৮১	সূররাজ বংশ	শূররাজ বংশ
১৮৪	আগেমদ ...	অগমদ
১৯৩	কমতাপুর	কামতাপুর
১৮৪	আগেমদ ...	অগমদ
১৯৩	কমতাপুর ...	কামতাপুর
১৯৮	নয় আট ...	আট নয়
২০৩	বড় ...	বর
২৮৬	বিরোধ ...	নিরোধ
২৯১	যোন্নি ...	যোনি
২৯৪	ভবস্তুং ...	ভবন্তুং
২৯৫	অভিবাদায়	অভিবাদয়ে
২৯৬	গরুর ...	গরুড়
৩০৫	মৌজার ...	মৌজাদার
৩১১	বহুবাসেশ ...	সহবাসের
৩১৪	তস্মাধ ...	তস্মাদ
৩১৫	শ্রীআচার ...	স্ত্রীআচার
৩১৬	Shirt ...	Skirt
ঐ	খোজা ...	মোজা
ঐ	Bridle ...	Bridal

অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ জীবন-মরণের, ইহ-পরকালের—হিন্দুর ইহাই ধারণা—ইহাই সংস্কার। হিন্দুর ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী, অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া আখ্যাতা। বিবাহকালে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া পতি-পত্নী অচ্ছেদ্য উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের মতে শুভদিনে, শুভলগ্নে বিবাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ, চৈত্র এবং জন্ম-মাস বিবাহের নিষিদ্ধ মাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

হিন্দুর সংস্কার ও চিরন্তন প্রথা

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা "ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ" এই অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন। গৌতম কেবল ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য ও আর্ষ বিবাহ বৈধ বলিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুরাও এই চতুর্ব্বিধ বিবাহকে 'ধরম বিয়া' বলিয়া থাকেন। আর্য্য-জাতির মধ্যে স্বয়ংবর-বিবাহের বহুল প্রচলন দৃষ্ট হইলেও মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত অষ্ট প্রকার বিবাহ-প্রণালীর মধ্যে স্বয়ংবর বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। এই বিবাহ গান্ধর্ব্ব বিবাহের নিকট জ্ঞাতি। স্বয়ংবর-বিবাহ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় রাজকুলে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন বিবাহ-পদ্ধতি

এক্ষণে এই অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা বলা যাউক। বেদ বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং সচ্চরিত্র বরকে সসম্মানে আহ্বানপূর্ব্বক তদীয় করে সালঙ্কৃতা কন্যার যথাবিধি সম্প্রদানের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। যদি যজমান, বৈদিক যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত ঋত্বিকের (পুরোহিতের) করে নিজ কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিতা করিয়া সম্প্রদান করেন, সেই প্রথাকে দৈব বিবাহ বলে। কন্যাপক্ষ, বরপক্ষের নিকট হইতে ধর্ম্মতঃ এক জোড়া বা দুই জোড়া গরু (গাই-বলদ) লইয়া বিধিমতে কন্যাদান করিলে তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে। "তোমরা উভয়ে (বর এবং কন্যা) একত্র ধর্ম্মাচরণ কর"; কন্যার অভিভাবক এইরূপ উপদেশ দিয়া যদি বরকে রীতিমত অর্চ্চনা করিয়া কন্যাদান করেন, তাহাকে প্রাজাপত্য বলে। কন্যার আত্মীয়-স্বজন বরপক্ষ হইতে ধন গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করিলে তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। বর-কন্যা স্বাধীন ইচ্ছানুসারে পরস্পর অনুরক্ত হইয়া পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইলে তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। কন্যার অভিভাবকদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। ছল দ্বারা ভুলাইয়া অথবা মত্ত কিংবা নিদ্রিতা কোন কন্যাকে লইয়া গিয়া বিবাহ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।

মনু কথিত অষ্ট প্রকার বিবাহ

মনুর সময়ে শূদ্রের সভ্যতা অতি নিম্ন-স্তরের ছিল বলিয়া তিনি শূদ্রের জন্য কোন প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা দেন নাই [মনু ১০ম অধ্যায় ১২৬ শ্লোক]। কাজেই গরুড় পুরাণে [পূর্ব্ব খণ্ড ৯৬ অধ্যায় ২১ শ্লোক] তাহার পক্ষে একমাত্র গর্হিত পৈশাচ বিবাহ বিহিত হইয়াছে। গরুড় পুরাণে ঐ শ্লোকটী যাজ্ঞবল্ক্য বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু আসল যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে ইহা নাই।

গরুড় পুরাণকার কথিত শূদ্রের বিবাহ-সংস্কার

দ্বাপর যুগের পরিশিষ্টাংশে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে এবং অর্জ্জুন সুভদ্রাকে রাক্ষস বিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন। পৈশাচ বিবাহের বিশেষ গ্লানি শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান ইংরেজ শাসনে রাক্ষস বিবাহ (Sec. 366 I. P. C.—Abduction) এবং পৈশাচ বিবাহ (Sec. 376 I. P. C.—Rape) অতি গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরাশর সংহিতার মতে কয়েকটী কারণে স্ত্রীলোকদিগের পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অসমীয়া ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ (গণক) জাতীয় লোকেরা এই ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলেন নাই। সেখানকার কায়স্থ (১) কলিতা, কেওট, নট আদি জাতীয় অধিকাংশ লোকেরা অদ্যাবধি পরাশরের এই বিধান অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন।

রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ এবং পরাশরের বিধান

নিম্ন-আসাম ব্যতীত মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে হিন্দুগণের মধ্যে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত আসুর বিবাহের প্রচলন দেখা যায় নাই। মধ্য-আসাম ও উপর-আসামের যে সকল গ্রামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থের বাস নাই, তাঁহাদের অনুকরণে তত্রস্থ অন্যান্য জাতির মধ্যে আজিও কোন সমাজ গঠিত হয় নাই। তত্রত্য কোন কোন তথাকথিত কায়স্থ, সাধারণ (ordinary) কলিতা, কেওট, কোচ, হিন্দু ছুটিয়া, নদীয়াল (ডোম) ও সূত জাতীয় লোকের আজিও গান্ধর্ব্ব অথবা পৈশাচ বিবাহ হইয়া থাকে। ঐ দুই অঞ্চলে তাহাদিগকে 'আবিয়ৈ' বলা হয়। কোন সত্রের গোসাঞী প্রভুর কৃপা হইলে আবিয়ৈ থাকা লোকেরা তাঁহাকে গুরু অর্থদণ্ড দিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া "খেলের" (সমাজ বিশেষের) লোকদিগকে খাওয়াইলে শিষ্য-সমাজভুক্ত হইয়া 'পান-

আসামে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিবাহ

(১) কায়স্থ—আসামে প্রকৃত কায়স্থ কাহারা, তৎসম্বন্ধে মৎপ্রণীত "আসাম প্রসঙ্গ" দ্বিতীয় খণ্ড (প্রথম সংস্করণ) ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তামোল' খাইতে পারে। কিন্তু নিম্ন-আসামের কোন সাধারণ কলিতা, কেওট কিংবা কোচ জাতীয় ব্যক্তির এই দুই প্রথার মধ্যে কোন একটীতে বিবাহ হইলে চিরদিনের জন্য জাতিচ্যুত হয়।

হিন্দুসমাজে বেদ বা শ্রুতির স্থান প্রথম। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং কল্প, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র ইহারা সকলেই বেদ নামে খ্যাত। বেদের পর স্মৃতি এবং তন্নিম্নে পুরাণ এবং তন্ত্রের স্থান। ব্যাসদেব-কৃত মহাভারতকে প্রাচীনেরা 'স্মৃতি' বলিয়া গিয়াছেন। যে আঠার খানি মহাপুরাণ, আঠার খানি উপপুরাণ এবং অষ্টোত্তর শত বা তাহারও অধিক সংখ্যক তন্ত্র আছে, তাহারা সকলেই হিন্দুর নিকট প্রামাণ্য। বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ সমাজের কল্যাণার্থ নিজ নিজ দেশকাল এবং পাত্রের উপযোগী স্মৃতি-সংহিতা সংকলন করিয়াছেন। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ—এই কুড়িজন স্মৃতি বা সংহিতাকার ঋষিই প্রধানতঃ 'ধর্ম্মশাস্ত্রকার' নামে খ্যাত। ঋষিদের মতের ভিন্নতা হইলে সেই আপাতঃ প্রতীয়মান ভিন্ন ভিন্ন মতের একবাক্যতা বা Conciliation করা যদি অসম্ভব হয়, তবে বেদের আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

সমাজের কল্যাণ সাধনে ঋষিদের ব্যবস্থা

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ অনেক বিষয়ে নবদ্বীপের স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বিবাহ বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলেন। কোচবিহার, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় মহামহোপাধ্যায় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের ও দামোদর মিশ্রের ব্যবস্থামত হিন্দুদিগের বিবাহ হয়। এই তিন অঞ্চলে বিবাহ-বিষয়ে পারস্কর গৃহ্যসূত্র ও পশুপতি পণ্ডিত সংকলিত পদ্ধতি প্রচলিত। বাঙ্গালা দেশের পার্শ্বস্থ আধুনিক গোয়ালপাড়া জেলার

বিবাহের প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা

গৌরিপুর অঞ্চলেও রঘুনন্দনের ব্যবস্থার প্রচলন নাই। ৺কামাখ্যার পাণ্ডাগণ হলায়ুধের অগ্রজ পশুপতির বিধান অনুযায়ী বিবাহ করিয়া থাকেন। মধ্য-আসামের দরঙ্গ জেলায় সাধারণতঃ পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশের বিধান-মতে এবং কাহারও কাহারও রঘুনন্দন ও পীতাম্বর উভয়ের মাঝামাঝি মিশ্রিত ব্যবস্থা-মতে বিবাহ হইয়া থাকে। নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে বহুকাল হইতে "হাড়গুচি বিয়া" নামক যে হাস্যোদ্দীপক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অসমীয়া হিন্দুগণ আবশ্যক হইলে সত্রাধিকারী গোঁসাই ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট হইতে বিবাহের বিধি লইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। ইংরাজী ১৮৭৫ অব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জনপদ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসামভুক্ত হইয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চারিটী বিভাগে বিভক্ত। উত্তর ও পূর্ব্ব শ্রীহট্ট অঞ্চলের হিন্দুরা শূলপাণি ও বাচস্পতি মিশ্রের প্রাচীন বিধান-মতে বিবাহের ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিয়া থাকেন। যখন হেড়ম্বরাজ তাম্রধ্বজ মাইবং ছাড়িয়া কাছাড়ের সমতল ভূমিতে আগমন করেন, ঐ রাজ্যে তখন সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর উপনিবেশ (২) হয়। কাছাড় অঞ্চলের হিন্দুরা ইঁহাদেরই মতাবলম্বী। হাইলাকান্দির রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, "দক্ষিণ ও পশ্চিম শ্রীহট্টের কতক অংশের হিন্দুরা শূলপাণি ও বাচস্পতি মিশ্রের বিবাহ-বিধি পালন করেন এবং সেখানকার আর কতক হিন্দু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুযায়ী উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের বহু ব্যক্তি বহুকাল হইতে বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিবাহের আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন। উপর-আসাম ও মধ্য-আসাম অঞ্চলের কলিতা ও

(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—উত্তরাংশ, কাছাড়ের কথা, ১০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কেওট জাতীয় লোকদিগের নিম্ন-আসামের কলিতা ও কেওট জাতির গৃহে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। অধুনা দুই একটী স্থানে হইলেও তাহা সার্ব্বজনিকভাবে হয় নাই। বিবাহের দিন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গণক (দৈবজ্ঞ) ও সম্ভ্রান্ত ঘরের কলিতারা দিনের বেলা নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করেন। সাধারণ কলিতা ও অন্যান্য জাতির লোকেরা খরচের ভয়ে অথবা অভাবে নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করেন না। তাঁহারা কেবল একটী কলার খোলায় (কলর দোনা) চাউল, ডাউল ও আনাজ-তরকারী পূর্ণ করত পিতৃলোকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পিতৃপুরুষের ভোজনের জন্য কলার খোলায় যে সকল সামগ্রী দেওয়া হয় অসমীয়ারা তাহাকে 'ভোজনী' বলেন। স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিবার প্রথা অসমীয়া হিন্দুগণের মধ্যেও আছে। আসামে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে ধর্ম্মগত বিরোধ থাকিলেও শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির পুত্র-কন্যার সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির পুত্র-কন্যার বিবাহ হইতে পারে। তাহাতে কোন বাধা নাই।

আসামে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত—অবশ্য নিম্নস্তরের নহে—হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি একই শাস্ত্রীয় বিধানে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল কন্যার

বাল্য-বিবাহ

বিবাহ-বয়স সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ (গণক) ও 'খাতি' কায়স্থ জাতীয় লোকেরা দ্বিতীয়-সংস্কারের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না দিলে সমাজে ধিক্কৃত—এমন কি সমাজচ্যুতও হইয়া থাকেন। একারণ আসামে এই তিন জাতির সমাজে বাল্য-বিবাহের যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য যে, আসামের 'দৈবজ্ঞ'রা ব্রাহ্মণ যাজী কিন্তু বাঙ্গলার দৈবজ্ঞরা তাহা নহেন। যাহা হউক, বঙ্গদেশে আমরা দেখিতে পাই, এখানকার অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও তাহাদিগের কন্যাগণকে নবম ও দশম বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিয়া থাকে। আজকাল নগরবাসী অধিকাংশ অবচ্ছল উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু অতিরিক্ত বরপণের জন্য কন্যাগণকে এই সময়ের

মধ্যে বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। ইহার ফলে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বাল্য বিবাহ-বিধান ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে। বর্ত্তমানে (অর্থাৎ—১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) কন্যাদায় যেরূপ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মনে হয়— অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গীয় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ লোপ পাইয়া পুষ্পিতা কন্যার বিবাহ প্রচলিত হইবে।

আসাম অঞ্চলের সর্ব্বত্রই এখনও ব্রাহ্মণ, প্রকৃত কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দুকন্যাগণের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। তাহারা ইচ্ছামত বয়সে পরিণীতা হইতে পারে। তজ্জন্য সমাজে কোনরূপ কঠোরতা না থাকায় তাহাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুসংহিতাতে যৌবন-বিবাহ অসমর্থিত কিংবা রজঃস্বলা কন্যার পিতার বা গ্রহীতার পাপ লিখিত হয় নাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী, উত্তরা, রুক্মিণী, গান্ধারী, দেবযানী প্রভৃতি সতী-শিরোমণি আর্য্যনারীগণের বিভিন্ন যুগে যৌবনে বিবাহ হইয়াছিল। বশিষ্ঠের মতে—"কুমারী প্রথম ঋতুমতী হইবার তিন বৎসরকাল পরে উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে।" যাহা হউক, পৌরাণিক যুগ (৫০০ খৃঃ পূর্ব্ব—১১৫০ খৃঃ অব্দ) এ নানা কারণে বাল্যবিবাহের সমর্থক বিধানগুলি প্রচলিত হয়। উৎশৃঙ্খল মুসলমানরা, যুবতী হিন্দুকন্যাদিগের লজ্জাশীলতায় উত্তরোত্তর হস্তক্ষেপ করিতে থাকিলে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বাধ্য হইয়া বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

যৌবন-বিবাহ

ঘটকালীর জন্য বঙ্গদেশের ন্যায় আসামে কোন সম্প্রদায় নাই। মাতা পিতা অথবা নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজন দ্বারাই বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। বিবাহের কথাবার্ত্তা হইলে বাড়ীর স্ত্রীলোক-দিগকে পাত্রী দেখিতে পাঠান হয়। ইহা আসাম দেশীয় প্রাচীন প্রথা। ইদানীং (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) নগরবাসী কোন কোন অসমীয়া ভদ্রলোক ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় প্রথা

আসামে পাত্রী দেখা

উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালীদিগের অনুকরণে পাত্রী দেখিতেছেন। এখনও আসামের পল্লীগ্রামবাসী অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞ জাতির মহিলা পাত্রী দেখিতে যান। এ বিষয়ে কলিতা, নাপিত, কেওট, বৈশ্য, মালি আদি জাতির মহিলাদিগের অবাধ অধিকার। পাত্রী দেখিতে না যাওয়া নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ঘরের কলিতা মহিলার সংখ্যা অতি অল্প। যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধানান্তে জানা গিয়াছে—আসাম অঞ্চলের সত্রাধিকার ব্রাহ্মণগণের এবং কামরূপে আহোমরাজগণের আমলে চৌধুরী, পাটোয়ারী প্রভৃতি 'বিষয়'প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, কলিতা প্রভৃতি জাতির মহিলারা কখনও কন্যার পিত্রালয়ে যান না। তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে অন্য জাতির স্ত্রীলোকদিগকে সেখানে পাঠান হয়। পাত্রীর বাটী হইতে পাত্রের বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ স্ত্রীলোকেরা পাত্রীকে এক বোতল তৈল উপহার দেন। অতঃপর তাহাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহার কপালে—[ভ্রূ যুগলের মধ্যে]—সিন্দুরের টিপ অথবা সিঁথায় সিন্দুরের রেখা দেন। গোয়ালপাড়া প্রবাসী বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থের সামাজিক প্রথার অনুকরণে গোয়ালপাড়া জেলার ব্রাহ্মণগণ ও বিভিন্ন জাতির ভদ্রলোকেরা পুত্র-কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে আত্মীয়-স্বজনসহ পাত্র-পাত্রী দেখিতে যান। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে—[এমন কি কোচবিহারেও]—কামরূপের সামাজিক প্রথা ও চালচলনগুলি প্রচলিত ছিল।

কামরূপে কোষ্ঠী বিচার

কামরূপের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজে দেখা যায়—পাত্রপক্ষ প্রথমে কন্যাপ্রার্থী হইয়া পাত্রীপক্ষের নিকট 'আখরা' (নকল কোষ্ঠী) চাহিয়া পাঠান। বর ও কন্যা উভয়ের কোষ্ঠী বিচার দ্বারা 'জরা' (রাশি, গণ প্রভৃতি) মিলিয়া গেলে কন্যার পিতার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথাবার্ত্তায় উভয় পক্ষের কাহারও অসম্মতি থাকে না। 'জরা' মিলিলে মূল কোষ্ঠী চাওয়া

ও তৎপরে সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ জনৈক ব্যক্তির দ্বারা কন্যার হস্তরেখা দেখান হয়। তিনি কন্যার হস্তরেখাগুলি দেখিয়া তাহার দুই হস্তে দুইটী রৌপ্য মুদ্রা দিয়া আসেন। এই মুদ্রাকে হাত চাওয়া ধন এবং ক্রিয়াটীকে হাত চাওয়া ক্রিয়া বলে। অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ জাতির লোকেরা কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। কলিতা, কেওট আদি জাতির লোকদিগের মধ্যে অনেকেই কোষ্ঠী করান না। গ্রহাদি পূজা করা ও কোষ্ঠী লেখা দৈবজ্ঞদিগের জাতীয় ব্যবসায়। বিবাহোপলক্ষে কোষ্ঠী বিচারের জন্য দেখিতে চাওয়াকে অসমীয়া হিন্দুরা 'রাহি জোরা চোয়া' বলেন। এই 'রাহি' শব্দের অর্থ 'রাশি' 'জোরা' শব্দের অর্থ মিলন এবং 'চোয়া' শব্দে দেখা বুঝায়। 'রাজজোরা' বিধান-মতেও অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ হইয়া থাকে। এই রাজজোরাকে বঙ্গদেশে 'রাজযোটক' বলে। বিবাহে উভয় পক্ষের যে একমত হয়, অসমীয়া হিন্দুরা তাহাকে চিত্তশুদ্ধি বলিয়া থাকেন।

দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, বর-কন্যার কোষ্ঠী বিচার অন্তে শুভ ফলের কথা বলিলে পাত্রের পিতা, কন্যাকে উপহার স্বরূপ একজন অথবা দুইজন মহিলার দ্বারা একটী অলঙ্কার পাঠাইয়া দেন। অসমীয়া হিন্দুরা এই অলঙ্কারের মধ্যে সাধারণতঃ স্বর্ণাঙ্গুরী দিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র—তাঁহারা তো মূল্যবান অলঙ্কার দিবেনই। অসমীয়া হিন্দুরা বিবাহের এই কার্য্যকে আঙ্‌টি-পিন্ধোয়া বলেন। আঙ্‌টি পিন্ধোয়ার পর আর কোষ্ঠী বিচার হয় না; কেবল পঞ্জিকা দেখিয়া একটা শুভদিন স্থির করা হয়।

আঙ্‌টি-পিন্ধোয়া

বঙ্গদেশে বিবাহের কথা হইলে বরের জনৈক গুরুস্থানীয় ব্যক্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া কন্যার বাড়ীতে যান। পুরোহিত মহাশয় তাঁহার মাথায় ধান, দুর্ব্বা ও কপালে চন্দনের টিপ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে পর বরপক্ষীয় ঐ ব্যক্তি টাকা, গিনি অথবা

পাকা দেখা ও পত্রকরণ

একটী অলঙ্কার দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। বঙ্গদেশে ইহাকে পাকা দেখা বলে। আশীর্ব্বাদকালে বাড়ীর মহিলারা তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করেন। 'পাকা দেখা'র পর বরপক্ষীয় ব্যক্তি, পুরোহিত দ্বারা একটী কাগজে লাল কালিতে বর-কন্যার ও তাহাদের পিতার নাম, বিবাহের দিন ও লগ্ন-সময় লিখাইয়া সেই কাগজখানি কন্যার পিতাকে দেন। ইহাকে পত্রকরণ বলা হয়। এই পত্রে বরপক্ষীয় ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে। আসামে পাকা দেখা ও পত্রকরণের ব্যবস্থা নাই। কামরূপে সম্বন্ধ স্থির হইলে জনৈক গুরুস্থানীয় ব্যক্তি কয়েকখানি ভার সহ কন্যার পিত্রালয়ে যান এবং দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া বিবাহের দিন স্থির করেন। ঐ দিনকে বিয়ার থাতি করা এবং ভারগুলিকে থাতির ভার বলে। ঐ ভারে তাম্বূল, পান, দধি, গুড়, নারিকেল প্রভৃতি দ্রব্য থাকে।

বরপণ ও কন্যাপণ

বিবাহের জন্য আসামের কুত্রাপি পাত্রীর পিতাকে 'পণ' দিতে হয় না। কেবল আধুনিক কামরূপের অনেক ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানে সাধারণতঃ ১০০৲ শত টাকা হইতে ৭০০৲ শত টাকা এবং ব্রাহ্মণেতর উচ্চ জাতির অধিকাংশ লোকেরা ৮০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত 'পণ' গ্রহণপূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সেখানকার বরপক্ষ, কন্যাপক্ষকে তাম্বূল, পান, দধি, গুড় প্রভৃতি সামগ্রী এবং কন্যাপক্ষের আত্মীয়-স্বজনগণকে বস্ত্রাদি দিয়া সম্মান করিতেন। এতদ্বিষয়ে এইরূপ জনপ্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়:—"ভগবান মহাদেব যখন পার্ব্বতিকে বিবাহ করেন, তখন বরপক্ষ, কন্যাপক্ষকে ঐরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কামরূপ পার্ব্বতির পিতা হিমালয় প্রদত্ত দেশ। এজন্য সে দেশে ঐরূপ প্রথার প্রচলন হয়।" এই প্রাচীন প্রথাটী উজনী অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। যাহা হউক,বরের পিতা, কন্যার পিতাকে যে পণ প্রদান করেন;

অসমীয়ারা তাহাকে 'গা-ধন' বলেন। বিপত্নীকেরা পুনরায় বিবাহ করিতে চাহিলে কামরূপীয়া কন্যাপক্ষ খুব বেশী পণ দাবী করিয়া থাকেন। দরঙ্গ জেলার তেজপুর মহকুমায় বরপণ ও কন্যাপণ নাই বলিলে চলে। সেখানে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইলে, বরপক্ষের নিকট হইতে কিছু অর্থ লওয়া হয়। নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর অঞ্চলের হিন্দুগণ কন্যার বিবাহ হেতু কোনরূপ পণ গ্রহণ করেন না। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বরপণ নাই বটে, কিন্তু আজকাল বিবাহের পর বরকে পণস্বরূপ লেখা পড়ার ব্যয়াদি জোগাইতে দেখা যায়। তবে তাহাও অতি বিরল। অনুসন্ধানান্তে আমরা অবগত হইয়াছি যে, কোন কোন নদীয়াল যৎসামান্য কন্যাপণ দিয়া একটী কন্যাকে ঘরে আনিয়া স্ত্রী করিয়া রাখে। শ্রীহট্টে কন্যাপণ বহুলরূপে প্রচলিত ছিল—এখনও আছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, প্রায় ১৩২০।২১ বঙ্গাব্দ হইতে সেখানে বরপণ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই দেশে কায়স্থ, বৈদ্য ও সাহু জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। এরূপ স্থলে পণপ্রথা অনিবার্য্য। কায়স্থ বৈদ্য-কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে এবং সাহু জাতীয় বরের জন্য কায়স্থ-কন্যার আবশ্যক হইলে বরপক্ষকে অতিমাত্রায় পণ দিতেই হইবে। কাছাড়ের হাইলাকান্দি মহকুমায় বৈদ্য ও সাহু জাতি নাই। পূর্ব্বে সেখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির লোকেরা কন্যাপণ গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমানে সেখানকার এই দুই জাতির মধ্যে বরপণ কিংবা কন্যাপণ নাই। বঙ্গদেশে বরপণ একটী লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে।

পণপ্রথার কুফল

অতিমাত্রায় পণ দাবীর জন্য এদেশের কুলীন কন্যাগণও পূর্ণ বয়সে অযোগ্য পাত্রে পরিণীতা হইতেছেন। বঙ্গীয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই জানেন—স্নেহলতার বিবাহের সম্বন্ধকালে পাত্রপক্ষ ভীষণ বরপণ দাবী করিলে তিনি দীন পিতাকে ভিটা-মাটি

বিক্রয় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্ম পরিশেষে পরিধেয় বস্ত্রে কেরসিন ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগপূর্ব্বক সংসার-খেলার অবসান করেন। কেহ যেন মনে করেন না যে, কেবল বাঙ্গালার হিন্দুসমাজই দুর্ব্বহ পণ-পীড়নে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পণ প্রথার কুফলে বিহারী হিন্দুগণও মর্ম্মপীড়িত। কোচবিহার ও উড়িষ্যার কোন কোন জাতির মধ্যে এই প্রথার ফল বিষম হানিকর হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের মুসলমান সমাজে ইহার অল্প-বিস্তর প্রভাব হেতু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। ইউ-রোপীয় সমাজও এবিষয়ে কম পীড়িত নহে।

নিম্ন-আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমায় উচ্চ শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুকন্যাগণ বিবাহকালে 'মেখেলা'র পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ মূল্য-বান চেলি বা গরদের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই ধুবড়ী অঞ্চলের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির কন্যাগণ বিবাহকালে মাথায়—সিঁতিপাটী ; কাণে—কানবালা, ফুলঝুমকা, ঢেড়ি ঝুমকা ও অন্তি ; নাকে—নথ, গুলাপ ; গলায়—চিক, মালা ; হাতে—বালা, পঞ্চি,কাটাবাজু ও বাজু ; কোমরে—গোট এবং পায়ে—আরবেঁকী, গোলখারু ও গুজরি নামক অলঙ্কার পরিধান করিতেন। আধুনিক কালে এই অঞ্চলে টায়রা, দুল, ইয়ারিং, নাকফুল, চিক, নেকলেস, ব্রেসলেট প্রভৃতি অলঙ্কার প্রচলিত হইয়াছে। কামরূপ অঞ্চলে বিবাহকালে কন্যাকে 'খাড়ু' পরিধান করান হয়। এখানকার খাড়ুগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত—ক্বচিৎ সোণার পাতে মোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। তেজপুর মহকুমার এবং নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকন্যাগণ খাড়ুর পরিবর্ত্তে বলয় পরিধান করেন। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাঁহারা আর বালা কোথায় পাইবেন, কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে শুধু হাতে থাকিতে হয়। লখিমপুর জেলার হিন্দুকন্যারা বিবাহকালে কোমরে—'করধনি' বা অন্য কোন প্রকার অলঙ্কার এবং

কন্যার বিবাহ বস্ত্র ও আভরণ

কানে—সোনার 'করিয়া' পরিধান করে না। গোয়ালপাড়া জেলার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কন্যা 'শাঁখা' পরিধান করিয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধ্য-আসামের ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ও কায়স্থের কন্যাগণ বিবাহকালে শাঁখা পরিতেন। কালক্রমে উহার ব্যবসায় সেখানে লোপ পাওয়ায় ইদানীং সেখানকার কোন কন্যাকে শাখা পরিধান করিতে দেখা যায় না। তেজপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ এখনও বিবাহকালে কন্যাকে আশীর্ব্বাদের সময় বলিয়া থাকেন—"তোমার শাঁখ সেন্দুর অক্ষয় হউক।" কামরূপ জেলায়ও কন্যাকে তৎকালে বলা হয়—"তোর শাখায় সিন্দুরে দিন যাক।"

শ্রীহট্টে খাড়ুর প্রচলন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। এখন উহার পরিবর্ত্তে গঙ্গা-যমুনা রুলী ব্যবহার হয়। ঐ অঞ্চলে কন্যাগণ পদাভরণ স্বরূপ 'ছয়রা' ব্যবহার করে। বর্ত্তমানে হাইলাকান্দি অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কন্যাগণ বিবাহকালে কলিকাতার ভদ্র-মহিলাদিগের ব্যবহার অনুরূপ অলঙ্কার পরিধান করিতেছেন।

উজনী অঞ্চলে বিবাহের উৎসবকাল ও কলর-গুরিত গা ধুয়ান

উজনী অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহোৎসব সাধারণতঃ তিন দিন ধরিয়া—[সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগের বাটীতে আমোদ-প্রমোদ উপভোগের জন্য পাঁচ দিন অথবা সাত দিন ধরিয়া]—অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দিন, তিথি, নক্ষত্র এবং চন্দ্র আদি শুভ না থাকিলে তিন দিনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা বাধ্য হইয়া চারি অথবা পাচ দিন নির্দ্ধারণ করিয়া লন। ঐ দেশীয় প্রথানুসারে তিন দিনের উৎসবের কম কাহারও বিবাহ হইতে পারে না। নিম্ন-আসামে এক্ষণে আমরা তিন দিনব্যাপী বিবাহোৎসবের বর্ণনা করিব। বিবাহ দিবসের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহই বর ও কন্যাকে তাহাদের নিজ নিজ বাটীতে 'কলরগুরিত গাধুয়ান' হয়। বাড়ীর লোকেরা

একটী কলাগাছ আনিয়া উঠানের কোন এক পার্শ্বে পুতিয়া দেন। অতঃপর এই কলাগাছের তলায় কয়েকটী খণ্ডিত কদলীকাণ্ড পাশাপাশি বিছাইয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে তদুপরি বসাইয়া স্নান করানর নাম কলরগুরিত গা ধোৱা।

উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে বিবাহের অন্ততঃ দুই দিন পূর্ব্বে পাত্রের ঘর হইতে স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার, বস্ত্র, তৈল, সিন্দুর, মৎস্য, একটী মৃদ্‌ঘট (টেকেলি) ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া যান এবং বাদ্যকরেরা তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক, ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে পাত্রীর গৃহে উপস্থিত হইলে বাটীর মহিলারা কন্যাকে লইয়া অন্দর মহলে একটী সভা করেন। ইহার পর পাত্র পক্ষের ঐ স্ত্রীলোকেরা যখন পাত্রীকে অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্য দিবার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। তখন পাত্রীপক্ষের স্ত্রীলোকেরা গান গাহিতে থাকেন। নিম্নে একটী গানের নমুনা দেওয়া হইল :—

আগৰখন ভাৰতে কি কি অনিচ্ছা
বাটচৰাৰ মুখেতে থোঁৱা।
মোর ঘৰলৈ কি কার্য্যে আহিছা
দেউতাৰ আগতে কোঁৱা।*

অর্থাৎ—তোমরা সম্মুখস্থ ভারে করিয়া যে দ্রব্য-সম্ভার অনিয়াছ, দেউড়ীতে রাখ এবং তোমরা কি জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছ তাহা আমাদের বাড়ীর কর্ত্তাকে অবগত করাও।

সঙ্গীত শেষ হইলে পাত্রপক্ষের স্ত্রীলোকেরা কন্যাকর্ত্তার হস্তে 'টেকেলি' দিবার পর ঐ কন্যাকে সিন্দুর এবং উপরিউক্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরাইয়া দেন। তেজপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উজনী

* আগৰখন—সম্মুখস্থ। বাটচরা—বহির্বাটীস্থ চালাঘর (shed) বিশেষ।

অঞ্চলের যে সকল ব্যক্তি বিদেশী রীতির অনুকরণই ভদ্রতা জোড়ন পিন্ধোয়া ও বলিয়া মনে করেন, কেবল তাঁহাদের বাটী গাত্রহরিদ্রা হইতে কন্যার জন্য রূপার খাড়ুর—[আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলে সোনার পাতে খাড়ুর]—পরিবর্ত্তে সুবর্ণ বলয় পাঠান হয়। অসমীয়া হিন্দুরা এই বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করান কার্য্যকে জোড়ন পিন্ধোয়া বলেন। প্রায় ১৯২০।২১ সাল হইতে উপর-আসামের মাজুলী অঞ্চলে জোড়ন পিন্ধোয়া প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। তবে 'টেকেলি দিয়া' প্রথার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। বিবাহের যে কোন দিন পূর্ব্বে বৈকালে 'টেকেলি' দেওয়া হয়—কোন দিন সকালে দিবার নিয়ম নাই। মধ্য-আসামে অতঃপর কন্যার গাত্রহরিদ্রা হয়। উপর-আসামের হিন্দুরা 'টেকেলি দিয়া'র দিনেই বর-কন্যার গাত্রহরিদ্রা দিয়া থাকেন। কিন্তু নিম্ন-আসামে ঐ "জোড়ান পিন্ধোয়া"র দিন বর কিংবা কন্যার গাত্রহরিদ্রা হয় না। সেখানে বিবাহের দিন এয়োরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর অথবা কন্যাকে 'কলরগুরিত' বসাইয়া পিষ্ট মাসকলাই, হরিদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্যের সংমিশ্রণ দ্বারা বর ও কন্যার গাত্রে লেপন করিয়া স্নান করাইয়া দেন। কামরূপ অঞ্চলের মহিলাদিগের তৎকালীন একটী গীতের নমুনা, যথা :—

কলৰ গুলিত গোয়ানাম

কাঁহীত করি আনা মায়ে পিতলরে কাকে,
কলরগুরিত আহা মায়ে ধুৱাবাক লাগে।
সোনার খুটিগাছা কলত ধরি আছা,
মায়েরে ধুৱাব বুলি।
মাহতে মুঠা দিলা, তেলতে হালধি ;
খচিব লাগিছে মায়ে সুগন্ধ মালতি।

প্রথমেতে মাহ দিবা মহাসান্তী লোক;
হালধিরে লক্ষ্য আনি ঘসিবা গাৱত। *

উজনী অঞ্চলে পাত্রপক্ষীয় স্ত্রীলোকগণ কন্যার পিত্রালয়ে কিয়ৎকাল সঙ্গীত ও আমোদ-প্রমোদ করিবার পর বরের বাটীতে ফিরিয়া আসে।

অসমীয়া হিন্দুজাতীয় বর-কন্যার 'গাত্রহরিদ্রা'র কথা আমরা (লেখক) পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে অনুসন্ধিৎসু অসমীয়াদিগের জ্ঞাতার্থ উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদেশে স্থিরীকৃত বিবাহ-দিনের সপ্তাহকাল মধ্যে কোন এক শুভদিনে ও শুভক্ষণে বর ও কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে। বরের বাড়ী, কন্যার পিত্রালয় হইতে ৯।১০ মাইলের অধিক না হইলে, বরের গাত্র-হরিদ্রার অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে পঞ্জিকাতে যদি শুভক্ষণের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে বরকর্ত্তা নাপিত ও অন্য লোকদ্বারা বরের গাত্রস্পৃষ্ট পিষ্ট হরিদ্রা, আঁচলাযুক্ত লাল পাড়ের অখণ্ড দেশীবস্ত্র, বেনারসী কিংবা তত্তুল্য বস্ত্র, রক্তবস্ত্র (চেলির শাড়ী), গন্ধদ্রব্য, পাটী, সতরঞ্চি, ঝাঁপি (সিন্দুর চুপড়ী) শাঁখা, কাজললতা, জরিপাড়ের কাপড়, স্নানার্থ চৌকী, গামছা, তৈলপূর্ণ পিত্তলের কলসি, গামলা, পিত্তলের ঘটী, কাঁসার অথবা রূপার চন্দনে বাটি, পিত্তলের প্রদীপ ও পিলসুজ, ভোজনার্থ কাঁসার থালা, ব্যঞ্জন-বাটী ভাজাভুজার জন্য রিকাব—[কয়েকটী গন্ধদ্রব্য ও তিনটী ব্যঞ্জন-বাটী ব্যতীত অন্যান্যগুলি একটি করিয়া]—এবং মৎস্য দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, একটী পানের বিড়িদান (ডিবা), কিছু পান ও পানের মসলা ব্যতীত যে সকল সধবা, কন্যার গাত্র-হরিদ্রা দিবেন

পশ্চিম-বঙ্গে গাত্র-হরিদ্রা-সম্ভার

* শব্দার্থ=খুটিগাছা—পুতুল। কাহিতে করি·····ধুয়াব বুলি—বর বা কন্যার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইতেছে। সোনার খুটিগাছা··· ধুয়াব বুলি—স্বর্ণের পুতুলটি (বর অথবা কন্যা) কলাগাছ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মা আসিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দিবে। মাহ=মাসকলাই। মুঠা—এক জাতীয় ঘাসের সুগন্ধ শিকড়। মহাসান্তী লোক—সতী-শিরোমণি স্ত্রীলোক।

তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ জনের জন্য পাঁচখানি কাপড়, পাঁচটী করিয়া সিন্দূর চুপড়ী, সিন্দূর কৌটা, চিরুণী, আর্শি, মাথাঘসা ও আল্‌তা কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া দেন। পাত্রের বাটী হইতে প্রেরিত দ্রব্যগুলিকে 'গাত্র হরিদ্রার তত্ত্ব' বলে। পল্লীগ্রামে কন্যার জন্য বরের গাত্রস্পৃষ্ট হরিদ্রা, বস্ত্রাদি ও গন্ধদ্রব্য নাপিত চেঙ্গারি করিয়া লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাহার জন্য উপরিউক্ত অন্যান্য দ্রব্য ও সধবাদিগের জিনিসপত্র হিন্দুশ্রেণীর কৃষক দ্বারা ডালায় করিয়া এবং কায়পুত্র (কাওরা) অথবা রাজবংশী জাতীয় লোক দ্বারা মৎস্য পাঠান হইয়া থাকে। বরের বাটী হইতে প্রেরিত উপরিউক্ত লালা পাড়ের নূতন বস্ত্র কন্যাকে পরিধান করাইয়া পাঁচ জন, সাত জন অথবা নয় জন সধবা স্ত্রীলোক তাহার কপালে দুই স্কন্ধে বক্ষে ও দুই জানুতে 'গাত্রহরিদ্রা' দেন। যুগ্ম সংখ্যক সধবাদিগের এই কার্য্য করিবার প্রথা নাই। অতঃপর ঐ স্ত্রীলোকগণের প্রত্যেকেই বামহস্তের উপর বামহস্ত স্থাপন করেন। সর্ব্বোপরি বামহস্তের উপর একটী পাথরের ছোট নুড়ি থাকে। এই নুড়িতে ৭ 'ধার' (ফোঁটা) তেল দেওয়া হয়। কন্যার অঙ্গের যে যে স্থানে হরিদ্রা দেওয়া হইয়াছিল, নুড়ির দ্বারা তাঁহারা সেই সেই স্থান স্পর্শ করেন। সেই সময় হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করা হয়। যাঁহারা স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন, তাঁহারা ঢোল বাদ্যের ব্যবস্থা করাইয়া থাকেন। গাত্রহরিদ্রার পর কন্যা নিকটস্থ জলাশয়ে গিয়া স্নান করিয়া আসিলে তাহার হস্তে পূর্ব্বোক্ত লৌহ, রূপা অথবা সোনার কাজললতা দেওয়া হয়। সেইদিন কন্যার মাতা তাহাকে

আইবড় ভাত

আলিপনা-দেওয়া পিড়ীতে বসাইয়া পঞ্চ ব্যঞ্জন, পরমান্ন, পিষ্টক প্রভৃতি ও বরের বাটী হইতে প্রেরিত জলযোগের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন করান। গাত্রহরিদ্রার দিন কন্যার এই ভোজনকে 'আইবড় ভাত' বলা হয়। কন্যা যতক্ষণ ভোজন করে ততক্ষণ তাহার সন্নিকটে একটী প্রদীপ জ্বলে এবং বাড়ীর মহিলারা অথবা ছোট ছোট মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিতে থাকে। বর ও কন্যার বাড়ী বহু দূরবর্ত্তী

২

স্থানে হইলে এবং কন্যার বাটীতে 'গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব' পাঠান অসুবিধাজনক বোধ হইলে বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তাকে এই তত্ত্ব বাবদ আবশ্যকীয় অর্থ প্রদান করেন। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের কথা অনুসারে একই দিনে একই শুভক্ষণে বরের বাটীতে বরের এবং কন্যার বাটীতে কন্যার 'গাত্রহরিদ্রা' হইয়া থাকে।

১৮৭৫-৭৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে পশ্চিম-বঙ্গে মধ্যবিত্ত ব্যক্তির বাটী হইতে গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে পাত্রীকে 'আসমান তারা' নামক রেশমী বস্ত্র উপহার দেওয়া হইত। ইহার কিছুকাল পরে 'গোদর' নামক রেশমী কাপড় উঠে। পাত্রপক্ষ কন্যার জন্য তাহাই মনোনীত করিয়া গাত্রহরিদ্রার দিন পাঠাইয়া দিতেন। তৎপরে বিভিন্ন রঙের গুল-বসান ঢাকাই শাড়ী এ অঞ্চলে দেখা দেয়। পাত্রপক্ষ এই শাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। বর্ত্তমানে (১৩২২ বঙ্গাব্দ) গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে কন্যাকে মান্দ্রাজী বা জরির কাজ-করা 'ঢাকাই' কাপড় দেওয়া হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণের মধ্যে এই চিরন্তন প্রথা আছে যে, গাত্রহরিদ্রার পর কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে অথবা কোন আশঙ্কাজনক ঘটনাচক্রে নির্দ্দিষ্ট পাত্র পাত্রী মধ্যে বিবাহ না হইলে বর ও কন্যার পিতামাতাকে জাতিচ্যুত হইতেই হইবে। এরূপ স্থলে ঐ নির্দ্দিষ্ট বিবাহের দিনে বর ও কন্যাকে স্বজাতীয় ও ভিন্ন গোত্রীয় যে কোন ব্যক্তির গৃহে যে কোন প্রকারে বিবাহের আদান-প্রদান করিতেই হইবে। কন্যার গাত্রহরিদ্রার পর বরকর্ত্তা যৌন সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিলে কন্যাপক্ষ অনেক সময় আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে মামলা আনয়ন করেন, কখন কখন তাহার ফল অত্যন্ত দণ্ডার্হ দেখা যায়। কারণ ইহা একটী আর্থিক ক্ষতিকর ও জাতিচ্যুতির ব্যাপার।

ঐ 'জোড়ন পিন্ধোয়া'র দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বরের বাটীর মহিলারা কন্যার বাটী হইতে প্রত্যাগত স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ-

পানীতোলা ও নোয়নি

প্রমোদ করিবার জন্য গীত গাহিয়া থাকেন। তৎপরে তাঁহারা গীত-বাদ্য সহ নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া আনেন। বনিয়াদি ভদ্র ঘরের মহিলারা পাল্কি চড়িয়া সেখানে যান। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের হিন্দুরা ইহাকে 'পানীতোলা' বলেন। এই দুই অঞ্চলে 'জোড়ন পিন্ধোয়া'র দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩ বার, ৫ বার অথবা ৭ বার এবং কখন কখন ৯ বার নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে গৃহে জল তুলিয়া আনা হয়। সেই জল দ্বারা বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে সকালে ও বৈকালে 'কলর গুরিত' এবং কেবল বিবাহের দিন 'বেই'এর মধ্যে বসাইয়া স্নান করান হয়। অসমীয়া হিন্দুগণ এই স্নান কার্য্যকে 'নোয়নি' (নোবনি) বলেন। নোয়নি কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বর-কন্যার কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। প্রথম দিনের 'নোয়নি' হইল অসমীয়া হিন্দুদিগের **প্রথম বিবাহ পদ্ধতি**। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩ বার ৫ বার, অথবা ৭ বার 'পানীতোলা'র বিষয় এক্ষণে বলা যাউক। ১৫ পৃষ্ঠায় আমরা উল্লেখ

টেকেলি দিয়া

করিয়াছি যে, 'জোড়ন পিন্ধোয়া'র দিনই 'টেকেলি দিয়া' হয়। বঙ্গীয় পাঠক! মনে করুন—বিবাহের একদিন পূর্ব্বে 'টেকেলি দিয়া' হইল। সেইদিন হইতে 'পানী তোলার' নিয়ম। সেই দিন বৈকালে এবং তৎপর দিন সকালে-বৈকালে দুইবার সর্ব্বশুদ্ধ এই তিন বার নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া কন্যাকে স্নান করান হইল। সুতরাং বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে 'টেকেলি দিয়া' হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ৫ বার এবং তিন দিন পূর্ব্বে হইলে ৭ বার জল তুলিয়া আনা হয়। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে কন্যার বাটীর মহিলারা নোয়নির জন্য জল উত্তোলন করিতে যাইবার কালে সাধারণতঃ নিম্নোদ্ধৃত ধরণের গীত (পানী তুলিবলৈ যোৱা নাম) গাহিয়া থাকেন :—

"ওলাই আঁহা শশী প্রভা
রাজ্যৰ মহাদৈ।
শুভক্ষণে যাত্রা কৰি
জল আনোগৈ॥
কাষত ঘণ্টা লোৱা ৰাধা
মূৰত লোৱা মালা।
যমুনালৈ যাব লাগে
নকৰিবা হেলা॥
বাটে বাটে ফুলি আছে
কেতেকী বকুল।
চলিব নোৱাৰে ৰাধাই
পাৱত নূপুৰ॥
বাটে বাটে জুমা জুমি
চোৱা গোপীলোক।
কোন থিনি বৃন্দাবন
চিনাই দিয়া মোক॥" *

সামবেদীয় অধিবাসের দ্রব্য (ধান্য, দূর্ব্বা, শঙ্খ, সিন্দুর, শ্বেত-সর্ষপ, চামর, দীপ, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি) বাইশটী ; কিন্তু যজুর্বেদীয় অধিবাসের দ্রব্য একুশটী। বঙ্গদেশের মত কন্যার বাড়ী হইতে তৈল, কাপড়, দধি, মৎস্য প্রভৃতি অধিবাসের তত্ত্ব প্রেরণের নিয়ম আসামে নাই। যে দিন বিবাহ হইবে তাহার পূর্ব্ব দিন

অধিবাস

* ওলাই আঁহা—বাহির হইয়া আইস। মহাদৈ—মহারাণী। আনোগৈ—গিয়া আনি। কাষত—কক্ষে। লোৱা—লও। মূৰত—মস্তকে। যাব লাগে—যাইতে হইবে। নোৱারে—পারে না। বাটে বাটে—পথে পথে। ফুলি—প্রস্ফুটিত হইয়া। জুমা-জুমি—জনতা।

অসমীয়া হিন্দুদিগের 'অধিবাস' হয়। ঐ দিন সকালে কাহারও ঘরে কোন-রূপ উৎসব হয় না। বরের বাটীতে বর, কন্যার বাটীতে কন্যা এবং বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা প্রাতঃকাল হইতে উপবাস দ্বারা আত্মসংযম করেন। বৈকালে তিন জন অথবা পাঁচ জন সম্পর্কীয়া মহিলা বর ও কন্যার মস্তকে তেল মাখাইয়া দেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ নিয়মে স্নান করান হয়। সন্ধ্যার পরেই বরের বাটীতে ও কন্যার বাটীতে উভয় পক্ষীয় পুরোহিতদ্বয় পঞ্চ দেবতা, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা করেন। তৎপরে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার পূজা অন্তে অধিবাসের সংকল্প করেন। এইরূপে অসমীয়া হিন্দুদিগের 'অধিবাস' হইয়া থাকে। উপর-আসামে অধিবাসের পর বর-কন্যা, বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা হবিষ্যান্ন ভোজন করেন। এই অঞ্চলে যে দিন অধিবাস ক্রিয়া হয়, সেই দিন রাত্রে অসমীয়া হিন্দুরা বিবাহের আর একটী লৌকিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উহাকে 'গাঁথিয়ন খুণ্ডা' বলেন। 'গাঁথিয়ন' এক প্রকার সুগন্ধ উদ্ভিদের মূল বিশেষ। পাঁচ জন অথবা সাত জন সধবা স্ত্রীলোক কিংবা কুমারী এক জোড়া শিলা লইয়া সুগন্ধ তৈল মাখিয়া একত্র হইয়া ঐ মূলটী শিলাপুত্রের (নোড়ার) সাহায্যে চূর্ণ করিতে থাকেন। এই মহিলাগণ অথবা কুমারীরা এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার কালে আর এক দল স্ত্রীলোক সেখানে বিবাহ-বিষয়ক আনন্দ-গীতি গাহিতে গাহিতে প্রত্যেকেই ঐ শিলাপুত্রের দ্বারা শিলাখণ্ডস্থ শিকড়টী আঘাত করিয়া উলুধ্বনি প্রদান করেন। ইহাতে ঐ শিকড়টী চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। তখন উহা তৈল সহ বরের বাটীতে বরের এবং কন্যার বাটীতে কন্যার মস্তকে স্থাপন করা হয়। আসামে আহোম জাতির লোকেরাই এই প্রথাটী বিশেষভাবে পালন করিয়া থাকে। উপর-আসামের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও 'গাঁথিয়ন খুণ্ডা' প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এই দিন সারারাত্রি জাগিয়া আমোদ-আহ্লাদ

গাঁথিয়ন খুণ্ডা

করিয়া থাকেন। নিম্ন-আসামে কিংবা সুরমা উপত্যকায় ব্রাহ্মণাদি হিন্দু-জাতির মধ্যে গাঁথিয়ন খুণ্ডার প্রচলন নাই। নিম্ন-আসামে অধিবাসকালে তিন জন ও পাঁচ জন সম্পর্কীয় মহিলা আসিয়া কন্যার মস্তকে তৈল মাখাইয়া একখণ্ড শিলাদ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করান মাত্র।

নিম্ন-আসামে অধিবাসের দিন শেষ রাত্রে বর ও কন্যা উভয়ের বাটীর স্ত্রীলোকেরা গীত গাহিতে গাহিতে নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া লইয়া যান। তৎকালে যে ধরণের গীত গাওয়া হয়, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'ৰাতি তোলা পানী টুপি অতি বৰে যুয়া।
পুৱালে পৰিব পখি পানী যাব চুৱা॥'—ইত্যাদি

অর্থাৎ—আমরা রাত্রিতে যে জল তুলিয়া লইয়া আসিয়াছি তাহা বিশুদ্ধ। প্রাতঃকালে পক্ষিগণের স্পর্শে উহা কলুষিত হইয়া যাইবে।

মধ্য-আসাম ও উপর-আসামের উচ্চ-শ্রেণীর অধিবাসিগণের ন্যায় ৭ দিন পূর্ব্ব হইতে "কলর গুরিত গা ধুয়া'নর নিয়ম নিম্ন-আসামে উচ্চ-শ্রেণীর অধিবাসিগণের নাই। নিম্ন-আসামে অধিবাসের পর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যায়। তৎপরে নাপিত বরের বাটীতে বরের এবং কন্যার বাটীতে কন্যার ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে তাহাদিগকে 'কলর গুরিত' স্নান করান হয়। এই সময় তাহাদের 'গাত্রহরিদ্রা' হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের বর-কন্যা অধিবাসের পূর্ব্বে নদী, খাল, বিল অথবা পুষ্করিণী হইতে উত্তোলিত জল দিয়া অন্য দিনের মত নিজ নিজ গৃহে স্নান করিয়া থাকে—কিন্তু 'কলর গুরিত' নহে।

প্রভাত হইলেই বিবাহের তৃতীয় দিবস। এই দিন অসমীয়া হিন্দুগণ বর-কন্যার প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন তাহার নাম 'দৈয়ন দিয়া'। কি ভাবে এই শুভকার্য্য সম্পাদন করা হয়, এক্ষণে তাহা বলা যাউক। প্রভাত হইবার অন্ততঃ

দৈয়ন দিয়া

দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে উভয় বাটীর স্ত্রীলোকেরা শয্যাত্যাগ করেন এবং বর ও কন্যার মুখ ও পদ প্রক্ষালন অন্তে তাহাদিগকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া একটী উঁচু পিঁড়ার উপর উপবেশন করান। কামরূপ অঞ্চলে এই বস্ত্রকে "আনাকাটা কাপোর" বলে। অতঃপর বর ও কন্যার সধবা মাতা (৩) পিঁড়ার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসেন। তখন ঐ দুই বাটীতে অন্যান্য মহিলারা হরিধ্বনি (জয় রাম বোলা, জয় হরি বোলা, হর-গৌরি বসতি হওঁক) ও উলুধ্বনি করিয়া বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে বরের বাটীতে বরের মাতা এবং কন্যার বাটীতে কন্যার মাতা একটী প্রশস্ত রৌপ্যপাত্রে আবশ্যকমত ঐ উত্তোলিত জল লইয়া তাহাতে দধি, চন্দন মিশ্রিত করিয়া পানপাতা দ্বারা বর-কন্যার গাত্রে তাহা ছিটাইয়া দেন। তৎকালে এই প্রথাপোযোগী গীত গাওয়া হয়। এইরূপে সাত বার ছিটান হইলে পুরনারীগণ পুনরায় হরিধ্বনি ও উলুধ্বনি করেন। অসমীয়া হিন্দুগণ এই স্ত্রী-আচারকে "দৈয়ন দিয়া" এবং ঐ জলকে "দৈয়নর পানী" বলেন। এখানে একটী হাসির কথা বলি। বাঙ্গালা দেশে কোন বালিকা বিবাহের পূর্ব্বে রুগ্ন থাকিলে অথবা তেমন বাড়ান্ত না হইলে সাধারণতঃ লোকে উপহাস করিয়া বলেন, "বিয়ের জল পাবে, গায় পুষিয়ে যাবে।" অসমীয়া হিন্দুরা বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদের তদ্রূপ অবস্থা দেখিলে বলিয়া থাকেন "দৈয়নর পানী পালে গা বাঢ়নি দিব" অর্থাৎ—দৈয়নের জল পাইলে পুষ্ট হইবে। কোন কোন স্থানে বিবাহ-বাটীর কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতে পচা দই যোগাড় করিয়া রাখেন এবং 'দৈয়ন দিয়া' কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও অন্যান্যকে হাসাইবার জন্য নিদ্রিত পরিচিত ব্যক্তিগণের মুখে তাহা মাখাইয়া দেন। কামরূপের হিন্দুদিগের মধ্যে এই ধরণের 'দৈয়ন দিয়া' প্রথা প্রচলিত নাই। এই অঞ্চলে দেখা যায়—বর, কন্যা-

(৩) সধবা মাতা—তিনি সধবা না থাকিলে, কোন নিকট সম্পর্কীয়া সধবা মহিলা।

গৃহে যাত্রা করিবার জন্য যখন যাত্রা-ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, তথন দোলাবাহক তাঁহার গায়ে চটকানি দই-কলা দেয়। কামরূপে ইহাকেই 'দৈয়ন দিয়া' বলে। যাহা হউক, সেদিন বর অথবা কন্যাকে এই জলে স্নান করান হয় না। ঐ দিন মধ্যাহ্নে বরের বাড়ী বরের, কন্যার বাড়ীতে কন্যার জন্য পূর্ব্ববৎ নিয়মে জল তুলিয়া আনিয়া তাহাদিগকে স্নান করান হয়। তৎপরে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ অন্তে—[পরস্পর পরস্পরের আত্মীয় স্বজনকে পূর্ব্ব দিবস যে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখেন]—তাঁহাদিগকে ঐ সময় একটী ভোজ দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় হিন্দুদিগের নিমন্ত্রণ-প্রণালী

বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের বিবাহ আদি উৎসব উপলক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আহারের নিমন্ত্রণ করা অন্যতম চিরন্তন প্রথা। যে স্থানে কর্ম্মকর্ত্তার যাওয়ার অসুবিধা, তথায় উপযুক্ত প্রতি-নিধির দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবার রীতি আজিও প্রচলিত। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ক্রটী স্বীকার করিয়া পত্র লিখিতে হয়। এরূপ না করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ। পল্লীগ্রামে ও সহর অঞ্চলের হিন্দুগণ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবাসীদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কর্ম্মকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রজা-মণ্ডলীকে ও অন্য শ্রেণীর যে সকল লোকের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য আছে, তাঁহাদিগকেও তদুপলক্ষে বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে পারেন।

আসামীয়া হিন্দুদিগের নিমন্ত্রণ-প্রণালী

বঙ্গদেশে পুরুষ দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই নিমন্ত্রণ করা যায়; কিন্তু বিবাহোপলক্ষে আসাম অঞ্চলে নিমন্ত্রণ প্রণালী অন্যরূপ। যে সকল ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত তাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভূত হইলেও নব বস্ত্রাবৃত একটী 'সরাই' করিয়া পান-সুপারি সহ তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সরাই প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ-ভোজে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি 'সরাই' হইতে পান-সুপারি তুলিয়া লইয়া সরাই ও

বস্ত্র ফিরৎ দেন। রৌপ্য অথবা পিত্তলের সরাইয়ে পান, সুপারি দিয়া ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ না করিলে দেশাচার অনুসারে তিনি তাহা কদাচ গ্রহণ করেন না। যাঁহার রৌপ্য অথবা পিত্তলের সরাই না থাকে তিনি অন্যত্র হইতে ঐ সরাই আনিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সাধারণ-শ্রেণীর লোককে কাঁসা অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সরাই দ্বারা ঐরূপভাবে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। আসামে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীলোককে নিমন্ত্রণ করা প্রথাবিরুদ্ধ। স্ত্রীলোক অথবা তাহার প্রতিনিধি পুরুষ দ্বারা স্ত্রীলোককে নিমন্ত্রণ না করিলে, সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য। অসমীয়ারা পানের ডিবাকে 'টেমা বটা' ও পানপাত্রকে 'বটা' বলেন। সরাইয়ের গঠন বাঙ্গালা দেশের ধুনচির মত কতকটা। আয়তন অনুযায়ী সরাইয়ের মধ্যভাগ নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব-ধুনচির মত সঙ্কীর্ণ নহে। ধুনচির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ গভীর, কিন্তু সরাইয়ের উপরি-ভাগে কাঁসার 'রেকাব' থাকায় উহা তদ্রূপ আকৃতিবিশিষ্ট নহে। যাহা হউক, ঐ দিন সন্ধ্যাকালে বর, কন্যার পিত্রালয়ে যাত্রা করেন। তখন কুলনারীরা শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন।

সরাইয়ের আকৃতি

নিম্ন-আসামে বিবাহের দিন বর নিজ বাটিতে 'কলর গুরিত' স্নান করিলে পর তাঁহাকে বাটীস্থ প্রাঙ্গনে একটী আসনে বসাইয়া রাখা হয়। তৎপরে সুয়াগ (সুবাগ) তোলা' নামক একটী মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান হয়। ইহার বিষয় আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বলিব। এই অঞ্চলে বিবাহের দিন কন্যা পিত্রালয়ে 'কলর গুরিত' স্নান করিয়া যখন নববস্ত্র পরিধান করেন, তৎকালে মহিলারা গীত গাহিয়া থাকেন। কন্যার বাড়ীতে ও বরের বাড়ীতে মহিলাদিগের তৎকালীন একটী গীতের নমুনা, যথাঃ—

সোনা পিন্ধা রূপা পিন্ধা, পিন্ধা পাটর শাড়ী ;
দেবাঙ্গ-ভূষণ পিন্ধা ইন্দ্রে দিছে আনি।

* * * * *

আথে বেথে করি দৈবকী সুন্দরী, আনি দিলা পাটর ভুনি
পাটর ভুমুকা, চিতর পাগুরী, আনি দিলে রুক্মিণী ॥
পাটর পচরা, সোনার গলছোলা সর্ব্বগায়ে জিলিমিলি।
অতি বিতোপন আনিবা বসন সভাত যেন শুবাই ॥

কন্যার নববস্ত্র পরিধান করা হইলে বাটির মহিলারা তাহার ভ্রূ যুগলের মধ্যে সিঁন্দুরের টিপ অথবা তাহার সিঁথায় সিন্দুরের রেখা দিয়া থাকেন। যাহা হউক, ঐ উদ্ধৃত প্রাচীন গীত মধ্যে 'ভুনী' ও 'পাগুরী' নামক যে বস্ত্রদ্বয়ের নামোল্লেখ আছে, প্রাচীন বঙ্গভুক্ত শ্রীহট্ট অঞ্চলেও সেগুলি উৎপন্ন হইত। বিগত ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার বিজয়া পত্রিকা হইতে অবগত হওয়া যায়, "হবিগঞ্জের বাগ্‌বাড়ীর 'রায়'দিগের পরিবারে প্রাচীন বাঙ্গালী কবি বিপ্র জানকীনাথ রচিত ২১৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ১৪৭ বৎসরের একখানি বিস্তৃত পদ্মপুরাণ আছে। এই কবি উহার একস্থানে বস্ত্র-বর্ণনায় যে ১৭ রকম কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুপাটী, পাগুড়ী, পটকা, সাড়ী, মুগা, খনি ও টুপি ভিন্ন অন্যান্য বস্ত্রগুলি ৭০।৮০ বৎসর পুর্ব্বে অপ্রচলিত ছিল।" নিম্নে শ্রীহট্টীয় কবি জানকীনাথের রচিত ১৪৭ বৎসরের প্রাচীন পদটী উদ্ধৃত করা হইল :—

ভুনি গাবেড়া তুলে পাছেড়া দুপাটি।
জল পাগুড়ী তুলে পাইকে পিন্দে দড়ি ॥
পাগুড়ী পটকা তুলে পার্থরি বিস্তর।
সাড়ী মুগা খনি তুলে কদলির সর ॥
রক্তা বিচিত্র নারিচা তুলে গায়ের কাপাই।
তাকি টুপী তুলে যত তার লেখা নাই ॥

* বেগাঙ্গ-ভূষণ—অতি সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র বিশেষ। আথে বেথে করি—যত্ন সহকারে। চিতর পাগুরি—কার্পাস সূত্রের পাগড়ী। ভুনি—ধুতি। পচরা—চাদর। গলছোলা—কতুয়ার মত জামা বিশেষ। শুবাই—ভাল দেখায়। জিলিমিলি—ঝক্‌ঝকে।

পূর্ব্ব কথিত 'দৈয়ন দিয়া'র পর বেলা ৮।৯ টার সময় বর বা কন্যাকে পূর্ব্বদিনের তোলা জল দিয়া স্নান করান হয়। বর বা কন্যা স্নানান্তে নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধান্তে বর বা কন্যা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া সুসজ্জিত হইয়া আসরে (বর বাহিরে ও কন্যা অন্দরস্থ আসরে) বসেন। কন্যাপক্ষীয় মহিলারা আসরে শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী, উষা-অনিরুদ্ধ বা হর-গৌরি বিষয়ক 'বিয়ানাম' গাহিতে থাকেন। বর-কন্যার আসর উভয় স্থানে এইরূপে অপরাহ্ণ ৩।৪টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে।

সন্ধ্যার পর মহিলারা আবার সমবেতা হইয়া ঢুলি, সানাই আদি বাদ্যকর এবং আলো ও মশাল লইয়া নিকটস্থ নদী বা পুষ্করিণীতে 'পানী' তুলিতে যান। ঐ নদী বা পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া মহিলারা 'পানীতোলা' মহিলা-দিগকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া উলুধ্বনি করেন। তখন প্রধানা 'পানীতোলা মহিলা' (সাধারণতঃ বর বা কন্যার সধবা মাতা বা অন্য নিকট সম্পর্কীয়া মহিলা) একখানি ছুরি লইয়া জলের উপর একটী যোগ চিহ্নের (+) মত কাটিয়া অপদেবতা তাড়ান। তারপর তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ত্রিশকোটী দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া জল তোলেন। তৎপরে অন্যান্য 'পানীতোলা' মহিলারা জল তোলার পর পুনরায় 'বিয়ানাম' গাহিতে গাহিতে বাদ্যকরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রত্যাগমন করেন। তাহারা বাটী আসিয়া এই উত্তোলিত জল দ্বারা বর বা কন্যাকে স্নানাগারে (বেই) স্নান করাইয়া আবার হরিধ্বনি ও উলুধ্বনি করেন। এই স্নানাগার সাধারণ স্নানাগার হইতে পৃথক্। পূর্ব্বে আমরা 'বেই'এর কথা বলিয়াছি। এই জিনিসটী কিরূপ তাহা জানিবার জন্য বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের আগ্রহ জন্মিতে পারে। উপর-আসামে ও মধ্য-আসামে হিন্দুরা পুত্র-কন্যার

বেই

বিবাহ উপলক্ষে বাটীর প্রাঙ্গণের এক কোণ আবরু করিয়া তথায় একটী নাতিউচ্চ চতুষ্কোণ বেদি প্রস্তুত করত তাহার

উপর একটী পীড়া পাতে। এই বেদির চারি কোণে চারিটী খোঁটা পুতিয়া রাখে। পরে ঐ খোঁটার প্রত্যেকটীর সহিত একটী চারা কলাগাছ বসান হয়। অসমীয়া ভাষায় চারা কলাগাছকে 'কলপুলি' বলা হয়। অসমীয়া হিন্দুরা এই খোঁটাগুলির গায়ে সাধারণতঃ কার্পাস সূত্রদ্বারা সিন্দুর-সংযুক্ত আম্রপত্র বন্ধনপূর্ব্বক ঝুলাইয়া রাখেন, এবং ঐ খোঁটা চারিটীর অগ্রভাগে চারিটী কলসির মুখ প্রবিষ্ট করাইয়া উহাদের উপরিভাগ হইতে নিম্নে অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত এরূপভাবে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে যে, ঐ বস্ত্রবেষ্টনী দর্শন মাত্র কতকটা মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের হিন্দুগণ এই স্নানাগারকে 'বেই' বলেন।

বর ও কন্যার বাটীর মহিলারা 'বেই'এর পার্শ্বে জল তুলিবার পাত্রগুলি রাখিয়া 'নোয়নি'র গান (স্নানের গান) গাহিতে গাহিতে বর ও কন্যার বস্ত্রপ্রান্ত ধারণ করিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে সেখানে আনয়ন করেন। জনৈক স্ত্রীলোক একটী পিত্তলের থালায় আতপ চাউল ও তদুপরি একটী মৃৎপ্রদীপ রাখিয়া তাহাদের অগ্রগমন করিতে থাকেন। এই পাত্রটীকে 'আরতি ভুরলী' বলা হয়। ইহা একটী মাঙ্গলিক চিহ্ন। তৎপরে বরের বাটীতে বরকে এবং কন্যার বাটীতে কন্যাকে 'বেই' প্রদক্ষিণ করাইয়া পীড়িতে বসান হন। তখন মহিলারা জনে জনে 'মাহ-হালধি' (বাটা মাষকলাই ও কাঁচা হলুদ) মাখান। 'মাহ-হালধি' মাখান হইলে 'পানীতোলা' মহিলা তাঁহার জলপূর্ণ কুম্ভ হইতে জল লইয়া বর ও কন্যার মাথার উপর দশবার জল ছিটান। সেই সময় ঘন ঘন উলুধ্বনি হইতে থাকে। তৎপরে একটী বাঁদী বা গোলাম একটী কাঁসার 'গামলা'তে জল লইয়া বর ও কন্যার পদ প্রক্ষালন করে। এই কার্য্যের জন্য বর ও কন্যা স্বহস্তে তাহাকে একটী টাকা ও একখানি গামছা অথবা চাদর উপহার দেয়। পদপ্রক্ষালনান্তর মহিলারা একে একে নিজ নিজ কুম্ভ হইতে বর ও কন্যার গায়ে জল ঢালিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মহিলারা উলুধ্বনি ও 'নোয়নি

নাম' করিতে থাকেন। এইরূপ ভাবে 'নোয়নি' (স্নান) হইয়া গেলে বর, কন্যার বাড়ীতে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত নিজ বাটীস্থ আসরে এবং কন্যা বরাগমন পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে অন্দরমহলস্থ আসর মধ্যে সখি-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া থাকে। এই সখিরা পৌরাণিক বিবাহ-গীতি গাহিতে থাকেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আসামে ৩ দিন, ৫ দিন অথবা ৭ দিন ধরিয়া বিবাহের অনুষ্ঠান কার্য্য চলিয়া থাকে। মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-দিবস হইতে বিবাহ-দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে কয়েকটী স্ত্রী-আচার অন্তে এই মন্দির (বেই) মধ্যে বরকে স্নান করাইবার কালে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বেদির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করত 'নাম' গাহিয়া থাকেন। সেইদিন বরের ঘরে বরকেই কেবল এই মন্দির মধ্যে স্নান করান হয় না—কন্যার ঘরে কন্যাকেও তদ্রূপ নিয়মে স্নান করান হইয়া থাকে। 'বেই' তৈয়ার করিতে কোন ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না। অনেক স্থানে এরূপ প্রথা আছে যে, 'বেই' পাতিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানের মধ্যভাগে একটী মাটীর হাঁড়ীতে আধসের আন্দাজ আতপ চাউল, একটী হংস ডিম্ব ও একটী রৌপ্য মুদ্রা পুতিয়া রাখা হয়। বিবাহ সম্পাদনের তৃতীয় দিবস পরে উহাকে বাহির করিয়া অন্যান্য খাদ্যাদি সহ কোন একটী ভিক্ষুককে দেওয়া হয়। 'বেই'এর আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কতখানি হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। ইহা প্রস্তুত কালে বাড়ীর লোকেরা সুবিধামত চতুষ্কোণযুক্ত পরিসর করিয়া লন।

ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় 'বিবাহোৎসব ও কলর গুরিত গা ধুয়ান' প্রসঙ্গে অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহোৎসব সাধারণতঃ ৩ দিন ধরিয়া হইবার কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা মধ্য-আসাম ও উপর-আসাম অঞ্চলের হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল দেখিতে পাই। নিম্ন-আসামের হিন্দুদিগের এই উৎসব কাল ১ দিন মাত্র। এই অঞ্চলের হিন্দু

নিম্ন-আসামে বিবাহোৎসব কাল ও বর-কন্যার কলর গুরিত গা-ধুয়া

শ্রেণীর বরকন্যার বিবাহের দিন সূর্য্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে 'কলর গুরিত' ব্যতীত 'বেই' এ স্নান করিবার প্রথা একাবারেই নাই। এই দিন বরের বাটীতে বরের মাতা এবং কন্যার বাটীতে কন্যার মাতা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আত্মীয়গণ ও গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এবং কয়েক জন বাদ্যকরকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া গীত গাহিতে গাহিতে নদী অথবা পুষ্করিণীর ঘাটে যান। বাটী হইতে বাহির হইবার কালে বর ও কন্যার মাতা এবং সম্পর্কীয়া স্ত্রীলোকেরা ঘট এবং একখানি ডালায় করিয়া প্রদীপ, হরীতকী প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য লন। তাঁহারা এই ঘটে করিয়া জল তুলিয়া আনিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়া দেন। এই দিন বাড়ীর লোকেরা ৪।৫ ঘটিকার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে উঠানের এক পার্শ্বে একটী কলাগাছ আনিয়া পুতিয়া রাখে। তাহার তলদেশে বর-কন্যার স্নানের জন্য কয়েকটী খণ্ডিত কদলীকাণ্ড পাতিয়া আসন করিয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বর ও কন্যাকে এই আসনে বসাইয়া মাতা ও অন্যান্য সম্পর্কীয়া স্ত্রীলোকেরা তাহাদের উভয়ের গায়ে মাসকলাই ও হরিদ্রা মাখাইয়া উক্ত ঘটের জল দিয়া স্নান করাইয়া দেন। চূড়াকরণ উপলক্ষে মধ্যাহ্নকালে এইরূপভাবে স্নান করিতেও আমরা দেখিতে পাই।

বর যখন বিবাহার্থ কন্যার বাটীতে যাত্রা করিবার উৎযোগ করেন তৎকালে বাটীর মহিলারা 'সুয়াগ-তোলা' নামক একটী মঙ্গলানুষ্ঠান করেন। বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিম্ন-আসামের ধুবড়ী মহকুমায় ইহাকে 'সোহাগ-তোলা', কামরূপ অঞ্চলে 'সুয়াগ-তোলা', মধ্য-আসামের তেজপুর অঞ্চলে 'সুয়া (সুৱা) ভাগ তোলা' এবং উপর-আসামের শিবসাগর অঞ্চলে 'সুয়াগুরি-তোলা' বলা হয়। ধুবড়ী মহকুমার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মহিলাগণ কেবল বিবাহের দিন 'সোহাগ-তোলা'র অনুষ্ঠান করেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা দোলায় উঠিয়া সঙ্গিনীগণসহ 'সুয়াগ-তুলি'তে যান।

সুয়াগ-তোলা

গৌহাটী মহকুমা অঞ্চলে সুয়াগ-তোলা

উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুগণ নিজ বাটীতে সুয়াগ তোলা অন্তে বিবাহার্থ কন্যার বাটীতে যাত্রা করেন। কামরূপে গৌহাটী মহকুমার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের কিরূপে ইহার অনুষ্ঠান হয়, এক্ষণে তাহা বলা যাউক। সেখানে আমরা দেখিতে পাই—'কলর গুরিত' বরকে স্নান করাইবার পর তাঁহাকে বাটীস্থ প্রাঙ্গনে এক আসনোপরি বসাইয়া রাখা হয়। বর, কন্যার বাড়ীতে যাত্রা করিবার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মাতা গ্রামের স্ত্রীলোকবৃন্দ ও আত্মীয়গণ সহ একটী ডালায় করিয়া চাউলের দোনা, প্রদীপ, হরীতকী, আতপ চাউল, মৃদ্‌ঘট প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া কোন একটী পুষ্করিণী বা নদীর ঘাটে [বরকে স্নান করাইবার জন্য প্রাতে যেখান হইতে জল উত্তোলন করা হইয়াছিল সেখানে] গমন করেন। তৎকালে ঐ স্ত্রীলোকেরা গীত গাহিতে গাহিতে, ঢুলিয়ারা ঢোল এবং খুলিয়ারা খোল বাজাইতে বাজাইতে তাহাদের পশ্চাৎ গমন করে। বরের মাতা, খুড়ি অথবা পিসি ৩, ৫ বা ৭ বার ঐ নদী অথবা পুষ্করিণীতে ডুব দেন। প্রতিবার জল হইতে মাটী তীরে তুলিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ হস্ত অথবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন দুইটী উচ্চ 'দোল' বাঁধেন এবং উহার চতুর্দ্দিকে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত 'খরিকা' (উলুখড়) পুতিয়া দেন। ঐ উলুখড়ের
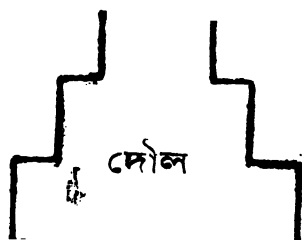
চতুর্দ্দিকে সূতার বেড় দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি জলে নামিয়া ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়া স্থলে উঠিলে জনৈক আত্মীয়া তিনটী আম্রপল্লব দ্বারা তাঁহাকে কোমলভাবে স্পর্শ করত জিজ্ঞাসা করেন, 'কি দেখিলে?' তদুত্তরে বরের মা বলেন, 'ঢোলর কুব' অর্থাৎ ঢোলের বাজনা। অতঃপর ঐ উত্তোলিত মৃত্তিকার কিয়দংশ উপরিউক্ত ডালায়, দোনায় ও 'দোল'এ

দেওয়া হইলে পুনরায় তিনি জলে নামিয়া ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়া আনিয়া ঐরূপ করেন। দেশীয় প্রথা অনুসারে ৩ বার ৫ বার অথবা ৭ বার এইরূপ করিবার পর, আর একবার তিনি স্নান করেন—সেবার মাটী আনেন না, স্থলভাগে উঠিয়া গা মুছিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করেন। অতঃপর ৩ বার অথবা ৭ বার জলে আতপ চাউল ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই চাউল ফেলিবার কালে দুইজন অথবা তিনজন আত্মীয়া উহা হইতে কিছু পরিমাণ লইয়া রাখেন। তৎপরে বরের মা তিনজন, অথবা পাঁচজন আত্মীয়া সধবা স্ত্রীলোকের আঁচলে আতপ চাউল ফেলিয়া দেন। ইহার পর তিনি পুনরায় স্নান করিয়া মুখে জল ভরিয়া লন ও শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। ফিরিবার কালে এক ব্যক্তি কোদাল দ্বারা রাস্তায় গর্ত্ত কাটিতে কাটিতে যায়। একজন স্ত্রীলোক ঐ গর্ত্তে মিশ্রিত দুগ্ধ-কদলি দিয়া যায়। বরের মাতা কয়েকটী উলুখড় সংযোগে এই দুগ্ধ কদলির কিয়ৎ পরিমাণ তুলিয়া তুলিয়া একটী কংসপাত্রে রাখেন। এই পাত্রে পূর্ব্ব হইতে একটী টাকা, চাউল ও মাসকলাই রাখা হয়। বরের মাতা বাটীর প্রাঙ্গনে পৌঁছিলে দুইজন স্ত্রীলোক বরের মস্তকোপরি একখানি বস্ত্র প্রসারিত করত ধারণ করেন। বরের মাতা তখন তাহার সম্মুখে ৫ বার অথবা ৭ বার প্রদক্ষিণ করিলে ঐ কাংস পাত্রস্থ টাকা বরের মস্তকোপরি ধৃত কাপড়ের উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। কাপড়খানির এক দিক নীচু করিয়া দিলে জনৈক ব্যক্তি টাকাটী ধরিয়া লন। তৎপরে পাত্রস্থ চাউল ও মাস-কলাইয়ের কিয়দংশ ঐ কাপড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বর উপরিউক্ত টাকাটী তাম্বুল ও পানসহ একটী বাটায় করিয়া তাহার মাতাকে দিয়া প্রণাম করেন। এই সময় তিনি তাঁহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মুখচুম্বনপূর্ব্বক ঐ টাকাটী ফিরৎ দেন। অনন্তর সুয়াগ্-তোলার সময় মুখে করিয়া আনিত জল তিনি ফেলিয়া দেন এবং একটী কংসপাত্র হইতে একটী চাউল লইয়া তাঁহার পুত্রের মুখে দিয়া থাকেন।

কন্যার বাটীতে কন্যার মাতা কন্যাকে 'কলরগুরিত' স্নান করাইয়া দিবার পর তাহাকে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহার সিঁথায় অথবা ভ্রূ যুগলের মধ্যে সিন্দুর দেন। তৎপরে ঐরূপ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু জলে ৩, ৫ কিংবা ৭ বার ডুব দিয়া মাটী আনিয়া 'দোল' বাঁধিবার পরিবর্ত্তে তিনি অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ দুইটী ছোট ছোট পুষ্করিণী খনন করেন। ইহাতে চাউল, পান, পয়সা, শ্বেত পুষ্প ফেলিয়া দেওয়া হয়। কন্যার মাতা স্নান করিয়া উঠিলে সঙ্গিনী আত্মীয়ারা আম্রপল্লব দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'কি দেখিলে?' তদুত্তরে তিনি বলিয়া থাকেন, 'শিব দুর্গায় বিয়না'। কন্যার বাড়ীতে সুয়াগ্ তোলার পর কন্যাকে নব বস্ত্র পরিধান করান ও তাহার মস্তকে সিন্দুর দেওয়া হয়। অতঃপর তাহার মাতা তাহাকে ঘরের মধ্যেই আসনে বসাইয়া রাখেন।

বিবাহের দিন বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যে একটী শুভক্ষণে বর ও কন্যার বাটীর পাঁচ জন অথবা সাত জন সধবা স্ত্রীলোক মিলিত হইয়া জল সহিয়া থাকেন। প্রথমে তাঁহারা শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ও উলুধ্বনী দিতে দিতে কোন দেবতাস্থানে যান। যখন তাঁহারা সেখানে যান, তখন তাঁহাদের হাতে পান, সুপারি, সন্দেশ, তেল, হলুদ, একটী গাড়ু ও একটী ঘটী বা মৃৎঘট থাকে। পূর্ব্বে এই সময় ঢুলিয়ারা তেওট তালে বাদ্য করিত। ইহার মধ্যে সাতটী তাল আছে। বর কন্যার ত্রিকালের মঙ্গল সাধনের জন্যই তেওট তালে ঢোল বাজানর উদ্দেশ্য। জনৈক সধবা যাইবার পথে ঘটি করিয়া কোন পুষ্করিণী হইতে জল তুলেন। তাঁহারা গাড়ুর জল ঢালিতে ঢালিতে নিকটস্থ দেবতাস্থানে গিয়া ঐ সকল বস্তু রাখিয়া দেন। জনৈক মহিলা সেখানকার সধবা ব্রাহ্মণীকে আলতা ও সিন্দুর পরাইয়া দিলে পর তিনি ঐ ঘটের দুই পার্শ্বে তিন বার করিয়া ছয় বার জল ঢালিয়া দিয়া উহার মধ্যে আর তিন বার জল ঢালিয়া দেন। এয়োরা সেখানে পান

পশ্চিম-বঙ্গে জল সহা প্রথা

দিয়া ঘটটিকে বরণ করিবার পর ঐ ব্রাহ্মণীকে পান, সুপারি, সন্দেশ প্রভৃতি দেন। তৎপরে তাঁহারা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে করিতে ঐ ঘট লইয়া পাঁচ বাড়ীতে যান। বাড়ীর সধবারা জল দিলে তাঁহারা পান, সুপারি, হরিদ্রা, সন্দেশ প্রভৃতি প্রদান করিয়া বিবাহ-বাটীতে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর বরের বাটীতে বর এবং কন্যার বাটীতে কন্যা যখন কলাতলায় স্নান (৪) করে, ঐ সধবারা তাহাদের মস্তকে সহা জল ঢালিয়া দেন। তৎপরে এয়োরা ঐ কলাগাছের গাত্রে জড়িত চরকা-জাত সূতা খুলিয়া লইয়া কন্যার বামহস্তে তিন পাক এবং বরের দক্ষিণহস্তে তিন পাক জড়াইয়া দেন। পূর্ব্বে পঞ্চতীর্থ হইতে জল সংগ্রহ করিয়া ঐ জল দ্বারা বিবাহাদি সংস্কারের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত। জল সহা ব্যাপারটা উক্তরূপ অভিষেক ক্রিয়ারই অনুকল্পে যে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীতি করা যাইতে পারে। যাহা হউক, বাসী বিবাহের দিন বর-কন্যার মাথায় এই জল একটু দিবার জন্য সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয়। অনুসন্ধানান্তে জানা গিয়াছে যে, গুরুস্থানীয় কোন ব্যক্তির শাড়াশব্দ না পাওয়া গেলে বঙ্গীয় সধবারা বিশেষ সতর্কভাবে মৃদুকণ্ঠে 'জল সহার' সময় পূর্ব্বে গীত গাহিতেন। বর্ত্তমানে তৎকালে বঙ্গ-মহিলার গীত গাহিবার রীতি নাই। নিম্নে তাঁহাদের তৎকালীন গানের একটী নমুনা দেওয়া হইল :—

জল সহার গান—

"সই লো সই মকর গঙ্গাজল,
আজ হবে কামিনীর বিয়ে
সইতে যাব জল।

(৪) কলাতলার স্নান—উঠানের মধ্যে চারিদিকে চারিটী কলার ডাল পোতা হয়। এই স্থানের মধ্যে একটী শীল থাকে। বর বা কন্যা তদুপরি বসিয়া স্নান করেন। তাহাকে 'কলাতলার স্নান' বলে।

উলু দিয়ে শাঁক বাজায়ে
বরণ ডালা মাথায় লয়ে
জলের ঝারা হাতে করে
জল সইতে চল।"

মনূক্ত রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ বরের বাটীতেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু ব্রাহ্ম, দৈব প্রভৃতি বিবাহ কন্যার বাড়ীতেই প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদ সংহিতাতেও কন্যার বাড়ীতে বরের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, ১৮৬৫—৬৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুজাতীয় বরেরা কর্ণে স্বর্ণের 'বীরবৌলি', কণ্ঠে 'হার', হস্তে 'বালা' ও বাহুতে 'বাজু' নামক অলঙ্কার পরিধান করিয়া কন্যার বাড়ীতে যাত্রা করিতেন। বর্ত্তমানে কেবল হারের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 'উজনীয়া' অঞ্চলে দেখা যায়, "বর যখন হস্তে গামখাড়ু নামক অলঙ্কার পরিধান করিয়া একদল গাহিকা-পরিবেষ্টিত হইয়া আত্মীয়-স্বজন সহ কন্যার বাড়ীতে যাত্রা করেন, তখন তাহার সহিত "ডামলি ভার" (হোমের ভার) যায়। 'নামনি' আসামের বড়পেটা হইতে মঙ্গলদৈ পর্য্যন্ত অঞ্চলে বরের সহিত একদল স্ত্রীলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যার বাটীতে গীত গাহিতে গাহিতে গমন করে। তাহাদের সহিত ঢুলিয়ারা থাকে। এই স্ত্রীলোকদিগকে নিমন্ত্রিত করিতে হয় না বলিয়া তাহারা কোনরূপ পারিশ্রমিক পায় না। বরকর্ত্তা তাহাদের প্রত্যেককে কেবল মাত্র সিধা দিয়া থাকেন। বরের প্রতিবাসিনী কলিতা, কেওট বা কৈবর্ত্ত, কোঁচ প্রভৃতি জাতির কতিপয় স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া থাকে। সিধার পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য অনেক সময় বরকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মহিলাদিগকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। যাহা হউক, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দেখা যায়, "বরের বাড়ী কন্যার বাড়ী হইতে ১০।১২ মাইলের অধিক দূরে এবং বিবাহ

কন্যাগৃহে বরযাত্রা

দারুণ গ্রীষ্ম অথবা বর্ষা কালে হইলেও সঙ্গিনী মহিলাগণ স্বেচ্ছায় ও উল্লাসে এই দীর্ঘ পথ গীত গাহিতে গাহিতে কন্যার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন। সাধারণতঃ অন্যূন ১১।১২ বৎসর হইতে ৪০।৪৫ বৎসরের মধ্যে উপরিউক্ত যে কোন জাতির যে কোন বয়স্কা মহিলা বরের সঙ্গিনী হইতে পারে। কন্যাগৃহ অধিক দূরবর্ত্তী না হইলে কুমারীগণও তাহাদিগের দল বৃদ্ধি করিয়া থাকে।" আমরা জানি [কেবল অনুসন্ধানে নহে] নিম্ন-আসামে বরের কোন সঙ্গিনী পথক্লান্ত হইয়া বিপন্ন হইলে বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ তাহাদের শুশ্রূষা সম্পাদনে ঔদাসিন্য দেখান। ইহা অবশ্য কতিপয় স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিশেষের কথা। যাহা হউক, মধ্য-আসাম ও উপর-আসাম অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীর বর যখন কন্যার বাটীতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সহিতও 'ডামলি' ভার যায়। এই ডামলি ভারের মধ্যে থাকে—১। হোমের দণ্ডবাড়ি, ২। মৃৎ অথবা পিত্তলের ঘট, একটী ধান্যের শিষ, একখণ্ড ছোট পাথর, ক্ষীর, প্রদীপ 'তৈল' ঘৃত, খৈ, কুমারের চরু, বরের জলখাবার, ৩। ফুল, তুলসি, নৈবেদ্য প্রভৃতি ; ৪। কোশাকুশী। পূর্ব্বে 'গোলাম'রা এই ভার বহন করিত। এক্ষণে গোলাম না থাকায় অনেকেই ইহা বহন করিতে লজ্জা বোধ করে। যাঁহার বাটীতে ভৃত্য নাই, এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বাহক নিযুক্ত করিতে আজকাল অনেক সময় বড়ই বেগ পাইতে হয়।

ডামলি ভার

সরকারী রাস্তা ছাড়িয়া যে রাস্তা দিয়া বাড়ীর প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত যাতায়াত করা হয়, অসমীয়ারা তাহাকে 'পদুলি' বলেন। উপর-আসামে এই পদুলির শেষ প্রান্তস্থ ফটক-দ্বারের সমীপবর্ত্তী 'কলর গুরিত' (৫) বর

(৫) কলরগুরি—অসমীয়া হিন্দুকন্যাগণ এই 'কলরগুরি'তে স্নান করেন না। বরকে সম্বর্দ্ধনার জন্যই এখানে কয়েকটী কলাগাছ পুতিয়া রাখা হয়। 'কলর গুরিত' শব্দের অর্থ—কলাগাছের নিকট।

উপস্থিত হইলে কন্যার পিতা, খুড়া ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুরোহিতকে লইয়া গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, মাল্য, বস্ত্র ও তাম্বুল সহ তাঁহাকে [বিষ্ণুস্বরূপ ভাবিয়া] সম্বর্দ্ধনা ও পূজা করিতে উপস্থিত হন। মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠান হেতু এই 'কলরগুরি' হইতে ৪।৫ নল (১ নল = ৮ হাত) দূরে পূর্ব্ব হইতে অল্পস্থান পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশীয় 'মহাপুরুষীয়াগণ দোলা'য় উঠিয়া উক্ত পূজাপোকরণাদি ও নানাবিধ বাদ্যধ্বনি সহ 'বড়গীত' গাহিতে গাহিতে বরকে অভ্যর্থনা করিতে 'কলরগুরিত' যান। ইহার পর বরপক্ষের স্ত্রীলোকদল সাধারণতঃ কয়েকটী কৌতুকপ্রদ গীত গাহিয়া থাকেন। নিম্নে তৎকালীন দুইটী গীতের নমুনা দেওয়া হইল :—

১। কলর গুরিত গোয়ানাম

শলাগ লৈ জেঠেৰি মুচুকাই হাঁহিলে
বৈনাই বৰ ভাল বুলি হে।
অলপে মতীয়া বৈনাই কুমলীয়া
ছত্র ধৰিছে তুলি হে॥

শহুৰৰ পদূলি দকা-দমকা
কি ফুল ফুলিলে হালি হে।
পিন্ধিবৰ মন গল জেঠেৰি বৈনাই
ইন্দ্র মালতীৰ চাকি হে॥

শহুৰৰ মৰমে বাৰু দেখিলে
চপাই কল গুৰিত থলে হে।

শলাগ—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কুমলিয়া—কোমল। দকা-দম্‌কা—উচুনীচু। হালি—হেলিয়া। চাকি—মণ্ডল। বারু—ভাল। চপাই—ধরিয়া আনিয়া। কল—কলাগাছ। গুরিত—গোড়াতে। থলে—রাখিল।

শাহু আইৰ মৰমে নিচেই নিদাৰুণে
জীয়েকক পঁইতা যাচে হে ॥
জীয়েকে বুলিছে মই কিয় খামে
স্বামী কলৰ গুৰিত আছে হে।
কিনো কলপুলি কলা ঐ জেঠেৰি
হালি জালি পৰে হে ॥

অর্থাৎ—'জেঠেরি' (জ্যেষ্ঠশ্যালক) 'বৈনাই' (ভগ্নীপতি)কে বড় ভাল বলে ধন্যবাদ (শলাগ) দিয়া মুচ্‌কে হাস্‌লে। ভগ্নীপতি কোমল অর্থাৎ কচি বয়সের বলে, তার মাথার উপর ছাতা তুলে ধর্‌লেন। শ্বশুরের [পদুলি—বাড়ী ও উঠানের রাস্তা; ইহাকে তোরণ-দ্বার (ফটক-পথ) বলা যায়] ফটক-পথ আলো-ছায়ায় মেশান, স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। ভগ্নীপতির কিন্তু ইন্দ্রমালতী (চন্দ্রমালতী) ফুলের মালা পরবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু ফটক-পথের সেই ফুল ইন্দ্রমালতী কিনা জানা গেল না; শ্বশুর মহাশয়ের স্নেহ ভাল করে দেখা গেল; তিনি কলাগাছের কাছে [অর্থাৎ জামাইয়ের অভ্যর্থনার জন্য যেখানে কলাগাছ রোপণ করা হইয়াছিল, সেইখানে] জামাইকে আদর করে রেখে গেলেন। [ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হয়েছে] শাশুড়ী মায়ের স্নেহও অত্যন্ত নিদারুণ, তিনি নিজের মেয়েকে (পঁইতা) পান্তা ভাত খেতে দিলেন; আর মেয়ে মাকে বল্‌লে, "আমি কেন খাব—খাব না; কারণ, আমার স্বামী [ফটকপথস্থ] কলাগাছের কাছে এখনও রয়েছেন, তাঁকে এখনও অভ্যর্থনা করে ঘরের ভিতর আনা হয় নাই। [জামাই বলছেন] ওগো 'জেঠেরি' তুমি কি রকম চারা 'কলপুলি' (কলাগাছ) পুত্‌লে বল দেখি? সে যে দুলে দুলে কাত্‌ হয়ে পড় পড় হচ্ছে দেখ্‌ছি। [ইহা ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হইয়াছে]।

আইর—মাতার। নিছেই—একেবারেই। পঁইতা—পান্তাভাত। খামে—খাইব। কিনো—কি প্রকারে। হালি-জালি—হেলেদুলে।

২। কলরগুরিত গোয়ানাম

হাতি দাঁতৰ ফণিখনি ৰত্নৰে চিতিকা।
মিলিছে বিচিত্র কেশ ধুৱায়ে চণ্ডিকা॥
কলৰ গুৰিত থিয় হৈ বাপুৱে কেইথন লিখিলা গাঁও।
সকল আয়তী বেঢ়ি ধুৱায়ে অকল মাকৰ নাও॥
গা ধুই উঠি চানা বাপুৱে পটুয়াত দিলা ভৰি।
তোমাৰ চেনেহৰ দদাই নিব কোলা কৰি॥**

ইহার পর কন্যার মাতা সঙ্গিনীগণসহ সুয়াগ্ তুলিতে নদী অথবা পুষ্করিণীতে যান। উপর-আসামে বরের বাটীতে সুয়াগ্-তোলা'র প্রথা নাই। এই অঞ্চলে ও মধ্য-আসামে কন্যার মাতার সুয়াগ্ তুলিতে যাওয়া সম্বন্ধে একটী প্রচলিত কথা আছে, "দরা দেখি সুয়াগুরি তোল। কথাটী শুনি কথাটী বোল।" এক্ষণে সেই সময়ের কথা বলা যাউক। বর কন্যার বাড়ীতে 'কলরগুরিত' আসিয়া উপস্থিত হইলে ঐ সঙ্গিনীগণ উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া—বাটীর সম্মুখস্থ যে রাস্তা দিয়া বর আসিয়াছিলেন সেই রাস্তা দিয়া—কন্যার মাতা, ঢুলিয়া ও অন্যান্য বাদ্যকর সমভি-ব্যাহারে গীত গাহিতে গাহিতে সুয়াগ্ তুলিতে যাত্রা করেন। কিন্তু এই অঞ্চলে কন্যার মাতার কোন জলাশয়ের সান্নিকটে এই শুভানুষ্ঠানের কালে ঢুলিয়াদিগকে লইয়া যাইবার প্রথা নাই। তাঁহার দুইজন সঙ্গিনী একটী ডুনরী (৬), জল তুলিবার জন্য একটী মৃদ্ ঘট ও

উপর-আসামে কন্যার বাড়ীতে সুয়াগ্-তোলা

** ফণি—চিরুণী; চিতিকা—ফোঁটা; থির—স্থির; আকল—একমাত্র; নাউ—নাম; পটুয়াত—কলার খোলা; ভরি—পা; চেনেহর—স্নেহের।

(৬) ডুনরী—ইহা আসাম দেশীয় 'বাণবাটী'র মত মৃৎপাত্র বিশেষ। বাণবাটীর মুখ খোলা কিন্তু ইহার মুখে ঢাকনি থাকে। প্রথম 'টেকেলি দিয়া'র দিন হইতে 'খোবা খুবি'র দিন পর্য্যন্ত 'ডুনরী' বিবাহের শুভ কাজে আবশ্যক হয়। ধনী ব্যক্তিরা স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের ডুনরী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

একখানি কাঁসার থালায় ৭টী কিংবা ৯টী প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ (শলা), যৎকিঞ্চিৎ গুড়া চাউল, পান, সুপারি ও একটী পয়সা রাখিয়া সেগুলিকে মাথায় করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হন। সুয়াগ্ তুলিতে যাত্রা করিবার কালে কোন কোন রসিকা যুবতী "বারীরে এরাপাত বহি থাক, দরাপাত আমি সুয়াগুরি তোলো হে"—ইত্যাদি ধরণের গীত গাহিয়া থাকেন। যাহা হউক, জামাতা পুত্রস্থানীয় বলিয়া তাঁহাকে বামদিকে রাখিয়াই কন্যার মাতাকে যাইতে হয়। তৎকালে জনৈক বয়োবৃদ্ধা (গাঁয়ের ঠানদিদি গোচের) মস্তকে কুলা অথবা ধুচনী লইয়া গীত সহকারে নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের সহগমন করেন। বৃদ্ধার এই নাচনকে অসমীয়ারা কুলার বুড়ী নাচন (৭) বলেন।

কুলার বুড়ী-নাচন

সত্রাধিকারী গোস্বামীদিগের ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে এই বৃদ্ধা (কুলার বুড়ী) "গোপাল হে খরিকা-ঝাই সুয়াগ্ তুলিবলৈ যায় হে" সাধারণতঃ এই ধরণের পদটুকু গাহিবামাত্র জনৈক সঙ্গিনী "কৃষ্ণের বিক্রম দেখি ঋক্ষরাজ পরম বিস্ময় মনে হে" এইরূপ একটী কীর্ত্তন পদের এক পংক্তিমাত্র গাওয়া শেষ হইলেই দলের অন্যান্য সঙ্গিনীরা "গোপাল হে খরিকা-ঝাঁই সুয়াগ্ তুলিবলৈ যায় হে" পদটীর পুনরাবৃত্তি করেন। এইরূপভাবে গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহারা 'কলরগুরি' হইতে পূর্ব্বোক্ত ৪।৫ নল দূরে পরিস্কৃত স্থানে কংসপত্রে আনিত গুঁড়া চাউল মাটির উপর ঢালিয়া দেন এবং তিন দিকে তিনটী শক্ত 'খরিকা' (উলুখড়) পুতিয়া মাড়শূন্য অথবা অসিদ্ধ সূতার দ্বারা সেগুলিকে আবৃত করত উহাদের উপর দিয়া পান, পয়সা ও আতপ চাউল ফেলিয়া দেন এবং তৎপরে নদী অথবা পুষ্করিণীতে সুয়াগ্ তুলিতে যান। জামাতার বাম পার্শ্বস্থ পথ দিয়া আসিবার কালে

(৭) কুলার বুড়ী নাচন—উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের বহুস্থানে সাধারণ ব্যক্তি-গণের বাটীতে 'সুয়াগ্ তোলা' উপলক্ষে একজন স্ত্রীলোক কুলা ধরে এবং বাদ্যস্বরূপ লাঠির দ্বারা যখন এই কুলার উপর আঘাত করা হয়, তখন আর একজন চপলা স্ত্রীলোক নৃত্য করে। সে গীতগুলি সাধারণতঃ রসাত্মক।

তাহাকে দেখিতে পাওয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিষিদ্ধ বলিয়া 'বড় জাপী' বা কাপড় দিয়া বরকে আড়াল করা হয়। ইঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত বর ও তাহার সহচরীগণকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হয়। তাহারা ফিরিয়া আসিলে একটী বালিকা আসিয়া বরের পদধৌত করিয়া দেয়। সেই সময় বরের সঙ্গিনীগণ "ভরি ধুয়াবলৈ কোন্ জনী আহিছে, ভরিত নাইকিয়া মলি" অর্থাৎ—পা ধুইয়া দিতে কে আসিয়াছে, পায় ময়লা নাই, ইত্যাদি ধরণের গীত গায়। বরের পদধৌতের পর মহিলাগণ বরের কপালে চন্দন লেপন করেন এবং গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেন। যাহা হউক, ঐ গীতটী শেষ হইলে—কোন কোন স্থানে —ঐ স্ত্রীলোকেরা কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চাউল ছড়াইয়া দেন। অনেক সময় দেখা যায়, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তামাসা দেখিবার জন্য ঐ কার্য্যটী সজোরে করিয়া থাকেন। তৎপরে শাশুড়ী ঠাকুরাণী একখানি থালায় তণ্ডুল চূর্ণের পাঁচটী নাড়ু, পাঁচ পাতা পান, একটী মৃৎ প্রদীপ লইয়া সদর দরজায় 'কলরগুরিত' আসিয়া প্রথমে এক একটী করিয়া নাড়ু বরের নাসিকার নিকট ধরিয়া পশ্চাৎ দিকে নিক্ষেপ করেন। তৎপরে এক একটী পানপাতা প্রদীপের আগুনে সেঁক দিয়া বরকে উহার দ্বারা ব্যজন করিয়া অস্ফুট আশীর্ব্বাদ করেন। আশীর্ব্বাদান্তে তিনি পুত্রবাৎসল্যভাবে বরের শির চুম্বন করিয়া তাহাকে আসরে আহ্বান করেন। অসমীয়ারা ইহাকে 'দরা-আদরা' বলেন। 'দরা' শব্দের অর্থ বর এবং 'আদরা' শব্দের অর্থ অভ্যর্থনা। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বরকে অভ্যর্থনা করিলে পর তাহার সঙ্গিনীগণ নিম্নোদ্ধৃত ধরণের গীত গাহিয়া থাকেন :—

দরা-আদরা

"সোণৰ বাটিতে লাড়ু পৰমাণে
ৰুপৰে বাটিতে দৈ।
জোৱাঁই আদৰিব শাহুয়েক আহিছে
হাততে বিচনী লৈ॥

শাহু চুটি মুতি জোৰাইক না পাই ঢুকি
আছে বৰে পিড়াত উঠি।
আলগ নিলগ কৰি চুমা খাই পঠালে
ঢেকুৰা কুকুৰত উঠি ॥”

মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে বর, কন্যার বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে পুরস্ত্রীগণ তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে আসেন। নিম্ন-আসামে পুরস্ত্রীগণ সেখানে জামাতা বরণ করিতে আসেন না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আসামে-ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ ও ‘খাতি’ কায়স্থ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দুকন্যাগণের বিবাহ-বয়সের নির্দ্দিষ্টকাল নাই। তাহারা ইচ্ছামত বয়সে পরিণীতা হইতে পারে। বিগত ১৩৩২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে শিবসাগর জেলাস্থ মাজুলি অঞ্চলের বহু গ্রামে—বিশেষতঃ কমলাবাড়ী মৌজায়—আমরা ২৪।২৫ বৎসরের অনেকগুলি অনূঢ়া কলিতা ও কেওট কন্যা দেখিয়াছি। যাহা হউক, নিম্ন-আসামের উত্তর গৌহাটী হইতে নগাঁও অঞ্চল পর্য্যন্ত স্থান বিশেষে কলিতা, কেওট ও কোঁচদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, যদি কোন কন্যার ২২।২৩ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় এবং তাহার কনিষ্ঠা সহোদরার বয়স ২০।২১ বৎসর হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ কনিষ্ঠা ভগিনীকে এই সমাগত মণ্ডলীর সমক্ষে বরকে চুম্বন করিতে হয়। পাত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী চুম্বন না করিলে পাত্রপক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না। দেশীয় প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে বরকে চুম্বন করাইয়া লন। যদি কোন বয়স্থা কন্যা লজ্জাবশতঃ তাহা করিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে পাত্রীপক্ষের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা মিঠা-কড়া কথায় তাহা করাইতে বাধ্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অম্বিকানাথ বরার নিকট আমরা শুনিয়াছি, “অধিকাংশ স্থলে বরকে চুম্বনের জন্য কাহাকেও

স্থান বিশেষে চুম্বন প্রথা

জোর করিতে হয় না। যদি কন্যার কনিষ্ঠা ভগ্নী না থাকে তাহা হইলে কোন বয়স্থা রমণী বরকে চুম্বন করিয়া গৃহে লইয়া যান।" পাঠক! আসাম অঞ্চলের স্থানবিশেষে কলিতা, কেওট, কোঁচ আদি জাতির মধ্যে এই প্রকার চুম্বন প্রথার প্রচলনের উল্লেখ কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। বিগত ১৯১৩ সালে গৌহাটীর উজান বাজারস্থ লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল স্বর্গীয় রামদাস ব্রহ্মের বাটীতে অবস্থানকালে লেখক তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নিকটবর্ত্তী স্থানে গিয়া ইহা চাক্ষুস দেখিয়া ছিলেন। উপর-আসামের ও মধ্য-আসামের কলিতা, কেওট আদি জাতির যে সকল লোক দুই তিন পুরুষ ধরিয়া গৌহাটীতে বসবাস করিতেছেন তাঁহারা 'উজনীয়া' অঞ্চলের প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া 'নামনি' আসামের প্রথানুযায়ী চলেন না।

নিম্ন-আসামে ডামলি ভার ও বিবাহ-আসরে বর

২৬ পৃষ্ঠায় আমরা 'ডামলি ভার' এর কথা বলিয়াছি। নিম্ন-আসামে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, 'বর যখন কন্যার বাড়ীতে যাত্রা করেন, তখন কয়েকজন বাহক ভারে করিয়া পুরোহিত মহাশয়ের ব্যবস্থামত হোম ও পূজার দ্রব্যাদি ব্যতীত বরের মালা ও জলযোগের দ্রব্য, কলা, দধি, নাড়ু, পান, তাম্বুল, তৈল, মৎস্য প্রভৃতি দ্রব্যসহ তাহার সহগমন করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কয়েকজন ঢুলিয়া পাঠাইয়া দেন। সন্ধ্যার পরে অথবা রাত্রিকালে বর, কন্যার বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর কন্যার আত্মীয় একটী ডালায় প্রদীপ, ধান্য, হরিতকী প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যসহ তাঁহার সম্মুখে আসেন এবং তৎপরে কন্যার পিতা, তাঁহাকে একটী চামর দ্বারা ব্যজনপূর্ব্বক বরণ করিয়া লন। অতঃপর কন্যার আর একজন আত্মীয় বরকে দুই বাহুর উপর তুলিয়া লইয়া বিবাহ-আসরে আসেন।

মধ্য-আসাম ও উপর-আসাম অঞ্চলে বর বিবাহ-আসরে আসিয়া উপবেশন করিবার পর কন্যাকর্ত্তা ও বর উভয়ে পঞ্চ দেবতার পূজা ও বিষ্ণুর

'নামতী আই'দিগের ঝগড়া-ঝাঁটী

উদ্দেশ্যে হোম করেন। তৎপরে লগ্নকাল উপস্থিত হইলে সখি-পরিবেষ্টিতা কন্যাকে মণ্ডপে আনিয়া বরের বাম পার্শ্বে উপবেশন করান হয়। বিবাহকালে বরের সহিত আগত স্ত্রীলোকদল এবং কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকেরা পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া রঙ্গরসপূর্ণ ও বিদ্রূপাত্মক গীত গাহিতে আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। অনেক সময় তাহাদের ঠাট্টা-বোটকেরা এরূপ কলহে পরিণত হয় যে, তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তখন সঙ্গীতের ভিতর দিয়া উভয় দলে বেশ গালাগালি চলিয়া থাকে। বরপক্ষের স্ত্রীলোকেরা কন্যার আত্মীয়-স্বজনকে এবং কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকেরা বরের আত্মীয়-স্বজনকে—এমন কি পুরোহিত মহাশয়কেও—সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ব্যতীত গালি দিতে ছাড়ে না। নিম্নে কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিতা 'নামতী আই'-দিগের তৎকালীন বিরোধ-মূলক গীতের নমুনা (৮) দেওয়া হইল :—

১। জোরানাম

(ধ্রুং) জয়মলা ঐ ॥

জোরানাম একুরি জোরানাম দুকুরি
জোরানামএ চাবিকুরি।
জোরানামর লগত দীঘল দি পরিবি
জোরানাম নেগাবি বুলি ॥

বুতি নাঙ্গলরে কুটী
বাপেরর মূরতে আমি হাগিলো
এতাইবোর বেঙ্গেনাগুটী।

(৮) 'উজনীয়া' অঞ্চলের শ্রীশ্রী৺ মধুমিশ্র সত্রাধিকারী স্বনামধন্য শ্রীযুত দ্বারিকানাথ দেব গোস্বামী মহোদয় 'জোরানাম' তিনটী অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদান করিয়া অনুসন্ধিৎসুক্ বঙ্গীয় পাঠক-পাঠীকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন।—লেখক।

শ্রীশ্রীদ্বারিকানাথ দেব গোস্বামী—৺মধুমিশ্র সত্র

ভলুকা বাঁহরে আলু
আমারে আগতে নামতি নোলাবি
পাদ মারি ফালিমে তালু॥
বারীরে শিমলু ওঠের হতীয়া
তাতে পত্নমরে চকা।
নেমাতি থাকোতে মারে যেন দেখিলি
ভাল বুঢ়ি মারক জোকা॥

২। জোরানাম

(ধ্রুং) ঐ রবি॥

পথারর পুলিধান নামতীক ধরি আন
মাজর চুলিকোছাত ধরি।
মাজর চুলিকোছা মোরে ভরি-মছা
তাইতঁর নেঘেরি খোপা;
নেঘেরি খোপাটো ভরিদি চিঙ্গিলো
ভাল বুঢ়ি মারক জোকা।

পুরোহিতকে আক্রমণ করিয়া 'নামতী আই'রা (গাহিকারা) এইরূপ ধরণের গীত গাহিয়া থাকে :—

৩। জোরানাম

(ধ্রুং) জোনবেলি॥

লাওপাত কজলা বামুণটো অজলা
পিঠা খাওঁ পিঠা খাওঁ করেহে।
সাতোটা ঢেকীরে পিঠা খুন্দি দিলে
বামুণ চেরেলীয়াই মরে। *

---

* কজলা—সবুজ ; আজলী—অজলা ; চেরেলীয়াই—হাগিয়া হাগিয়া।

(ধ্রুং) রাম রাম

বামুণর মুখত জুই ভরাই দে তপত গুড়
চেলাই যক দুপারি দাত হে।
বরালি মাছরে তিনতা টোটোলা
টেঙ্গাদি খাবলৈ ভাল॥

আমার গুরু বাপুর পেটোতো গেরেলা
জয়ঢোল বাবলৈ ভাল।
বামুণে বিধি গাই জোলোঙ্গা পিতিকে
ভোজনি দেখিলে সক॥

কুমারর আগতে বার্তরি কোৱাগৈ
লাগিব দুনীয়া চরু।
আনোতে আনিলে বাটতে ভাগিলে
আজলী কুমারর চরু॥

পূজা করো বুলি রাইকহ বামুণে
মধুপরককে খালে হে।
শূদিরে সুধিলে কলে হুকি মারি
সংঘার মুদ্রাই খালে হে॥

খাওতেও খালে এভাগি রাখিলে
বামুণীক দিবগে লাগে।
নেপালে বামুণী করিব বিঘিনি
বামুণে ভয়তে পাদে॥ *

---

* চেলাই যক—দাঁত বাহির করে চলে যাক্; টোটোলা—গণ্ডস্থল; গেরেলা—বড়; বাবলৈ—চাপড়াইতে; দুনীয়া—এক দোনপূর্ণ; রাইকহ—রাক্ষস; মধুপরকা—মধুপর্ক।

যাহা হউক, শাস্ত্রবিহিত সম্প্রদান ও হোমাগ্নি-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার পর বর ও কন্যাকে অন্দর মধ্যে এক সুসজ্জিত আসরে বসাইয়া মহিলারা আবার 'বিয়ানাম' গাহিতে থাকেন। সেই সময় বর ও অবগুণ্ঠনাবৃতা কন্যার সম্মুখে এক পাত্র আতপ চাউল রাখা হয়। তখন বর এই চাউলের মধ্যে নিজের একটী অঙ্গুরী পুতিয়া রাখেন। একটী মহিলা এই অঙ্গুরীটী কন্যার দ্বারা চাউলের মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনান। স্বামীর প্রথম ও প্রধান প্রীতি-উপহার জ্ঞানে কন্যা আজীবন তাহাকে সযত্নে রাখিয়া দেয়। কন্যা এই অঙ্গুরীটী গ্রহণ করিলে মহিলারা বর ও কন্যাকে বহির্বাটীতে আনিয়া 'বেই'এর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করান। তৎকালে তাঁহারা সরস ব্যঙ্গ করিয়া পল্লবসংযুক্ত আম্রডালির দ্বারা বর-কন্যাকে মৃদু প্রহার করিতে থাকেন। উপর-আসামে ও মধ্য আসামে ইহাই হইল বিবাহের শেষ স্ত্রী-আচার। অসমীয়ারা ইহাকে "বেই-ফুরোয়া" বলেন।

বেই ফুরোয়া

বঙ্গদেশীয় হিন্দুদিগের একটী চিরন্তন সংস্কার আছে যে, ছাঁদনাতলায় বর-কন্যার শুভ-দৃষ্টিকালে কোন নর-নারী পার্শ্বস্থ খুঁটী অথবা চালের বাতা ধরিয়া থাকিলে দাম্পত্য-জীবন অতীব অশান্তিকর—এমন কি পরস্পর বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত—হইয়া থাকে পাছে কেহ তৎকালে অন্যমনস্কভাবে অথবা ভবিষ্যৎ অনিষ্ট সংঘটনের ইচ্ছায় চালের বাতা ধরিয়া থাকে, এজন্য তাহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য নাপিত উচ্চ-গলায় কটূক্তিপূর্ণ নানা রকমের ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। নিম্নে তৎকালীন একটী ছোট খাট ছড়া উদ্ধৃত করা হইল :—

বঙ্গদেশে বিবাহকালীন নিষিদ্ধ কার্য্য

শুন সবে এবে আমি
করি নিবেদন।
ছাঁদনাতলায় এসেছে বর
বৃষভ বাহন॥

মন্দলোক থাক যদি
যাও সরে যাও।
ছাউনি নাড়ার সময় হ'ল
এয়োরা দাঁড়াও॥
খুঁটি-খাঁটা ছেড়ে দাও
ভাতার পুতের মাথা খাও।
যে ধর্‌বে চালের বাতা
সে খাবে ভাতারের মাথা॥
যে জন কর্‌বেক কু
তার বাপের মুখে গু।

নিম্ন-আসামে বর বিবাহ-আসরে আসিয়া বসিবার কিছুক্ষণ পরে তাহাকে প্রাঙ্গনস্থিত এক বেদির এক পার্শ্বে উপবেশন করান হয়।

নিম্ন-আসামে বিবাহ-পদ্ধতি

সেখানে বরপক্ষের পুরোহিত দ্বারা প্রথমে বিষ্ণুপূজা অথবা অন্য কোন দেব-দেবীর পূজার পর হোমকার্য্য আরম্ভ হয়। এই সময় কন্যাপক্ষের পুরোহিত বেদির নিকট উপস্থিত থাকেন। হোম-কার্য্যকালে কন্যাকে সেখানে আনিবার জন্য অন্তঃপুরে লোক পাঠান হয়। এই সময় মহিলারা একটু কৌতুক করেন। "কন্যা দিব না" বলিয়া তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া দেন। তখন বরপক্ষের পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকেরা পান ও সুপারি লইয়া যুক্তকরে বলিতে থাকেন, "এই পান ও সুপারি লইয়া আমাদের নিকট কন্যা প্রদান করুন।" তৎকালে তাঁহারা একটী গীত গাহিয়া থাকেন :—

দ্বারকারি মিঠা তামোল কুণ্ডলর পান।
আয়তীয়ে দিয়ক এরি রুক্মিণীকে আন॥—ইত্যাদি

অর্থাৎ—দ্বারকা [গুর্জ্জর দেশ]র সুমিষ্ট সুপারি এবং কুণ্ডিল নগরী(৯)র পান দেওয়া হইল। রুক্মিণীকে [এখানে কন্যাকে] এখানে আনয়ন করিবার জন্য সধবারা ছাড়িয়া দিউন। পান ও 'তাম্বুল' [সুপারি] দিবামাত্র তাঁহারা ঐ কন্যাকে ছাড়িয়া দেন। কন্যাকে সভাস্থলে বরের নিকট আনয়ন করিবার কালে পাত্রপক্ষের স্ত্রীলোকেরা নিম্নোদ্ধৃত ধরণের একটী গীত গাহিয়া থাকেন ঃ—

"ওলাই আহাঁ আইটীয়ে মাটিত মঙ্গল চাই।
গণকে গণিতা করে ক্ষণ চারি যায়।
ওলাই আহাঁ আইটীয়ে আঙ্গুলিতে লেখি ;
প্রজাসকল রৈ আছে তোমাক নেদেখি॥"

অর্থাৎ—মাটিতে যে মাঙ্গলিক রেখা অঙ্কিত করা হইয়াছে, হে 'আইটী' [সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা]! তাহা দেখিয়া বাহির হইয়া আসুন। গণকে গণনা করিয়াছে, এক্ষণে শুভক্ষণ চলিয়া যায়। আপনি আঙুলে গণিয়া বাহির হইয়া আসুন। প্রজারা [এখানে জনমণ্ডলী] আপনাকে দেখিতে না পাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

এই গীতের পর সেই কন্যাকে লইয়া সভার কাছে বেদির নিকট বরের বামপার্শ্বে উপবেশনান্তে শাস্ত্রানুযায়ী হোমকার্য্য করা হয়। হোমের পর কন্যা সম্প্রদান হয়। সম্প্রদানকালে কন্যার পিতা হোমাগ্নিকে সাক্ষ্য করিয়া বর-কন্যা উভয়ের মস্তকের কেশগুচ্ছ একসঙ্গে ধরিয়া রাখেন। তখন পুরোহিত মহাশয় মন্ত্রপাঠ এবং পঞ্চদেবতাকে সাক্ষ্য করিয়া কন্যার গোত্র ছেদনপূর্ব্বক বরের গোত্রে আনয়ন করেন। এই সময় বর,

(৯) কুণ্ডিল নগরী—বিগত ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের শেষভাগে বরপেটা নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র রায়-চৌধুরী [হেড মাষ্টারএর] নিকট শদীয়ায় অবস্থানকালে প্রায় আড়াই মাইল দূরে "কুণ্ডিলপাণি"র তীরে একটা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আমরা দেখিয়াছিলাম। এখানে উল্লেখযোগ—রুক্মিণীর পিতার [যদুবংশীয় রাজা ভীষ্মকের] রাজধানী বিদর্ভ রাজ্যে [Modern Berar] ছিল—প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে নহে।

পুরোহিতের আদেশে কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া থাকেন। বর-কন্যার কেশ ধারণকালে একখণ্ড পাথর, সোনার আংটী, ধান্যের শীষ, তিল, কোষা প্রভৃতি স্পর্শ করা হয়। যাহা হউক, কন্যা-সম্প্রদান হইয়া গেলে আসামে সাধারণতঃ কলিতা, কেওট, কুমার, বৈশ্য, নাপিত, নট আদি জাতির বিবাহ-কার্য্য শেষ হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সচ্ছল অথচ ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থ খেঁসা, সম্প্রদানের পর তাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী হোমপুরার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হোমার্থ কাষ্ঠ পূরা মাত্রায় খরচ হইলে অসমীয়ারা তাহাকে হোমপুরা বলেন। অসমীয়া ভাষায় 'পুরা' শব্দের অর্থ পোড়ান। নদীয়ালরাও ইচ্ছা করিলে 'হোমপুরা'র অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু অনেক নদীয়াল তাহা না করিয়া একটি স্বজাতীয় যুবতীকে গৃহে আনিয়া স্ত্রীর মত করিয়া রাখে।

সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম ও সপ্তপদী গমন হইয়া গেলেই উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি পূরাভাবে সমাপ্ত হয় না।

সপ্তপদী গমন

যজ্ঞাগ্নির উত্তর পার্শ্বে চাউলের গুঁড়া দ্বারা সাতটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হয় এবং এই বৃত্তগুলির উপর দিয়া বধূকে চলিয়া যাইতে হয়। বধূ যখন এক একটী বৃত্তের উপর পদার্পণ করে, বর তখন বিষ্ণুর নিকট ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা প্রার্থনা এবং এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বিবাহের এই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে "সপ্তপদী" বলা হয়। সপ্তপদী গমনের যজুর্বেদীয় মন্ত্রগুলি, যথা :—১। ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ; ২। ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ; ৩। ওঁ ত্রীণি রায়স্পোশায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ; ৪। ওঁ চত্বারি ময়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ; ৫। ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ; ৬। ওঁ ষড় ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ; ৭। ওঁ সখে সপ্তপদা ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। সপ্ত-পদী-গমনের পর, বর আর একটী যজ্ঞ করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং পুরোহিতকে দক্ষিণাপ্রদান করেন। পুরোহিত, কন্যার কপাল, কণ্ঠ, বাহু

এবং বক্ষে যজ্ঞের ভস্ম অনুলেপন করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-কৃত সংস্কার তত্ত্বের বিবাহ-প্রকরণে সপ্তপদী গমন-বিধান বিবৃত আছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কন্যারা কুশণ্ডিকাকালে সপ্তপদী গমন করেন। তাঁহারা উত্তরমুখী হইয়া প্রথমে প্রথম বৃত্তের উপর দক্ষিণ পদ, তৎপরে দ্বিতীয় বৃত্তের উপর বামপদ, এইরূপে ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ করেন। কন্যার পদক্ষেপকালে বর তাহার পশ্চাৎ-গমন করেন কিন্তু বৃত্তের উপর পা দিয়া যান না। পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ কন্যারা সপ্তপদী গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কায়স্থ কন্যার সম্প্রদানান্তে এই প্রথার অনুষ্ঠান হয় না।

কামরূপের গৌহাটী মহকুমার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুগণ বিবাহের পরদিন 'বেহুবাড়ী' নামক একটী দৈশিক প্রথার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই

বেহুবাড়ী

বেহুবাড়ী হইতেছে—"প্রায় ৮ হাত দীর্ঘ চারিটী বাঁশের মোটা কঞ্চি কন্যার বাটীস্থ প্রাঙ্গনে অন্যূন পরস্পর তিন হাত ব্যবধানযুক্ত একটী চতুর্ভুজ-ক্ষেত্রের চারি কোণে পুতিয়া উহাদের অগ্রভাগ দড়ির দ্বারা এক সঙ্গে বাঁধিবার পর ঐ কঞ্চি চারিটীর মাথার উপরভাগে আর একটী বংশশলাকা বাঁধিয়া তাহার অগ্রভাগে কলার মোচা বিদ্ধ করিয়া রাখা হয়। গাঁটছালা সহ বর, কন্যার পশ্চাৎ-ভাগে থাকিয়া পাঁচবার বেহুবাড়ী প্রদক্ষিণ করিবার পর উহার মধ্য দিয়া উভয়েই এদিক ওদিক গমনাগমন করে। তৎপরে শ্বশুর অথবা কন্যাদাতা চামর দ্বারা উভয়কে বরণ করিয়া লন।"

[বেহুবাড়ীর চিত্র]

কামরূপের নলবাড়ী অঞ্চলে দোলাবাহকেরা বেহুবাড়ী ধরিয়া থাকে।

বর-কন্যা গাঁটছালা সহ প্রথম চিত্রের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিবার পর দ্বিতীয় চিত্রের 'ক' চিহ্নিত স্থান দিয়া অতিক্রম করে। ইহার পর 'আগ চাউল দিয়া' প্রথার অনুষ্ঠান হয়। "উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে বেহুবাড়ী প্রথা প্রচলিত নাই।"

বঙ্গদেশে বিবাহকালে যে ধরণে স্ত্রী-আচার হয়, এদেশে তৎকালে সেরূপ প্রথার প্রচলন নাই। আসামে হোম-পূজাদি বৈদিক ক্রিয়ার পর

আগ চাউল দিয়া

কন্যা-সম্প্রদান হইয়া গেলে, কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি বর ও কন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া যান। সেখানে কন্যার মাতা, পিসি প্রভৃতি প্রধানা মহিলা 'আগ চাউল দিয়া' কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। নিম্ন-আসামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও 'খাতি' কায়স্থ-সমাজে এই প্রথা প্রচলিত নাই। সে অঞ্চলে যে সকল জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে ইহার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে এই প্রথাটী বলা যাউক। মহিলারা বর ও কন্যাকে একটী শীতলপাটীর উপর পাশাপাশি-ভাবে উপবেশন করাইয়া 'লগন গাঁঠি' (গাঁটছালা) বাঁধিয়া দেন। তৎপরে বর-কন্যার সম্মুখে ঘট, পুষ্প, একটী বাঁশের ডালায় প্রদীপ, হরিতকী ও অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং চাউলপূর্ণ একটী দোনা রাখা হয়। অতঃপর প্রথমে কন্যার মাতা আসিয়া বর-কন্যা উভয়ের মস্তকে যৎকিঞ্চিৎ আতপ চাউল তিনবার অথবা পাঁচবার ছড়াইয়া দেয়। তৎপরে অন্যান্য সম্পর্কীয় মহিলারা তদ্রূপভাবে চাউল ছড়াইয়া দিবার পর তাহাদের উভয়ের মস্তকের উপর দুর্ব্বাঘাস স্থাপনপূর্ব্বক আম্রপল্লব দ্বারা ঘটস্থ জল লইয়া সিঞ্চন করত আশীর্ব্বাদ করেন। ইহার পর পূর্ব্বোক্ত দোনাস্থ চাউল মধ্যে বর এক জোড়া আংটী লুকাইয়া রাখে। কন্যাকে ঐ আংটী জোড়া খুঁজিয়া বাহির করিতে বলা হয়। কন্যা সহজে আংটীটী বাহির করিতে পারিলে তত্রস্থ মহিলারা বরকে লক্ষ্য করিয়া অনেক ঠাট্টা করেন এবং কন্যাকে ক্লেশ না দিয়া বর যেন স্নেহ করিয়া চাউলের উপর আংটি রাখিয়াছে, এইরূপ

অর্থজ্ঞাপক হস্তোদ্দীপক গীত গাহিয়া থাকেন। অতঃপর দুইটী পায়সপূর্ণ বাটী তাঁহাদের সম্মুখে রাখা হয়। বর একটী বাটী কন্যার দিকে ঠেলিয়া দেন। কন্যাও তাহা বরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। উভয়েই তিন বার অথবা পাঁচ বার এইরূপভাবে উভয়েরই দিকে পায়স-পাত্র ঠেলা-ঠেলি করিয়া থাকেন। এই সময় মহিলারা, বর-কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক গীত ও কৌতুক-তামাসা করেন। বর, কন্যাকে লইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলে বরের মাতা ও অন্যান্য সম্পর্কীয়া মহিলাগণও উক্তরূপে 'আগ চাউল দিয়া' বা 'আগ দিয়ার' অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইলেই বৈধ বিবাহ হইল। 'আগ চাউল দিয়া' শাস্ত্রসিদ্ধ নহে; ইহা একটী স্ত্রীআচার মাত্র। উপর-আসামে ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যেও আগ-চাউল দিয়া প্রথা প্রচলিত আছে। তবে কামরূপ অঞ্চলে ইহার অনুষ্ঠানের আধিক্য দৃষ্ট হয়। 'আগ চাউল দিয়া'র কালে শঙ্খ বাজান হয় না। তৎকালে বাটীর মহিলারা উলুধ্বনি করেন।

পশ্চিম বঙ্গে বিবাহ-কার্য্য শেষ হইলে পর, বর বহির্ব্বাটীস্থ মণ্ডপে বরযাত্র ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত পংক্তিভুক্ত হইয়া ফলাহার [অর্থাৎ লুচি, তরকারি, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি] ভোজন করেন। আসাম অঞ্চলে দেখা যায়—বর বিবাহের রাত্রিতে কন্যার গৃহের কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে না। বর পক্ষীয় কোন ব্যক্তি, বরগৃহ হইতে সেখানে আনিত চাউল, দাইল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহাকে অন্তঃপুরে কন্যার সান্নিধ্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং চিপিটক, পিঠা, 'পাহ' [পরমান্ন] প্রভৃতি নানাবিধ সুসজ্জিত খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেওয়া হয়। বর ইহার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া মুখশুদ্ধি করত বহির্ব্বাটীতে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসেন। দেশীয় প্রথা অনুসারে সে দিন বর, কন্যাগৃহের কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করেন না; বিবাহের রাত্রিতে পূর্ব্ব বঙ্গের ভদ্রসমাজেও ঠিক এইরূপ আচার প্রচলিত

বরের খাদ্যদ্রব্য ও বরযাত্র ভোজন

আছে। এমন কি, বরযাত্র খাওয়ানরও ঝঞ্ঝাট নাই—সে রাত্রি বিয়ে বাড়ীতে সব 'চুপ চাপ'। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বিবাহের রাত্রিতে কন্যার পিত্রালয়ে যে সকল খাদ্যদ্রব্য করা হয়, সেগুলি জাদুমন্ত্রপূত করিয়া রাখা হয়। এখনও [১৩৩৭ বঙ্গাব্দে] নগরের নগণ্য সংখ্যক ধনাঢ্য অসমীয়া ভদ্রলোক ব্যতীত পল্লীগ্রামের অসমীয়ারা বিবাহের রাত্রে বরযাত্রিগণকে চিঁড়া, দই ও চিনি খাওয়াইয়া থাকেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী—এই তিনটী নগরী ব্যতীত সমগ্র আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি লুচি, ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়ার আবির্ভাব হয় নাই। বৈদিক যুগে 'ছানা' [আমিক্ষা] যে দ্বিজগণের খাদ্যস্বরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা গৃহ্যসূত্রাবলী হইতে জানিতে পারা যাইতেছে।

বাসর ঘর—কুমার সম্ভব কাব্যের ৭ম সর্গের ৯৪-৯৫ শ্লোকে হর পার্ব্বতীর বিবাহ-প্রসঙ্গে কৌতুকাগারের উল্লেখ আছে। উহাই বাসর-ঘর নামে পরিচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ঠানদিদি, বউদিদি ও শালী সম্পর্কীয় মহিলাদিগের বাসরঘরে গীত গাহিবার ও কৌতুক করিবার প্রথা আছে। তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য কন্যাকে বরের ক্রোড়ে বসাইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বরকে পরিহাস করিবার কালে শালীরা মিঠা-কড়া রকমের কর্ণমর্দ্দন করিত। বাসরঘরে সারারাত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। অসমীয়া ভাষায় বাঙ্গালার বাসরঘর শব্দ না থাকিলেও ইহাই ভিতরলৈ নিয়া নামক প্রথারই নামান্তর মাত্র। এখানে কড়ি খেলা ব্যতীত গান হয় না। অসমীয়া হিন্দুকন্যার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার—এমন কি তাহার সম্মুখে আসিবার প্রথা—একেবারে নাই। 'আগ চাউল দিয়া'র পর ঠানদিদি ও বউদিদি সম্পর্কীয়া অসমীয়া মহিলারা বর-কন্যাকে লইয়া কিয়ৎক্ষণ রঙ্গ-তামাসা করেন মাত্র। কোচ-বিহারে কোন জাতির মধ্যে বাসরঘর নাই।

বরের গৃহযাত্রা—বিবাহের পর দিন সূর্য্যোদয়ের কিছু ক্ষণ পরে বর, কন্যাকে লইয়া প্রত্যাগমন করেন। বাঙ্গালীর মেয়ের মত অসমীয়া কন্যার আলতা পরিয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিবার প্রথা নাই। বঙ্গদেশে ইহা পুরাতন প্রথা নহে—অলক্তক বা লাক্ষা রসের ব্যবহার পুরাতন। যাহা হউক, নিম্ন-আসামের স্থানবিশেষে বর সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে গৃহে গমন করেন। কন্যা তাহার কিছুক্ষণ পরে যাত্রা করিয়া থাকে। বরকে আপন গৃহের সদর দরজার সম্মুখস্থ 'পদুলিত' (রাস্তায়) কন্যার আগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। 'উজনী' অঞ্চলে বর যখন কন্যাসহ গৃহযাত্রা করেন, কন্যার মাতা তখন বামহস্তে প্রদীপ এবং দক্ষিণ হস্তে ধূপ সহ গৃহের দরজা ধরিয়া দাঁড়ান। বর-কন্যা তাঁহার এক দিকে মাথা নত করিয়া অন্যদিকে হস্তের নিম্ন দিয়া চলিয়া যান। ইহাকে দুয়ার ধরি উলিয়াই দিয়া বলে। তৎকালে বাড়ীর মেয়েরা এবং 'নামতি আই'রা গান গাহেন এবং উলুধ্বনি করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—অসমীয়া হিন্দুবরের হস্তে কাটারী ও 'তাম্বূল' [ইহা রৌপ্যনির্ম্মিত এবং তাম্বূলাকৃতি] থাকে—পশ্চিম বঙ্গের বরের ন্যায় জাঁতি থাকে না। যাহা হউক, অসমীয়া ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ঘরের কলিতা ও সঙ্গতিপন্ন কেওট জাতির কন্যারা বিবাহান্তে

কন্যার দোলায় গমন

প্রথমবার—[কেহ কেহ দ্বিতীয় বার]—দোলায় উঠিয়া বরের বাটীতে গমনাগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু গোয়ালপাড়া ও কামরূপ অঞ্চলের এবং মঙ্গলদৈ মহকুমার মাত্র কয়েক ঘর কায়স্থের, মধ্য-আসাম ও উপর-আসামের 'কাথ মহাজন'দিগের অর্থাৎ—কায়স্থ জাতীয় মহাজনদিগের এবং উজনীর সবিশেষ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্রাধিকারী ও সম্পন্ন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের কন্যারা বিবাহের পর বরাবর কাষ্ঠনির্ম্মিত দোলায় উঠিয়া পিত্রালয়ে যাতায়াত করেন। দোলাগুলি দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ তিন হাত। কোঁচ জাতির লোকেরা বরাবর দোলা বহন

করিত। এক্ষণে তাহাদের অনেকেই কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছে। বর্ত্তমানে উজনী অঞ্চলের বহু ভদ্রপল্লীতে কোন কোন 'বঙ্গালী' [বিদেশী] কুলি 'বেহারা'র কাজ করিতেছে।

বর, কন্যাসহ নিজ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর তাঁহার মাতা, খুড়িমা, ঠাকুরমা প্রভৃতি গুরুস্থানীয় মহিলা বর-কন্যাকে অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণে 'ঢরা' [পাটী বিশেষ]র উপর বসাইয়া 'আগদিয়া' বা 'আগ চাউল দিয়া' কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন;

আগ চাউল দিয়া ও আত্মীয় ভোজন

তৎকালে গীত গাওয়া হয়—ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দিন বরকর্ত্তা তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে ও কন্যার নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের ভোজনের পর কন্যা, বরের প্রসাদ ভোজন করে। ইহার পর গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ বর-কন্যা উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

বাসি বিবাহ—ইহা কেবল একটী স্ত্রীআচার মাত্র। বঙ্গালাদেশে কোন কোন হিন্দুপরিবারে "বাসি বিবাহ" কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহ রাত্রিতেই করিতে হয়, পর দিন কেবল স্নান মাত্র বাকি থাকে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বিবাহ রাত্রির পর দিনে কুশণ্ডিকা বা বৈবাহিক হোম করেন এবং তাহাকেই বাসি বিবাহ বলে। এই বিবাহের উপলক্ষে স্ত্রীআচার কালে স্থান বিশেষে সাধারণতঃ এই দেশে দেখা যায়—বিবাহের পরদিন প্রাতে ৮।৯ ঘটিকার সময় বর-কন্যাকে প্রাঙ্গণ মধ্যে মাদুরে বসাইয়া পাঁচজন সধবা উলু-লু ধ্বনীর সহিত বর-কন্যা উভয়ের মস্তকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া দেন। তাঁহারা সকলে বামহস্তগুলি উপর্য্যুপরি স্থাপন করিলে সর্ব্বশেষটীর উপরে একটী নুড়ি রাখিয়া তাহাতে তেল ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাঁহাদের মধ্যে জনৈক সধবা দক্ষিণ হস্তদ্বারা বরের এবং বাম হস্তদ্বারা কন্যার মস্তকে, দুই স্কন্ধে ও বক্ষে ঐ নুড়ি ও তৈল স্পর্শ করান। তৎপরে বর-কন্যা 'গুলে-

হাঁড়ী' [মঙ্গল হাঁড়ি] লইয়া খেলা করে। ইহার মধ্যে হরিদ্রা মাখান চারিটী কড়ি, একটী সুপারি, একটী কলা, একটী পানের বিড়া [মোড়া পান], চারিটী আস্ত হরিদ্রা ও কিঞ্চিৎ চাউল থাকে। বর গুলেহাঁড়িটীকে তিনবার ঢালে; কন্যা পতিত দ্রব্যগুলিকে তন্মধ্যে তুলিয়া ফেলে। বর প্রত্যেক বার কন্যার নাম করিয়া একটী ঢাক্‌নি দ্বারা একটী একটী গুলে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করেন। ইহার পর সধবারা বর-কন্যাকে কলাগাছ তলায় লইয়া যান এবং পুষ্করিণী হইতে আনীত জলে স্নান করাইয়া পিটুলি নির্ম্মিত 'আগ' [শ্রী] ও কুলা সমেত গুলেহাঁড়ি, প্রজ্বলিত প্রদীপ দুইটা পান দিয়া উভয়কে বরণ করেন। তৎপরে বর, কন্যার পৃষ্ঠে মধু দিয়া একটী পুতুল আঁকেন। কন্যাও বরের পৃষ্ঠে তাহা আঁকিবার পর উভয়ের চুল একত্র করাইয়া উভয়ের মস্তকে [৩৩৭ পৃষ্ঠায় কথিত] 'সহা জল' ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর বর-কন্যা গৃহ মধ্যে গিয়া পাঁচটী কড়ি লইয়া খেলে। ইহার পর কন্যার আত্মীয় ও আত্মীয়ারা উভয়কে আশীর্ব্বাদ ও অবস্থানুযায়ী যৌতুক প্রদান করেন।

কাছাড় অঞ্চলে ব্রাহ্মণ হইতে হীনতম হিন্দু পর্য্যন্ত বিবাহের পর দিন বাসি-বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের অসমীয়া হিন্দুগণ বাসি বিবাহকে বাহি বিয়া বলিয়া থাকেন। তেজপুর মহকুমায় ও শিবসাগর জেলায় বাঙ্গালী পর্ব্বতীয়া গোসাঞীদিগের যে সকল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শ্রেণীর শিষ্য আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাসি বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। যোড়হাট অঞ্চলের 'দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ [গণক]দিগের মধ্যে অনেকে বাসি বিবাহের অনুষ্ঠান করেন না। গোহাটী অঞ্চলের পশ্চিমা গ্রামের 'শর্ম্মা' উপাধিধারী অধিবাসীদিগের মধ্যে বাসি বিবাহ প্রচলিত নাই। গোহাটী মহকুমায় নগন্য সংখ্যক প্রকৃত কায়স্থ বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বাসি বিবাহের অনুরূপ 'টীকধরা' নামক প্রথার প্রচলন থাকিলেও বাঙ্গালীর প্রথা বলিয়া তাঁহারা

ইহাকে 'বাহি বিয়া' বলিয়া প্রকাশ করিতে ঘৃণা [লজ্জা নহে] বোধ করেন। বিগত ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে বড়পেটা মহকুমার অন্তর্গত সরভোগ গ্রামে মৌজাদার রায় বাহাদুর শ্রীযুত রজনীকান্ত চৌধুরীর বাটীতে আমরা স্বচক্ষে 'বাসি বিবাহ' দেখিয়াছি।

উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে বিবাহের পর দিন বাহি-বিয়া উপলক্ষে বর-কন্যা স্নান করিয়া গৃহে উঠিলে মহিলারা বরকে আপনাদের অন্তঃপুরস্থ মজলিসে লইয়া গিয়া তাঁহার চুল আঁচড়াইয়া দেন। এই সময় নামতি আইরা নিম্নলিখিত ধরণের [হাস্যকর] গীত গাহিয়া থাকেন ঃ—

বাহি বিয়া-নাম

ধ্রুং রাম রাম

দরারে মূররে ইজলি পিজলি
কনীয়ার মূরতে দেখি চে
একখন তুলিতে দুয়ো বহি আছে
ভায়েক ভনীয়েক যেন দেখি ॥
দালিম ঠিয় করি নীরে তেলে বাকে
গাইলে বাগরি যায়।
শেরা সরিয়হর চেওঁরা তেলেতুপি
কোমল দৈ বাঁহরে ফনি ॥
লাহেকৈ মেলাবা এদালি চিগিব
ডেকা দেউর চেনেহর চুলি।
সরুরএ পেরা কেশকে বঢ়ালা
এদাল নিচিগা করি ॥
বিবাহর কালতে শাহু মুর মেলাওঁতে
চিগিল চেনেহর চুলি। * ‡

বঙ্গদেশে কাল রাত্রির পর দিন রাত্রে ফুলশয্যা হয়। এই দিন বর হস্তের সূতা খুলিয়া দধিপূর্ণ বাটীতে ফেলিয়া দেন। এখানকার হিন্দুদিগের প্রথা অনুসারে মাটীতে ঐ সূতা ফেলিতে নাই। পরে ঐ বাটী হইতে উহাকে লইয়া কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়। সধবারা কন্যার হস্ত হইতে কাজলনতা এবং বরের হস্ত হইতে জাঁতি লন। ফুলশয্যার দিন বর-কন্যাকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিবার পর তাঁহাদিগকে একত্রে বসাইয়া, একটী বড় পাত্রে ভোজন করান হয়। এই সময় বর, কন্যার মুখে এবং কন্যা, বরের মুখে খাদ্যদ্রব্য দেন। তৎপরে বর-কন্যার মধ্যে মালা বদল করা হয়। সধবারা উভয়কে নানাবিধ সুরভি পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া চলিয়া যান। বহুদিনের আসাম প্রবাসী উচ্চ-শ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে ফুলশয্যা প্রথার প্রচলনের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। কামরূপে কোন কোন প্রকৃত কায়স্থ পরিবারে কেবলমাত্র ফুলশয্যার দিন রাত্রে বর-কন্যা উভয়কে এক বিছানায় শয়ন করান হয়। 'উজনী' অঞ্চলের স্থান বিশেষে কলিতা, কেওট আদি জাতির মধ্যে অবাধ যৌবন বিবাহ প্রচলিত আছে। এই বিবাহের উপলক্ষে কয়েকজন গায়িকা [নামতি আই] 'বিয়ানাম' হিসাবে কখনও কখনও ফুলশয্যা 'নাম' [গীত] গাহিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মত তাঁহাদের মধ্যে ফুলশয্যার কোন অনুষ্ঠান নাই। কোচবিহারেও

ফুলশয্যা

*† শব্দার্থ—হজনী—ছোট ; পিজলী—এক জাতীয় উকুন ; লেখি—এক জাতীয় উকুন (nit)। তুলীতে—তোমাকে। গালে---শরীরে। বাগরি যায়---ঢালিয়া দেয়, [এখানে] ঝরিয়া যায়। চেওঁয়া—উৎকৃষ্ট ; তুপি---টুক্ ; লাহেকৈ—আস্তে ; মেলাবা আঁচড়ান। চিগিব—ছিঁড়িয়া যাওয়া ; কদালি---একগাছি ; সরুরএ ছোটবেলা থেকে ; শেয়া সাদা।

কোন জাতির মধ্যে বাসর ঘর কিংবা ফুলশয্যা নাই। বাঙ্গালা, শ্রীহট্ট ও নিম্ন-আসামে ফুলশয্যার দিন রাত্রে বর-কন্যার ঘরে সারারাত্র প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়—নিভিতে পারিবে না।

উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে ঐ ফুলশয্যার দিন নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগের মধ্যে দেখা যায়—বিবাহের তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার পর সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বরের বাটীতে সভা পাতিয়া নন্দিপুরাণের অন্তর্গত স্থান বিশেষের সংস্কৃত শ্লোকগুলি অসমীয়া ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বর-কন্যাকে শুনান। পার্ব্বতীর নাসারন্ধ্র-জাত 'খোবা-খুবা' নামক অসুর-দম্পতির উৎপত্তি, বর-কন্যার উপর কুনজর লাগা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা একটী আখ্যায়িকা বিশেষ। ঐ অঞ্চলে যে দিন বধূ শ্বশুরগৃহে যায় সেই দিনই পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে; একারণ খোবা-খুবীর আখ্যানটী শ্রবণ করাইবার জন্য বরের বাড়ীতে বিবাহের ঐ তৃতীয় দিন কন্যাকে পুনরায় আনা হয়। কোন কোন স্থানে বিবাহের পরদিন হইতেই কন্যাকে বরের ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয়। যদি কোন কারণে ঐ তৃতীয় দিনে বরের ঘরে কন্যাকে আনার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে উভয় স্থানে সভা করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দ্বারা খোবা-খুবীর আখ্যান শুনান হয়। এই আখ্যান-পাঠের দিন বরের কুটুম্ব ও বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হন। বর-কন্যা একাসনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে খোবা-খুবী-চরিত শুনিতে থাকেন। কেবল ঐ দুই অঞ্চলের হিন্দুদিগের বিশ্বাস —বিবাহকালে কোন দুষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তির কুনজর লাগিলে এই চরিত-পাঠ শ্রবণ দ্বারা তাহা নিবারিত হইয়া যায়। বর-কন্যার খোবা-খুবী চরিত-পাঠ শ্রবণকালে বরের বন্ধুগণ নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহারা উভয়ের অজ্ঞাতসারে উভয়ের বস্ত্রপ্রান্ত একসঙ্গে বাঁধিয়া কিংবা পৃষ্ঠাচ্ছাদিত বস্ত্রের উপর কোন কিছু রহস্যকর দ্রব্য ঝুলাইয়া দেন। এই চরিত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে 'নাম'

খোবা-খুবীর কথা

কীর্ত্তন হয়। ইহার পর বর-কন্যা সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে পুরোহিত মহাশয় অথবা কোন প্রবীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় খোবা-খুবীর ইতিহাসের যে কথকথা করেন, বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থ নিম্নে তাহা বিবৃত করা হইল :—

একদিন পার্ব্বতী দেবী কৈলাস পর্ব্বতে একাকিনী বসিয়া আছেন, এমন সময় লক্ষ্মীদেবী অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার দরিদ্রতার জন্য উপহাস করত জিজ্ঞাসা করিলেন :—

লক্ষ্মী—ভিখারী কোথায় গেল ?

পার্ব্বতী—বলিরাজার যজ্ঞে।

লঃ—গঞ্জিকাসেবী কোথায় ?

পাঃ—সোমরস পান করিয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, আর এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিতেছেন।

লঃ—ডম্বরুবাদক ও তাণ্ডব নৃত্যকারী কোথায় ?

পাঃ—গোকুলে গোপিনীদিগের বস্ত্র চুরি করিয়া বাঁশী বাজাইতেছে।

লক্ষ্মীদেবী এইরূপ ব্যঙ্গ-পরিহাসের যথোচিত প্রত্যুত্তর পাইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি পার্ব্বতীকে 'ভিক্ষুক কোথায় গেল' বলিয়া সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করায় পার্ব্বতীদেবী তাঁহার দরিদ্রতার কথা ভাবিয়া নিতান্ত ক্ষুন্না হইলেন। শূলপাণি দিনান্তে ভিক্ষা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, দেবী তাঁহাকে লক্ষ্মী-কৃত অপমানের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ও ধান্যের ক্ষেত করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। প্রভু ভোলানাথও প্রেয়সীর অনুরোধে তৎপর দিন হইতেই কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে ধান্যের বীজ সংগ্রহ করিলেন, নিজ বৃষভের সহিত হলাকর্ষণ করিবার জন্য যমের বাহন মহিষটীকে আনিলেন এবং আপনার ত্রিশূলের অগ্রভাগ দ্বারা লাঙ্গলের ফলক নির্ম্মাণ করিলেন। মহাদেব কৃষিকার্য্যে

এরূপ মত্ত হইলেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন—এমন কি, বাড়ী ফিরিবার কথা তাঁহার আর মনে হইল না। পরিশ্রমের সাফল্য দেখিয়া তিনি কেবল ক্ষেত বাড়াইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বহুদিন যাবৎ প্রাণেশের দর্শনলাভ না হওয়ায় দেবী বিষম চিন্তিতা হইয়া তাঁহার কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি ধান্যের ক্ষেত দেখিয়া নিরতিশয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া "আই ঔ! কি খেতি ঔ!" (মাগো কি ক্ষেতই হইয়াছে) এই বলিয়া চিৎকার করিলেন। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ হইতে দুইটী অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া মহেশ্বরের পাকা ধানে লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এই কাণ্ড দেখিয়া দেবীতো অবাক। তাঁহারই দ্বারা ইহার সংঘটন হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

ব্যোমকেশ ধান্যক্ষেত্রের অপর প্রান্ত হইতে এই অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া পিণাক ধারণপূর্ব্বক এই দাবাগ্নি প্রধূমিত করিতে ধনুকে শর যোজনা করিলেন। এমন সময় ক্ষেতের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল ও তথা হইতে একটী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নির্গত হইয়া মহেশ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদমূলে সাষ্টাঙ্গ প্রাণপাত করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া মহেশ ক্রোধান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথাকার জীব এবং কি জন্যই বা আমার এত সাধের শস্য নষ্ট করিলে?" তখন ঐ বৃদ্ধ অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিল "প্রভো! আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার ক্ষেত্রজ সন্তান—পার্ব্বতী দেবীর নাসারন্ধ্র হইতে আমাদের জন্ম হইয়াছে। আমার নাম 'খোবা' আর ইনি আমার স্ত্রী—নাম 'খুবী'। আপনি দয়া করিয়া আমাদের খাওয়া-পরা এবং বাস-স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিউন। খোবা মহেশ্বরের নিকট এইরূপে তাহাদের আত্মপরিচয় দিয়া আদ্যোপান্ত সমস্তই বিবৃত করিল। তখন আশুতোষ তাহাদের করুণ প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া অভয় দিয়া বলিলেন, "তোমরা যখন আমারই সন্তান, তখন তোমরাও

অমর দেব-দেবী হইলে। অন্যান্য দেব-দেবীর ন্যায় আমি তোমাদিগকে মর্ত্তলোকে একটী পূজার ভাগ দিব। কিন্তু আমি নিজে তাহা দিতে পারিব না। ত্রেতাযুগে শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরামচন্দ্র রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন; তিনিই তোমাদিগের পূজা-বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন। তোমরা সেই সময় পর্য্যন্ত 'ঢেঢেঞা' পর্ব্বতে [বিন্ধ্যাচলে] যাইয়া বিশ্রাম কর; আর তোমরা আমার যে ধান পোড়াইয়া নষ্ট করিয়াছ, তাহার জন্য আক্ষেপ করিও না। কেননা—পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্র এই দুই প্রকার লোক আছে। ধনীদিগের ভোগের জন্য অদগ্ধ ধানগুলির 'শালি' ও দরিদ্র-দিগের ব্যবহার্য্য হেতু দগ্ধ ধানগুলির 'আশু' (আউস) নাম দিয়া আমি সৃষ্টি করিলাম।" ইহা শুনিয়া খোবা-খুবী, মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আদেশ-মত 'ঢেঢেঞা পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং তদবধি এই পৃথিবীতে 'শালি' ও 'আশু' দুই প্রকার ধান্য হইল। ভিক্ষুক ভোলানাথ তদীয় উৎপাদিত ধান্যসকল ধরাবক্ষে বর্ষণ করিয়া দিয়া আবার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলেন।

ত্রেতাযুগে ভগবান বিষ্ণু, শ্রীরামচন্দ্র-রূপ ধারণ করিয়া নরলীলা প্রকট করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। * * * * ‡‡

হনুমান পর্ব্বত বহন করিয়া আনেন আর নল তাহা স্পর্শ করিলেই নলখাগড়ার সব মত হালকা হইয়া যায়। ইহাতে সকলেই নলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। নলের প্রশংসা শুনিয়া মহাবীরের অতিশয় ঈর্ষা ও ক্রোধ হইল। তিনি নলকে বিনাশ করিবার মানসে ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে ঢেঢেঞাটী আমূল উত্তোলন করিয়া আনিয়া "ধর" বলিয়া নলের মস্তকোপরি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলে প্রভু রামচন্দ্র, নলের

‡‡ কথক ঠাকুর এই স্থানে আদিকাণ্ড হইতে সুন্দরাকাণ্ডের সেতুবন্ধ উদ্যোগ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করেন।

আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া আপন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উক্ত ঢেঢেঙ্কা পর্ব্বত ধারণ করিয়া খড়্গ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া নলের হস্তে দিলেন। মহাবীর হনুমান, শ্রীরামচন্দ্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং "উঃ কি ভয়ানক বীর" এইরূপ বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র শ্রীরামচন্দ্রের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটীর ভয়ানক প্রদাহ আরম্ভ হইল। প্রভুও অনন্যোপায় হইয়া খড়্গদ্বারা নিজের অঙ্গুষ্ঠের প্রদগ্ধ অংশটী কাটিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত খোবা-খবী নির্গত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং আপনাদের পরিচয় দিয়া মহেশের প্রতিশ্রুত বৃত্তির জন্য প্রার্থনা করিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া এই প্রকারে তাহাদের বৃত্তির বিধান করিলেন ঃ—১। যে ব্যক্তি লোক-চলাচল-করা রাস্তার উপর আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিবে অথবা তথায় শৌচ, প্রস্রাবাদি করিবে সেই ব্যক্তির উপর তোমাদের অধিকার হউক; ২। যে ব্যক্তি শৌচ, প্রস্রাবাদির পর আচমনাদি না করিবে অথবা অপবিত্র শরীরে কাহাকেও স্পর্শ করিবে বা বিনা স্নানে গৃহপ্রবেশ করিবে, তাহাদের উপর তোমাদের অধিকার হউক; ৩। বত্রিশ দন্তবিশিষ্ট লোকের মুখে তোমাদের আবাস হইবে এবং সেইরূপ ব্যক্তির সম্মুখে কোন লোক আহারাদি করিলে সেই লোককে তোমরা আক্রমণ করিবে। বত্রিশ দন্তবিশিষ্ট লোক কাহাকেও প্রশংসা করিলে সেই প্রশংসিত ব্যক্তির রক্ত, মাংস ও স্বাস্থ্যের উপর তোমাদের অধিকার হউক; ৪। কোন নিষিদ্ধ তিথিতে নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনকারীদিগের উপর তোমাদের প্রভুত্ব হউক। ৫। কোন বিবাহ হইলে তাহার তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার সময় তোমাদিগকে যে ভোগ নিবেদন করা হইবে, তাহাই তোমাদের আহার্য্য হইবে। যদি তোমাদের উদ্দেশ্যে ভোগ-নৈবেদ্য প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে দম্পতির জীবনে কখনও সুখ-শান্তি হইবে না।"

তখন সুগ্রীব বলিলেন, প্রভো! খোবা-খুবীকে বর দান করিয়া লোক-

সমূহের প্রভূত অনিষ্ট করিলেন। ইহার এমন একটী প্রতিবিধানও বলিয়া দিউন, যাহাতে মনুষ্যগণ এই খোবা-খুবীর দুর্ব্বিপাকহ ইতে রক্ষা পাইতে পারে।"—ইহা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন "খোবা-খুবীর দ্বারা আক্রান্ত লোকেরা ইহাদের জন্ম-বৃত্তান্তমূলক মন্ত্রের দ্বারা আদা ঝাড়িয়া খাইলে উদরজনিত পীড়া হইতে রক্ষা পাইবে এবং খোবা-খুবী-স্পৃষ্ট অন্যান্য রোগসমূহে 'নরসিংহ' গাছের পাতার দ্বারা রোগীকে খোবা-খুবী মন্ত্রে ঝাড়িলে রোগের উপশম হইবে। বিবাহের তৃতীয় দিবসে জ্ঞাতি, পুরোহিত ও দেবতার সম্মুখে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বর-কন্যাকে এই উপাখ্যান শুনাইলে তাহাদের শরীর হইতে খোবা-খুবী পলায়ন করিবে।" ইত্যাদি বলিয়া প্রভু শ্রীরামচন্দ্র খোবা-খুবীকে বিদায় দিলেন।

বিবাহের তৃতীয় দিন সভামধ্যে খোবা-খুবীর উদ্দেশে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, পুরোহিত ঠাকুর তদ্দ্বারা খোবা-খুবীর পূজা করেন। উহা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল দ্রব্য এই তথা-কথিত দেব-দেবীকে নিবেদন করা হয় সেগুলির সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাউক :—

খোবা-খুবীর নৈবেদ্য ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের প্রসাদ ভক্ষণ

১। মুগ ও বুট উত্তমরূপে ধুইয়া একটী পাত্রে ভিজাইয়া রাখা হয় এবং আর একটী জলপূর্ণ পাত্রে আবশ্যকমত মিহি চাউল কিছুক্ষণ রাখিবার পর সেগুলিকে ঐ মুগ ও বুটের সহিত মিশান হয়। এই মিশ্রিত দ্রব্যত্রয়ে কিঞ্চিৎ আদা ও লবণসংযোগ করিয়া সেগুলিকে 'শরাই'এর উপর তুলিয়া উহাদের সহিত কলা, কমলা নেবু, ইক্ষু প্রভৃতি ফলমূল দ্বারা সাজন হইলে অন্তঃপুর হইতে বিবাহ-সভায় লইয়া যাওয়া হয় ; ২। এতদ্ব্যতীত বাটীর মহিলারা ঢেঁকিতে কুট্টিত আতপ তণ্ডুল ভিজাইয়া রাখিবার পর তৎসহ লবণ ও গুঁড়া 'জালুকা' [গোলমরিচ] মিশাইয়া রাখেন। উহাকে 'পিঠা গুরি' বলা হয়। এই 'পিঠা গুরি'র সহিত পরিমাণমত ঘৃত, মধু, গুড়, চিনি, দুগ্ধ, এলাইচ, জায়ফল, কালজিরা ও

'ভোগজিরা' [সাদা জিরা] মিশাইয়া উদুখলে উত্তমরূপে কুটিয়া ফেলে। তৎপরে সেগুলিকে লইয়া পাতি লেবুর আকারে একটী একটী লাড়ু পাকান হয়। যাহা হউক, পুরোহিত ঠাকুর খোবা-খুবীর পূজা সমাপন করিয়া সদাশিবের উৎপত্তি-বিষয়ক স্তোত্র পাঠ করেন। এই সময় বর-কন্যা গাঁইটছড়া-বদ্ধ হইয়া এবং রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি-চিহ্নিত কাষ্ঠের 'মুরিয়ন' [টোপর] পরিধান করিয়া অনন্যচিত্তে তাহা শ্রবণ করেন। তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অন্যান্য লোকদিগকে ও ঐ সমস্ত উৎসর্গীকৃত দ্রব্য [লাড়ু প্রভৃতি] ভোজনার্থ বণ্টনপূর্ব্বক দেওয়া হয় এবং সভাস্থ গুরুস্থানীয় ব্যক্তিরা বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর তাঁহারা ও তত্রত্য অন্যান্য লোকেরা ঐ লাড়ুগুলিকে বণ্টন করিয়া খাইয়া থাকেন। নিম্ন-আসামের কোন স্থানে বিবাহের তৃতীয় দিবস খোবা-খুবীর উদ্দেশ্যে কোনরূপ প্রসঙ্গই হয় না। এমন কি—সেখানকার বার আনা শিক্ষিত ব্যক্তি এই দানব-দানবীর নামও অজ্ঞাত। সংস্কৃত নন্দীপুরাণের অন্তর্গত 'খোবা-খুবী' চরিতের 'অসমীয়া পদ-রচক ৺ভায়ারাম শর্ম্মার পুঁথি [খোবা-খুবী] হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

ক্ষুদ্র নোহে খোবা-খুবী পার্ব্বতী তনয়।
যার কথা শুনিলে সবারো ভয় হয়॥
বিয়ার তৃতীয় দিনা সবাহ পাতিয়া।
পিষ্টকাদি নানাদ্রব্য একত্র করিয়া॥
জ্ঞাতি কুলপুরোহিত ডাকি আনিবন্ত।
ইষ্ট মিত্র সমে সন্ধ্যাকালে বসিবন্ত॥
মাঝে মাঝে শিবদুর্গা নাম উচ্চারিয়া।
হরিনাম গাব সবে উৎসব করিয়া॥
পাছে দরা-কনিয়াক সমাজে আনিব।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণে এহি আখ্যান কহিব ॥
হবিষ্যে থাকিয়া বর-কন্যা দুইজন।
পরম ভক্তিভরে তাক করিব শ্রবণ ॥
খোবা-খুবী আখ্যান সম্পূর্ণ হোবৈ যেবে।
বর কন্যা দুই জনে প্রণামিব তেবে ॥
নারীগণে উরুলি মঙ্গল আচরিব।
সভাসদ সবে পাছে আশীষ করিব ॥
পিষ্টকাদি যত দ্রব্য বাণ্টিয়া খাইব।
পাছে যার যেহি স্থান সেহি স্থানে যাব ॥
এহি আখ্যানক নিতে যিতো গায়া ফুরে।
খোবা-খুবী নছাপন্ত তাহার ওছরে ॥
শুনিলে সকল হোবৈ কামনার সিদ্ধি।
ধন ধান্য বংশ পুণ্য ঐশ্বর্য্যর বৃদ্ধি ॥
নন্দিপুরাণর কথা অতি মনোহর।
কার্ত্তিকত কহিলা নারদ মুনিবর ॥

পাকস্পর্শ—বাঙ্গালীদিগের প্রথামতঃ অসমীয়া হিন্দুদিগের মধ্যে পাকস্পর্শের প্রচলন নাই। কাছাড় অঞ্চলের যে সকল স্থানে এখনও উহা বিলুপ্ত হয় নাই, সেই সকল স্থানে বিবাহান্তে চতুর্থ মঙ্গলবারের পর দিন উহার অনুষ্ঠান হয়। অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ [গ্রহবিপ্র]দিগের সমাজে এবং কলিতাদি জাতির যে সকল লোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া এই তিন জাতির সদাচার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই :—"কন্যার পাকস্পর্শ-ক্রিয়া না হওয়া পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ের গুরুজনেরা [এমন কি স্বামী পর্য্যন্ত] তাহা পাচিত অন্ন অশুদ্ধ জ্ঞানে কদাচ গ্রহণ করেন না।" নিম্ন-আসামের কামরূপ অঞ্চলে পুংসবন সংস্কারের পর সপ্তম

মাসে স্বামীগৃহে ব্রাহ্মণ-কন্যার পাকস্পর্শ হয়। ইহার অনুষ্ঠানের জন্য কন্যার শ্বশুরকে [তিনি মৃত হইলে স্বামীকে] তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও কুটুম্ব-গণের নিকট অনুমতি গ্রহণান্তর একটী শুভদিন স্থির করিতে হয়। ঐ শুভদিনে তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্ব একত্রিত হইয়া বধূর পাচিত অন্ন ভোজন করেন। এই অঞ্চলের কায়স্থাদি জাতির কন্যার শান্তি বিয়া [দ্বিতীয় বিবাহ] অন্তে ছেলে-পুলের মা হইয়া একটু বয়ঃস্থা হইলে পাকস্পর্শ হয়। রন্ধনকার্য্যের জন্য সংসারে বয়ঃস্থা স্ত্রীলোক না থাকিলে বধূকে বাধ্য হইয়া পাককার্য্য করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাহার দ্বিতীয় বিবাহের পরই পাকস্পর্শ হইয়া থাকে। মধ্য-আসামের তেজপুর অঞ্চলের লোকেরা পাকস্পর্শকে রাধুনী দিয়া বা সুমুয়া বলেন। উপর-আসামে [সদাচারী হিন্দুদিগের মধ্যে] বিবাহান্তে কন্যাকে বরের বাড়ীতে আনিয়া গর্ভাধান ও পুংসবন সংস্কার-কার্য্য সমাধা করা হয়। তৎপরে গুরুর নিকট হইতে তাঁহাকে 'শরণ' অথবা 'মন্ত্র' গ্রহণ করান হইলে বরকর্ত্তা আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে একটী জাঁকাল রকমের ভোজভাত দিয়া তাহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন। সে অঞ্চলে ইহাকে ন ছোয়ালী রন্ধনী পতা বলে। আসামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ আদি জাতির লোকেরা এই নিয়মেই পাকস্পর্শ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

অষ্টমঙ্গল—বিবাহের অষ্টম দিবসে কন্যার বাটীতে দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে বিবাহের আসর প্রস্তুত করিয়া 'অষ্টমঙ্গল' উৎসব হয়। আসাম অঞ্চলের সকল স্থানে ইহার অনুষ্ঠান নাই। এই দিন নব জামাতাকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক আনিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও পরমান্নাদি ভোজন করানই এই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদুপলক্ষে পাড়াপ্রতি-বাসী ও বন্ধুবান্ধবগণও নিমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন। সাধারণ হিন্দুশ্রেণীর বর, ঐ দিন শ্বশুরালয়ে যাইয়া কুটুম্বগণ সহ একত্রে উপবেশন করিয়া পিঠা, মৎস্য, মাংস আদি ভোজভাত খাইয়া থাকে। অষ্টমঙ্গলের

উপলক্ষে নব জামাতাকে খড়ম, লাঠি, কন্যার হাতে-বোনা চেলেং [মূল্যবান চাদর বিশেষ] প্রভৃতি দ্রব্য উপহার দেওয়া হয়। ধুবড়ী অঞ্চলে অষ্টমঙ্গলকে আঠমাংলাও বলা হয়।

স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ

কন্যার দ্বিরাগমন—আসামের ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ (১) ও প্রকৃত কায়স্থগণের কন্যারা বিবাহের কয়েক দিন পরে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসেন এবং যৌবনে পদার্পণ না করা পর্য্যন্ত সেখানে বাস করেন। দ্বিরাগমন কাল পর্য্যন্ত বর-কন্যার পরস্পর সাক্ষাৎ কিংবা পত্রব্যবহার করিবার প্রথা এখনও উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুদিগের মধ্যে নাই। যদি কাহারও জামাতা অপ্রকাশ্যে এই চিরন্তন জাতীয় প্রথাবিরুদ্ধ কার্য্য করেন, কোনক্রমে প্রকাশ পাইলে, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের আত্মীয় স্বজনগণের নিকট নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন এবং স্বজাতীয় সমাজে ধিক্কৃত হন।

কন্যার পাকান্ন—উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত বণিয়াদি ঘরের অসমীয়া হিন্দুরা বিবাহের পর কন্যার হস্তপাচিত অন্নভোজন করেন না। সাত্রধিকার [ধর্ম্মাচার্য্য]গণের পত্নীরা দ্বিতীয় বিবাহ সংস্কারের পর পিত্রালয়ে আসিলে স্বপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন। এখনও জাতীয় প্রথাপরায়ণ জামাতারা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়াই ভোজন করেন। তাঁহারা বলেন—"এইরূপ রীতির দ্বারা অনেকটা সংযম রক্ষা হয়।" বাঙ্গালীদিগের সহিত গাঢ় সংস্পর্শের ফলে নগরবাসী অসমীয়াগণ তাঁহাদের এই চিরন্তন প্রথাটীর উচ্ছেদ করিয়াছেন।

(১) দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ=গ্রহার্চ্চনা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, বালক-বালিকার নামকরণ, জন্মপত্রিকা করণ, বর-কন্যার যোটকমিলন, বিবাহের লগ্ন নিরূপণ এই কয়টী ইঁহাদের জাতীয় বৃত্তি। কামরূপ ও মধ্য আসামের স্থানবিশেষের দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণরা বর্ত্তমানে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। •স্বনাম ধন্য শ্রীযুত নবীনচন্দ্র বড়দলৈ মহোদয় বলেন—"কামরূপের গন্ধিয়া একটী দৈবজ্ঞপ্রধান স্থান।"

অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

আসাম অঞ্চলে চারি প্রকার বিবাহ হইয়া থাকে, যথা—ধরম বিয়া, বর বিয়া, বুঢ়া বিয়া ও হারগুচি বিয়া। শেষোক্ত বিবাহ দুইটী নিম্ন-শ্রেণীর

ধরম বিয়া, বর বিয়া ও বুঢ়া বিয়া

উপ-দম্পতিদিগের বিবাহ। নিম্ন-আসামের কোথায়ও হারগুচি বিয়ার প্রচলন নাই। কন্যার রজোদর্শনের পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র বিবাহ হইলে তাহাকে ধরম বিয়া এবং পুষ্পিতা কন্যার বিবাহকে বর বিয়া বলে। আসাম দেশীয় ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থদিগের সমাজে বুঢ়া বিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্য শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি, বিশেষ কোন অসুবিধা বশতঃ পৈশাচ বিবাহ-প্রথানুযায়ী স্ত্রী গ্রহণ করিবার কিছুকাল পরে, যখন প্রাজাপত্যমতে কোন একটী শুভ-বিবাহের দিনে উভয়ের চন্দ্র এবং তারা শুদ্ধ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত নোয়ন-ধোয়ন আদি কার্য্যের পর যে বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে বুঢ়া বিয়া

হাড়গুচি বিয়া

বলে। এক্ষণে "হারগুচি বিয়া"র কথা বলা যাউক। 'উজনী' অঞ্চলে ইহা দুই প্রকারে প্রচলিত দেখা যায়। যে সকল নিম্ন-শ্রেণীর যুবক-যুবতী তাহাদের পরস্পর মনোমিলন হইলে, বিবাহ না করিয়াই স্ত্রী-পুরুষভাবে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করে, তাহাদের সন্তান-সন্ততি বড় হইলে, যখন বিবাহের কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ঐ পিতামাতাকে বিষম মুস্কিলে পড়িতে হয়; কারণ—তাহাদের বিবাহ হয় নাই, এবং সেই জন্য তাহাদের ছেলে-মেয়েরও বিবাহ হইতে পারে না। তখন ঐ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিজ নিজ পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য বাধ্য হইয়া সামাজিক প্রথামতে বিবাহ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নিম্ন-শ্রেণীর

যে সকল ব্যক্তি, হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ করে নাই, বৃদ্ধ হইলে তাহাদের মনের মধ্যে যখন এই ধিক্কার আসে—"এতদিন অশুচি অবস্থায় জীবন যাপন করা হইল, মরিয়া যাইবার সময় হইয়া আসিল, এখন বিবাহ-সংস্কার দ্বারা 'হাড়' [দেহাস্থি] 'শুচি' [শুদ্ধ] করা আবশ্যক।" তখন তাহারা পুরোহিত ডাকিয়া যথারীতি বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করে। উজনী অঞ্চলের স্থান বিশেষে এই ধরণের যে বিবাহ হয়, তত্রত্য লোকেরা তাহাকে "হাড়শুচি বিয়া" বলে।

কামরূপে সোহাগ তোলার অনুষ্ঠান-বিধি

'সোহাগ তোলা' বা 'সুয়াগ তোলা' একটী স্ত্রী আচার বিশেষ। স্ত্রী আচার মাত্রেরই একই উদ্দেশ্য—"বশীকরণ"। লগ্নকালে স্ত্রী আচার সম্পাদিত হয়। ইহা কুলাচারের অন্তর্গত। 'সুয়াগ' সৌভাগ্য শব্দের অপভ্রংশ। যে পতির প্রতি পত্নী অত্যন্ত প্রেমপরায়ণা, তিনি 'সুভগ' পতি। 'সুভগা' [সুয়ো] এবং 'দুর্ভগা' [দুয়ো] শব্দের অর্থ বাঙ্গালার সকলেই জানেন। সুভগ বা সুভগার ভাব—সৌভাগ্য, সোহাগ। ৩১শ এবং ৩৯শ পৃষ্ঠায় আমরা সুয়াগ [সোহাগ] তুলার কথা বলিয়াছি। এক্ষণে অনুক্ত বিষয়গুলি বলা যাউক। কামরূপ অঞ্চলে বর কিংবা কন্যাকে স্নান করাইবার পর চন্দ্রাতপের নিম্নে বসাইয়া রাখিয়া তাহাদের মাতার সহিত 'আয়তী'রা সুয়াগ তুলিতে যান। বর কিংবা কন্যার মাতার সেখানে গমনকালে জনৈক সঙ্গিনী তাঁহাদের শিরোপরি 'দলাঝাপি' [বৃহদাকার ঝাপি] ধরিয়া থাকে; বাদ্যকরেরা অগ্রে অগ্রে বাদ্য করিতে করিতে এবং আয়তীরা 'সুয়াগ তুলা'র গীতগুলি গাহিতে গাহিতে যায়। ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বর কিংবা কন্যার মাতা একখানি কুলায় করিয়া ধান্য, 'মাটীকলাই' [মাসকলাই], তিল, মাল্য প্রভৃতি লইয়া চলেন বা অপর মহিলার দ্বারা ঐ কুলাখানি লওয়াইয়া যান। ইহার সঙ্গে 'দুনী' [তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র], 'সহস্রবাতি' [প্রদীপের থালা] 'টেকেলি'

[মৃৎঘট] প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া যাওয়া হয়। বর কিংবা কন্যার মাতা জলাশয়কে সাগর কল্পনা করিয়া তাহাতে ডুব দিয়া কিয়ৎপরিমাণ মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া তীরে উঠিয়া আসেন। উক্ত দ্রব্যগুলিতে এই মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া কুলায় রাখা হয়। অতঃপর বর অথবা কন্যার মাতা তণ্ডুল, পান, 'তামোল' প্রভৃতি সেখানে জলদেবতাকে প্রদান করিয়া এই কুলাসহ স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর বর অথবা কন্যার মস্তকোপরি একখানি বস্ত্র পাতিয়া কুলা হইতে ঐ সুয়াগ তুলার দ্রব্য লইয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কামরূপ অঞ্চলে শেষোক্ত ক্রিয়াটীকে সুয়াগ জারা বলে।

চকু'লি ভার, তেলের ভার, তেলের কাপর

আমরা ৩৬শ ও ৪৩শ পৃষ্ঠায় ডাবলি ভার [হোমের ভার] সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। কামরূপের ডাবলি ভারকে মধ্য-আসাম ও উপর আসামে চকু'লি ভার [কেহ কেহ "চক'লি শব্দর ভার"] বলেন। উপর-আসামের অনেক স্থানে চক'লি ভারের সহিত যে তেলর ভার থাকে, তাহাতে তৈল, বাটা হলুদ পাটি, ছোট বাটি, কাটারি প্রভৃতি থাকে। কামরূপ অঞ্চলে বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে কিংবা পূর্ব্বদিন বরকর্ত্তা, কন্যার বাটীতে তৈল, তাম্বূল, পান, দধি, দুগ্ধ, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য ব্যতীত কন্যার পরিধেয় বস্ত্র, অলঙ্কার, সিন্দূর আদি ভারে করিয়া পাঠাইয়া দেন। সঙ্গতিপন্ন বরের বাটী হইতে অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশ জন বাহক-বাহিকা ত্রিশ-চল্লিশখানি ভারে করিয়া ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যায়। অগ্রবর্ত্তী ভারখানিতে কন্যার জন্য তৈল, সিন্দূর থাকে বলিয়া উহাকে ও উহার সহিত প্রেরিত অন্যান্য ভারকে কামরূপের লোকেরা তেলর ভার বলেন। কন্যার মস্তকে এই তৈল প্রদানান্তর উহাকে যে মাঙ্গল্য বস্ত্র [বরগৃহের কাপড়] পরিধান করান হয়, তাহার নাম তেলর কাপড়। কামরূপ অঞ্চলে কন্যার শ্বশুরালয়ে যাইবার কালে একখানি ডাবলি ভার পাঠান হইত। এখন

সে প্রথাটী প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, কয়েকজন বাহক ও বাহিকা চ'কলি ভার সহ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইলে তত্রত্য মহিলারা কন্যাকে লইয়া অন্তঃপুরে একটী মজলিস করেন। বরের বাটী হইতে প্রেরিত মহিলারা সেখানে কন্যাকে ঐ অলঙ্কার পরাইবার সময় যে গীত গায়, তাহার নাম জোড়ন পিন্ধোয়া নাম।

বর-কন্যার স্নানান্তে আগজুই দিয়া ও মূরত চাউল দিয়া

তেজপুর হইতে আরম্ভ করিয়া উজনী অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু সমাজে দেখা যায়—'বেই'এর উপরিস্থিত চারিপায়া যুক্ত একটু উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসিয়া বরের বাটীতে বর অথবা কন্যার বাটীতে কন্যা স্নান করিলে পর তাঁহাদের মাতা—[তদভাবে কোন গুরু স্থানীয়া মহিলা]—প্রদীপের অগ্নিশিখায় হাতের তালু সেঁক দিয়া তদ্দ্বারা বর অথবা কন্যার গণ্ডস্থলে সেঁক দেন। এই প্রথাটীর নাম আগ জুই দিয়া। তৎপরে পাঁচজন অথবা সাতজন এয়োস্ত্রী দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ আতপ চাউল লন এবং উভয়কে ঐ কাষ্ঠাসন হইতে নামিতে না দিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যোড়হাত ও অবনত মস্তক করাইয়া ঘেরিয়া দাঁড়ান এবং উভয়ের মস্তকে অল্প অল্প করিয়া ঐ চাউল ছড়াইয়া দেন। অসমীয়া হিন্দুরা এই প্রথাটীকে মূরত চাউল দিয়া এবং তৎকালীন গীতকে মূরত চাউল দিয়া নাম বলেন। বর-কন্যার নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি ও দীর্ঘ জীবন লাভ হেতু এয়োস্ত্রীগণের ঐ "মূরত চাউল দিয়া" অনুষ্ঠানটী একটী মাঙ্গলিক স্ত্রী আচার বিশেষ। ইহার পর বর কিংবা কন্যার মাতা অথবা টেকেলি [মৃৎঘট] ধরা স্ত্রীলোক উভয়ের সাজ-সজ্জার জন্য সেখান হইতে

বর-কন্যার বেশভূষা পরিধানের স্থান

বর কিংবা কন্যাকে সাদরে নোয়নি ঘরে লইয়া যান। কামরূপে ইহাকে ধোয়নি ঘর বলে। ২৫শ পৃষ্ঠায় আমরা নিম্ন-আসামের কামরূপের বর-কন্যার নববস্ত্র পরিধান এবং ৩০শ পৃষ্ঠায় স্নানের বিষয় বলিয়াছি। 'উজনী' অঞ্চলে বর কিংবা

কন্যাকে 'বেই'এর উপর বসাইয়া 'নোয়ন' [স্নান] করান হয়। তাহাকে নোয়নি বা নোয়ন ঘর বলে। এই ঘরে উভয়ের উপবেশনের জন্য একটী আসন পাতা থাকে। এই আসনে বর অথবা কন্যাকে বসাইয়া বেশভূষা পরিধান করান হয়।

বিবাহ-স্থান=উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুরা কিরূপে বর-বরণ করেন, ৩৭শ ও ৪৩শ আমরা তাহা বলিয়াছি। বর-কন্যার বিবাহ স্থানকে কামরূপে ছায়নর তল, উত্তর কামরূপের পাটিদরঙ্গ অঞ্চলে ও দরঙ্গ মহকুমায় আগ দিয়া থল এবং মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে রভাতল বলে।

অসমীয়া ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বিবাহকালীন শুভ-দৃষ্টির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। তবে বিবাহের অব্যবহিত পরেই

অসমীয়া বর-কন্যার শুভ-দৃষ্টি ও বৈদিক ক্রিয়াদি

সমাগত জ্ঞাতি, কুটুম্বদিগের সম্মুখে কন্যার ঘোমটা সরাইয়া সকলকে তাহার মুখ দেখান হয়। সেই সময় বর'ও কন্যাকে নিরীক্ষণ করেন। উজনী অঞ্চলের কায়স্থ, কলিতা, কেওট, বৈশ্য প্রভৃতির মধ্যে 'আগ চাউল দিয়ার' পর বর-কন্যার শুভ-দৃষ্টি হয়। ইহার উদ্দেশ্য—বর কন্যার উভয়ের মধ্যে অপরিচিত ভাব দূর করা। অতঃপর কন্যার ঠাকুরমাতা ও বৌদিদি সম্পর্কীয় মহিলারা বর-কন্যাকে লইয়া নানারূপ রহস্যালাপ ও কৌতুক করেন এবং পাশা খেলিয়া থাকেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে বর-কন্যাকে লইয়া বেদির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রদক্ষিণের পর কন্যা-সম্প্রদান, বধূ-বরের হস্তলেপ দান, গ্রন্থিবন্ধন, কুশণ্ডিকা হোম, সপ্তপদী গমন আদি অনুষ্ঠিত হয়।

মধ্য-আসামের স্থানবিশেষে এবং উপর-আসামে বর-কন্যার পরস্পর মুখদর্শন করাকে "মুখচন্দ্রিকা ভাঙ্গা" এবং চলিত কথায় মুখচন্দরিভাঙ্গা বলে। এই প্রথাটী কামরূপ অঞ্চলে নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটিতে

"নামতি আইদিগের" "আদি রসাত্মক মুখচন্দ্রিকা ভাঙ্গা নাম" গাহিবার

মুখচন্দ্রিকা ভাঙ্গা বা মুখচন্দরি ভাঙ্গা

কালে ভদ্রলোকের বাটীর মহিলারা তাহাদের সঙ্গে যোগদান করেন না। মুখচন্দ্রিকা ভাঙ্গা কালে পুরোহিত ঠাকুর, বরের দ্বারা "চন্দ্রং চন্দ্রং দিবসে চন্দ্রং চন্দ্রেন মুখচন্দ্রিকা" ইত্যাদি মন্ত্রটী আবৃত্তি করান। নিম্নে একটী 'মুখচন্দ্রিকা ভাঙ্গা নাম' প্রদত্ত হইল ঃ—

গোবররে ভেররে লাই হরি হরি
          গোবররে ভেররে লাই।
নারে সখি—কান্দে বিলাপ করি
          খোপালৈ নকরে কাণে ঐ ॥
কিনো চাই আছিলা টেলেকা চকুরা
          লবা বাগরি যাই।
নারে সখি—কান্দে বিলাপ করি
          খোপালৈ নকরে কাণে ঐ ॥
চইত চেলেঙ্গি থয় আমার বোপাই
কিনো চিকনে কাপোবব কনাইটো
          তাক কোচ পাতি লয়ে।
নারে সখি—কান্দে বিলাপ করি।
          খোপালৈ নকরে কাণে ঐ ॥**

**শব্দার্থ—ভের—সারযুক্ত গাদা। লাই—সরিসা শাক। খোপালৈ—খোপার দিকে। ন করে কাণে—মনোযোগ দিতেছে না। চাই আছিলা—দেখিয়াছে। টেলেকা চকুয়া—ডেঙ্গরা চোকো। বাগরি যায়—গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছই—ছই (screen)। চেলেঙ্গি—চাদর। কনাই—পরস্পর সংলগ্ন চারিটী যজ্ঞডুম্বর ; একটী 'সোনার মণি' [কাঁচের পুঁতি বিশেষ] ও একটী গোটা পান একত্র করিয়া বাধা হইলে উজনী অঞ্চলে তাহাকে 'কনাই' বলে। কোচ—কাপড়।

বিবাহ-গীতি ও বিবাহের বাজনা

তৃতীয় অধ্যায়

বিবাহ সংক্রান্ত কয়েকটী শাস্ত্রীয় বিধি ব্যতীত স্ত্রী আচারাদি বিষয়ে ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে উজনী [সাধারণতঃ তেজপুর হইতে উত্তর লখিমপুর পর্য্যন্ত] ও নামনী আসাম অঞ্চলের হিন্দুদিগের বিবাহ-প্রণালী কতকটা বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদিগকে নিজ নিজ দেশের নিজ নিজ পরিবারের প্রথামতেই চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহা হউক, বিবাহ, পূজা ও অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডের সময় উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া ভদ্রমহিলারা রাগ সহ গীত গাহিয়া থাকেন। রাগিণী সহ কোন গীত গাহিতে তাঁহারা পারেন না। অন্য কোন সময়ে নাকি তাঁহাদিগের গীত গাহিবার রীতি নাই। কামরূপের হিন্দুসমাজে বিবাহের বেদোক্ত মন্ত্রগুলি যেমন অপরিহার্য্য, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সেখানে বিয়ার গীতগুলিও তদ্রূপ ছিল। কারণ—নবদম্পতির মনে শিব-দুর্গা, সীতা-রাম অথবা রুক্মিণী-কৃষ্ণের আদর্শ অনুপ্রাণিত করিয়া দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কন্যার মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের মনে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা ঐ সকল গীতের উদ্দেশ্য। আজকাল কামরূপের প্রাচীন গায়িকারা একে একে সংসারক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতেছেন এবং নব সম্প্রদায়ের গায়িকারা সাবেক গীতগুলি রক্ষা করিতে তেমন চেষ্টা করিতেছেন না। আমাদের মনে হয়—আর পনর যোল বৎসর পরে প্রাচীন "বিয়ার গীত" কামরূপ হইতে লোপ পাইবে। যাহা হউক, বিবাহে "পঞ্চ আয়তী"রা যে 'নাম' গাহিয়া বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন, তাহাতে কোন বিধবার যোগদান করা নিষিদ্ধ।

উজনী ও নামনী আসামের মহিলাদের বিবাহ-গীতি প্রসঙ্গ

উজনী অঞ্চলের লোকেরা বিবাহ-আসরে গায়িকাকে 'নামতী আই' ও বিবাহ বিষয়ক গীতকে বিয়ানাম এবং নামনী আসামের লোকেরা তত্রত্য গায়িকাকে আয়তী ও বিবাহ-বিষয়ক গীতকে বিয়ার গীত বলেন। কামরূপ অঞ্চলে নাম শব্দে "ভগবানের নাম" অথবা "লোকের নাম" বুঝায়। বিবাহের উৎসব উপলক্ষে বাড়ীর মহিলারা কেবল গীত গাহেন না— বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা কয়েকজন প্রতিবেশিনীকেও বিয়ানাম বা বিয়ার গীত গাহিবার জন্য স্ব স্ব বাটীতে আহ্বান করিয়া থাকেন। 'নামতী' বা 'আয়তী'রা বর ও কন্যাপক্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ-পূর্ব্বক যে আমোদজনক অথবা বিদ্রূপাত্মক গীত গায়, তাহাকে যোড়ানাম বলে। ইহা কিন্তু বিবাহোৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। কামরূপ অঞ্চলে যোড়ানামকে খিচা গীত [হাস্যোদ্দীপক গীত] বলে। বরপক্ষের লোকেরাও যোড়ানাম বা খিচা গীত শুনিয়া কিছু মনে করেন না—বরং তাঁহারা খুসী হন। বিবাহ-আসরে আসিয়া আধুনিক সম্ভ্রান্ত [বা আধুনিক ভদ্র] ঘরের মহিলারা এই গীত গাহেন না। যাহা হউক, বিবাহ-উৎসবের কালে 'নামতি আইরা' কোন বাদ্যযন্ত্র বাজায় না। মধ্য-আসাম ও উপর আসামে কন্যার [পূর্ব্ব কথিত] দুয়ার ধরি উলিয়াই দিয়া কালে 'নামতি আই'রা বাটীর মহিলা-দিগের সহিত নাম গায়িতে গায়িতে উলুধ্বনি করেন। বর-কন্যা চলিয়া গেলে নিমন্ত্রিত "নামতি আইরা" জল-যোগান্তে 'পান-তামোল' খাইয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায়।

নামতী আই ও আয়তী

যোড়ানাম ও খিচা গীত

নিমন্ত্রিত নামতি আই-দিগের গৃহে গমন

পুরাকালে কামরূপে বিবাহ উপলক্ষে ঢোল, খোল, 'কালী' এবং 'বড়তাল' [ইহা করতাল অপেক্ষা বড়] বাজান হইত। কন্যাগৃহে বরের

যাত্রাকালে এবং বর অথবা কন্যার মাতার পাণিতোলা উপলক্ষে বাদ্যকরেরা সহগমন করিত। কামরূপে ঢোলের আকৃতি বড় [প্রায় ঢাকের মত], মধ্য-আসামে মাঝারি এবং উপর-আসামে ছোট। কামরূপের ঢুলিয়ারা [যাহারা ঢোল বাজায়] বিখ্যাত। তাহারা কেবল বাজনা লইয়া থাকে না। আজকাল অনেকে সার্কাসে অনেকগুলি কৌতুকপ্রদ খেলা দেখায় এবং তৎসঙ্গে ভাঁড়ের কথা (mimicry) কহিয়া শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল উদ্দীপিত করে। ঢুলিয়াদিগের মধ্য হইতে তিন চারিজন মিলিয়া ভাঁড়ের কাজ করিয়া থাকে। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে সুয়াগ তোলা কালে ঢুলিয়া ব্যতীত অন্য কোন বাদ্যকর, বর কিংবা কন্যার মাতার সহিত জলাশয়ে যায় না। কালী বাঙ্গালা দেশের সানাইয়ের অনুরূপ। ইহার সহিত বাঁশীর মত একটী বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত আর কোন যন্ত্র থাকে না। এখনও উপর-আসামে কালীর বহুল প্রচলন আছে। মধ্য-আসামেও আছে, কিন্তু নিম্ন-আসামের সকল স্থানে ইহার প্রচলন নাই। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে শ্রাদ্ধ এবং অধিবাসের সময় ব্যতীত শাঁখ বাজান হয় না। অন্য সময় কেবল 'উরুলি' [উলুধ্বনি] দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে আসাম অঞ্চলে ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও, বাঙ্গালা দেশের ঢাকের প্রচলন হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে সঙ্গতিপন্ন [well-to-do] অসমীয়া হিন্দুর বাটীতে আজকাল ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজান হয়।

কামরূপ জনপদে বিয়ের বাজনা

কামরূপ জেলায় বিবাহের উৎসব উপলক্ষে আজিও ঢুলিয়ারা ঢোল, খুলীয়ারা খোল, 'কালীয়া'রা 'কালী' [সানাই বিশেষ] বাজাইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে ঢুলিয়ারা 'রামকর্ত্তাল' নামক বংশ-নির্ম্মিত যন্ত্র বাজাইত। এখনও হাজো অঞ্চলে ইহার বহুল প্রচলন আছে। প্রাচীন কামরূপ জনপদে

বিবাহের উৎসব উপলক্ষে বাজনা

বর্ত্তমানে [১৩৩৮ বঙ্গাব্দ] নানা রকমের গীত-বাদ্য ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে। কামরূপ জেলায় দেখা যায়—ঐ বাদ্যকরেরা, বর-কন্যা উভয় পক্ষের সধবা স্ত্রীলোকদিগের পানীতোলা [স্নানার্থ জল আহরণ]র সময় একবার ; অধিবাসের সময় [বিবাহের দিন যদি কাহারও অধিবাস হয়] একবার ; নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসিবার সময় একবার কিংবা দুইবার ; পিণ্ডক্ষেপণ করিবার কালে একবার ; বর-কন্যাকে কামাইবার সময় একবার ; উহাদিগকে স্নান করাইবার কালে একবার ; সোহাগ তোলার সময় একবার—সাধারণতঃ এই কয়বার বাদ্যধ্বনি করে। বরপক্ষের বাদ্যকরেরা বরযাত্রীসহ বাদ্য করিতে করিতে কন্যার বাড়ী পর্য্যন্ত যায়। বর, কন্যার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের বাদ্যকরেরা একসঙ্গে বাদ্য করে। অতঃপর কন্যাকে বিবাহ-মণ্ডপে আনার সময় [সম্প্রদান, 'টীকধরা' আদি বিবাহ-কার্য্য কালে] এক একবার বাদ্য করিয়া থাকে। এই সকল বাদ্যকালে 'আয়তী'রা সময়োপযোগী গীত গাহিয়া থাকে। বাদ্যকরেরা ঢোল ও খোলের সহিত তালমান বজায় রাখিয়া মধ্যম ভোটতাল বাজায়। আসামের ভোটতাল বঙ্গদেশের 'করতাল' বা কর্ত্তালের অনুরূপ।

ঢোল, খোল এবং মৃদঙ্গের বোল

আসাম অঞ্চলে আমরা দেখিতে পাই যে, 'নাম'-কীর্ত্তন উপলক্ষে অনেক লোক একত্র মিলিত হইয়া বৃহদাকার মধ্যম ভোটতাল [মধ্যমাকারের কর্ত্তাল] লইয়া বাদ্য করিয়া থাকে। শিবসাগর জেলায় মাজুলি অঞ্চলে বিবাহ উৎসবকালে বাদ্যকরেরা ঢোল, খোল, মৃদঙ্গ ও তালের বাদ্য করে। কোন্ সময়ে কোন্ বাজনার বোলের আবশ্যক হয়, তদ্বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। তত্রত্য ঢুলিয়াদিগের ঢোলের একটী বোল যথা :— দাওঁ দাস্,, দাওঁ খিত তাও তাধিন, খিতা গিঘিন দাও খিত। খোলের বোল—ধেনিতৌ, ধেনিতৌ তাখেতিতা খেতিতৌ। মৃদঙ্গের

বোল—ধেন্দাক ধেন্দাক ধিনা ধিনা ধিনিন্দো খেত তাখোর খেতা ঘিনা ঘিনিন্দো খেত। কামরূপীয়া ঢুলিয়ার গীতের একটী বোল, যথা ঃ—

টুপুনীয়ে অহাঁয় আহ্ টুপুনী, সহাঁয় যা টুপুনী,
টুপুনী হল মহাকাল।
আমারে ঘরকে নাহিবি টুপুনী,
টুপুনী অতি যমকাল॥

পদ—টুপুনীয়ে ধান পাচি বানিলোঁ, চাউল পাচি কাঢ়িলোঁ,
আইথের ঘরক যাওঁ বুলি।
শাহু সতিনী, যাবাকে নিদিলা,
পুতেকর মূর খাঁও বুলি॥
টুপুনীয়ে দেওরটো মরি যাক, ননানটে ওলাই যাক,
বুঢ়া শহুরক খাক্ বাঘে।
তুই চরণর ধূলি লৈ, স্বামীটো মরি যাক,
আমি খাঁও খেমেনার ভাত॥

কামরূপ অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহের উৎসবকালে মহিলারা যে সকল গীত গাহিয়া থাকেন, ক্রমানুসারে নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা হইলঃ—

বিবাহের তুই দিন পূর্ব্বে কিংবা পূর্ব্বদিন গাহিবার গীত	১। তেলর ভারর গীত।
বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে···	২। পানীতুলা গীত=বর-কন্যার স্নানার্থ জল আহারণকালের গীত।
ঐ দিন ৭টার পর···········	৩। আদি বাহর গীত=অধিবাস-কার্য্য কালীন গীত
ঐ দিন দ্বিপ্রহরে···········	৪। শ্রাদ্ধর গীত=নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ-কালীন গীত

বিবাহের দিন দ্বিপ্রহরে······	৪। শ্রাদ্ধর গীত—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকালীন গীত।
ঐ দিন বৈকালে······	৫। নখ কামোয়া গীত—নাপিত যখন বর-কন্যার নখ কাটে, তখনকার গীত।
ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে···	৬। ধুওয়া গীত—বর-কন্যাকে স্নান করান কালীন গীত।
ঐ দিন সন্ধ্যার সময়······	৭। সুয়াগ তুলা গীত—বর-কন্যার স্নানের পর 'আয়তী'দিগের জলাশয়ে গমন-কালীন গীত।
ঐ দিন সন্ধ্যার পর······	৮। বর বরা গীত—বর, কন্যাকর্ত্তার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বরণ করা কালীন গীত।
ঐ ···	৯। বর বহা গীত—বরকে বেদির সমীপে আনিয়া উপবেশন করান কালীন গীত।
ঐ ···	১০। গঁহায় পূজার গীত—কন্যাকর্ত্তার ও বরের একত্র উপবেশনপূর্ব্বক পঞ্চদেবতার পূজাকালীন গীত।
ঐ ···	১১। উচর্গার গীত—কন্যাদাতার বস্ত্র, বাসন-বর্ত্তন আদি উৎসর্গ কালীন গীত।
ঐ ···	১২। হোমপুরার গীত—হোমকার্য্য আরম্ভ কালীন গীত।
ঐ ···	১৩। কয়না উলিয়োয়া গীত—কন্যাকে যখন বিবাহ-মণ্ডপে আনা হয়,তৎকালীন গীত
ঐ ···	১৪। আথে তুলা গীত—আথে শব্দের অর্থ খৈ। লাজহোম কার্য্যারম্ভ কালীন গীত।
ঐ ···	১৫। নগুন গাঠি বান্ধা গীত—তাঁতজাত নব বস্ত্র দ্বারা বর-কন্যার 'গ্রন্থি' [গাঁইট ছড়া] বন্ধনকালীন গীত।
ঐ ···	১৬। পান চটকা গীত—বর-কন্যার সপ্তপদী গমনকালীন গীত।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর	১৭। টীক ধরা গীত—বিবাহ-কার্য্য সমাপনান্তে বর-কন্যায় গোত্র ছেদনার্থ 'টীক' অর্থাৎ 'কেশ' একত্র করিয়া 'ধরা' [ধারণ] কালীন গীত।
ঐ দিন·	১৮। 'ধর্ম্মদোল বান্ধা গীত'—বর-কন্যার ইহ-কালের মত সংসার ধর্ম্ম আচারণার্থ আকাশমণ্ডলের দেবতা,পাতালের নাগ ও পৃথিবীর লোকদিগকে সাক্ষীকরণ-কালীন গীত।
ঐ রাত্রি—বিবাহ-মণ্ডপে গাহিবার গীত।	১৯। বেহু ঘুরা গীত—বেহু শব্দের অর্থ ব্যূহ—ইহা বিবাহ-মণ্ডপের শেষ ক্রিয়া। 'বারি' [দণ্ড]র দ্বারা ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া বর-কন্যার তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত করা কালীন গীত।
ঐ রাত্রি	২০। আগ দিয়া গীত—আগ' অর্থে সম্মুখ, 'দিয়া' অর্থে দেওয়া। বর-কন্যার সম্মুখে বসিয়া কন্যার মাতার অথবা খুড়ীমার উভয়ের উদ্দেশ্যে মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালীন গীত।
বিবাহের পরদিবস প্রাতে	২১। কন্যা যাওয়া গীত—বরগৃহে কন্যার যাত্রাকালীন গীত।
ঐ দিন—'বর-কন্যা'র বরগৃহে পৌছানকালীন গীত।	২২ বর-কন্যা বরা গীত—বর-কন্যাকে বরের মাতার বরণকালীন গীত।
ঐ দিন ...	২৩। আগদিয়া গীত—বর-কন্যার মস্তকে বরের মাতার আতপ তণ্ডুল স্থাপন-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ কালীন গীত।

আমরা কামরূপীয় 'বিয়ার গীত'এর ২৩টী ক্রম বলিলাম। এগুলি ব্যতীত আর যে কয়েকটী ভিন্ন রকমের গীত আছে, সেগুলির তেমন বিশেষত্ব নাই।

টা-চুধরা ও 'বেহুবারি' ঘুরা ক্রিয়ার পর আগদিয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়।

কামরূপীয় প্রাচীন বিয়ার গীত

চতুর্থ অধ্যায়

১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "আসাম প্রসঙ্গ" প্রথম খণ্ডের কয়েক জন পাঠককে আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, এতগুলি বিবাহ-গীতের উল্লেখ করিয়া কেবল পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে মাত্র। এই পুস্তকখানির [অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতির] পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে সমাজতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত পঞ্চানন মিত্র, পি, আর, এস্; ও শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ; লিট (লণ্ডন) পি, আর, এস্; আরও কয়েকজন লেখককে বলিয়া ছিলেন—"প্রমাণ ব্যতীত কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের মূল্য নাই। প্রমাণ হইতেই বিশ্বাস জন্মে। Ethnology-হিসাবে বিবাহের এক একটী বিষয়-প্রসঙ্গে এক একটী উপযোগী গীতের উল্লেখ থাকা বিশেষ আবশ্যক।" এই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এক একটী কামরূপীয় প্রাচীন 'বিয়ার গীত' ও 'উজনী' অঞ্চলে অধুনা প্রচলিত কয়েকটী 'বিয়া-নাম' প্রকাশ করিলাম।

বিবাহ-প্রসঙ্গে সময়োপযোগী গীতগুলি উল্লেখযোগ্য

এখানে উল্লেখযোগ্য—প্রাচীন কামরূপীয় ভাষা ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে মধ্য-আসাম ও উপর-আসামের শিবসাগর অঞ্চলের লিখিত ও কথিত অসমীয়া ভাষার মধ্যে তেমন বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু এই দুই অঞ্চলের

ভাষা-পরিচয়

এবং মঙ্গলদৈ মহকুমা হইতে বড়পেটা মহকুমা পর্য্যন্ত অঞ্চলের লিখিত ও কথিত আসামীয়া ভাষার মধ্যে অনেক স্থলে পার্থক্য আছে।

১। 'নামনী' অঞ্চলে কন্যার বাটীতে তেলর ভার আসিয়া উপস্থিত হইলে তদুপলক্ষে ও কন্যাকে অলঙ্কার 'পিন্ধোয়া' [পরিধান করান] কালীন 'আয়তী'দিগের গীতের নমুনা :—

পানত পত্র লেখি দিলাহে আইদেউ
পানত পত্র লেখি দিলা।
সেই পত্রখানি পাই রামচন্দ্রে
অলঙ্কার পঠিয়াই দিলা॥

* * * *

আহিকি পাইলরে রুকিণীর পদুলী
তাতে তেলর ভার থবা।
রুকিণী শুধিব কারে তেলর ভার
রামে দিয়া বুলি কবা॥

* * * *

আগরখন ভারতে কি বস্ত্র আনিছা
মুকুলি চ'রাতে থৌ।
আয়ারে ঘরলৈ কি কার্য্যে আহিছা
পিতাকর আগতে কৌ॥

শব্দার্থ—আগরখন ভারতে—প্রথম ভারখানিতে। মুকুলি চ'রাতে—বাহিরের বৈঠকখানায়। থৌ—রাখ। আয়া—অতি আদরের বা স্নেহের ডাক, যদ্দারা কামরূপে কন্যাকে সম্বোধন করা হয়। আহি কি পাইল—আসিয়া পৌঁছিল। পদুলি—ঘরের সম্মুখের রাস্তা। রুক্মিণী—ভিষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী দেবী।

মায়েথেৰ অলঙ্কাৰ থৌ হে ৰুকিণী
পিতেথেৰ অলঙ্কাৰ থৌ।
দ্বাৰকাৰ কৃষ্ণই হে অলঙ্কাৰ পঠাইছে
হাত যোড় কৰি লৌ॥ *

* * * *

আজি চানা মাইৰ তেলৰ ভাৰ (এ কালী)
চানা মাইৰ বিয়া।
চানা মাইৰ পিতাক বহি আছে
আৰম্ভ কৰিয়া॥

২। বিবাহোৎসবের প্রথম দিন কন্যার বাটীর মহিলারা অতি প্রত্যূষে যে গীত গাহিতে গাহিতে নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া আনিতে যান, তাহার নাম পানীতোলা গীত :—

দৈবকী ডাকই ৰজনী পুৱাৱৈ
উঠৰে ৰোহিণী বাই এ।
ধুৱাইবাক জল লাগে সাগৰৰ।
আহা পানী তুলো যাই এ॥
দিহা—হাতে চাটি ধৰি ও হৰি হৰি।

অর্থাৎ—"দৈবকী ডাকই...যাইএ"—শ্রীকৃষ্ণের মাতা দৈবকী তাঁহার সতীন রোহিণীকে 'বাই' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন, ওহে রোহিণী 'বাই' (দিদি) তুমি ঘুম থেকে উঠ না। রাত যে প্রভাত হ'ল। [শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাবার জন্য] সাগর থেকে জল আনতে

---

* শব্দার্থ—মায়েথের—মায়ের। পিতেথের—পিতার। চানা মাই—ছোট মা।

শব্দার্থ—রজনী—রজনী। পুৱায়ৈ—প্রভাত হইল। বাই—কামরূপে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, বড় সতীন ও বড় জা (ভাসুরের স্ত্রী)কে 'বাই' বলিয়া সম্বোধন করে। দিহা—গানের দোহাবলী। চাটি—প্রদীপ।

অলালা দৈবকী ও হৰি হৰি,
ভূমীকে কামনা কৰি এ ॥
(দৈবকী ডাকই, ইত্যাদি)
আইদেউক ধুয়াবা ও হৰি হৰি
লাগে পানী তুল্‌বা।
অহা সবে লৰালৰি এ।

ঐ গীতটি গাহিবার অন্ত একটী সুর যথা :—

দৈবকী ডাকই রঞ্জনী পুয়ায়ে এ হায়ে কৃষ্ণ এ।
উঠয়ে রোহিণী বাই ও রাম দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ এ।

হ'বে। এস আমরা [সেখানে] গিয়া জল আনি। [এই 'দিহা'তে দেখান হইয়াছে, কি প্রকারে তিনি জল আনিতেছেন] দৈবকী, পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার নিকট মঙ্গল কামনা করিয়া হাতে প্রদীপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। "আইদেউক ধুয়াবা···লরালরি এ"—[দৈবকীকে এইরূপ ভাবে যাইতে দেখিয়া যেন অপর অপর আত্মীয়া পরস্পরকে বলিতেছেন] ওহে এস আমরা তাড়াতাড়ি যাই [কেননা] 'আইদেউ' [রুক্মিণী]কে স্নান করাবার জন্য জল তুল্‌তে হ'বে।

৩। নিম্নে একটি নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ*কালীন গীত প্রদত্ত হইল :—

(১) গা ধুই বিষ্ণুক স্মৰি—এ—হেমবন্ত রায়।
সাত পুৰিয়া শাৰাধক—এ—কৰিবাকে যাই ॥

অলালা—অগ্রসর হইল, ঘরের বাহিরে আসিল। লরালরি—শীঘ্র শীঘ্র। আইদেউক—কন্যাকে, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বরের বাটীতে আত্মীয়া 'বাপাদেউক' শব্দ প্রয়োগ করেন। তুল্‌বা (তুলিবা) লাগে—উঠাইতে হইবে।

শব্দার্থ—গা ধুই—স্নান করিয়া। সাতপুরিয়া—সপ্ত পুরুষ সম্বন্ধীয় (এখানে নান্দীমুখ)। পুরিয়া শব্দে পিতৃ পুরুষ বুঝায়। শারাধ—শ্রাদ্ধ। করিবাকে যাই—করিতে চলিল।

* নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ—আসামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও বিশুদ্ধ কায়স্থ জাতীয় লোক-[illegible] নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতীত মাত্র কয়েক ঘর কলিতা ইহার অনুষ্ঠান করেন।

সাত পুৰিয়া শাবাধৰ—এ—পাতে চাৰিথান।
সাত সাত পুৰুষক—এ—দেই জল দান॥
সাত পুৰিয়া শাবাধৰ—এ—চাৰি খানি খালি।
সাত সাত পুৰুষক—এ—দেই জল ঢালি॥

অর্থাৎ—'হেমবন্ত রায়' (রাজা হিমালয়) স্নান করিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ-পূর্ব্বক (নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ) করিতে চলিলেন। [কারণ— দিনের বেলা পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিয়া রাত্রে তিনি পার্ব্বতী-মাতাকে শিবের সহিত বিবাহ দিবেন] তিনি গিয়া চারিটী শ্রাদ্ধের স্থান নির্ম্মানপূর্ব্বক চারিটী 'খালি' (কলার খোলা) স্থাপন করিলেন এবং [উর্দ্ধতম] সপ্ত পুরুষের নামে জল দান করিতে আরম্ভ করিলেন॥

৪। আমরা ৩৯ ও ৮১ পৃষ্ঠায় 'সুয়াগ তুলা'র বিষয় বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছি। এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য বর অথবা কন্যার মাতাসহ আয়তীদিগের জলাশয়ে গমনকালীন গীতের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

সুয়াগ তুলার গীত

(১) বহি থাকা হৰি মনে ৰঙ্গ কৰি
আঁহু যাই সুয়াগ তুলি।—ইত্যাদি

অর্থাৎ—হরি [কৃষ্ণ] তুমি মনের আনন্দে বসিয়া থাক। আমরা সুয়াগ তুলিয়া ফিরিয়া আসি।

পাতে—স্থাপন করিল। থান—স্থান। সাত সাত পুরুষক—শ্রাদ্ধকর্ত্তা হইতে উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের নামে। দেই জল দান—জলদান করিতেছে। খালি—কলার খোলা; শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইহাতে আতপ তণ্ডুল, ঘৃত, মধু ইত্যাদি দেওয়া হয়। চারিখানি খোলাতে বৃহস্পতি দেবতার নামে চারিখানি বস্ত্র দেওয়া হইয়া থাকে। এ—[illegible] গানের সুর ঠিক রাখার জন্য আয়তীরা এই (এ) অক্ষরটীর দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া [illegible]

(২) পানী আছে ডবল ভৰি দেউতা আছে ৰই। (ৰাম জানকী)
আগত নাচে গায়ন বায়ন ধীৰে চলি যাই ॥ ঐ
বাটে বাটে পৰি যাই কেতকী বকুল। ঐ
হাঠিবাকে নৰে ৰাধেৰ পাৰতে লেম্পুৰ ॥ ঐ

অর্থাৎ—মাঠ ভরিয়া জল রয়েছে এবং দেবতারা অপেক্ষা করিয়া আছেন। অগ্রে অগ্রে গায়ক ও বাদ্যকরেরা নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে, [বর কিংবা কন্যার মাতা পিছনে পিছনে] ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন। [যাইবার] পথের উপর কেঁয়া ফুল ও বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। পায়ে 'লেম্পুর' (পায়ের গহনা) থাকার দরুন 'রাধা' (বর কিংবা কন্যার মাতা) চলিতে পারিতেছেন না।

বর কিংবা কন্যার মাতা যখন জলে ডুব দেন, তখন তাঁহার সঙ্গিনীরা এইরূপ গান করেন:—

(৩) এক পাৰে পৰিছে মকুয়াৰে মালা,
এক পাৰে পৰিছে তাৰা।
ঘুৰি ডুব মাৰা বৰৰে জননী,
আনিবা পাতালৰ বালা।

অর্থাৎ—জলাশয়ের এক পারে কুমুদ পুষ্পের মালা পড়ে রয়েছে এবং অন্য পারে তারকার প্রতিবিম্ব জলেতে শোভা করিতেছে। ওহে বরের মা! তুমি আর একবার ডুব দিয়া পাতাল থেকে বালুকা নিয়ে এস।

(৪) দৈবকী নামিলা জলে।
গলে গলপাতা জলে ॥

শব্দার্থ—ডাগ—মাঠের মধ্যস্থ চৌবাচ্চার মত স্থান। আগত—অগ্রে।

শব্দার্থ—মকুয়া—কুমুদ ফুল। একপারে—[জলাশয়ের] একপারে। পরিছে—(জলাশয়ে) পতিত হইয়াছে। ঘুরি—পুনরায়। ডুব মারা—ডুব দেওয়া। বালা—

থৰকে আহা ৰাজা ৰাণী।
ঘৈৰালে লৈ যাব টানি॥

অর্থাৎ—দৈবকী জলে নামিয়াছেন। তাঁহার গলায় 'গলপাতা' (কণ্ঠাভরণ বিশেষ) দৃপ্ত হইতেছে। ওহে রাজরাণী! শীঘ্র শীঘ্র জল হইতে উঠিয়া আসুন—না হ'লে কুমিরে টেনে নেবে।

সুয়াগ তুলিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় আয়তীরা অনেকগুলি স্ফূর্ত্তি-দায়ক গান করেন। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কায় আমরা সে গুলির উল্লেখ করিলাম না।

৫। বর, কন্যার বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর তাহাকে বরণ করিবার কালে আয়তীরা মঙ্গলময় শিবের বিবাহ-ভাব কল্পনা করিয়া তাঁহাকে উপহাসপূর্ব্বক এই ধরণের গীত গাহেন:—

বর বরা গীত

ক'ৰ পৰা আহিলা জটীয়া ভাঙ্গুৰা
সৰপে বান্ধোৰা হিয়া।
তোমাৰ রূপ দেখি মেনকায় ডৰাৱৈ
নেদে পাৰবতীক বিয়া॥

[এই গীতটির সঙ্গে সঙ্গে আয়তীরা কবি রাম সরস্বতী-রচিত কালিকাপুরাণের পাঁচালী-পদ গায়]

অর্থাৎ—ওহে 'জটীয়া' (জটাধারী) গাঁজাখোর। তুমি সর্পগণের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া [এবং ব্যাঘ্র চর্ম্মাদির দ্বারা বিভূষিত হইয়া] কোথা হইতে আসিলে? তোমার [এই বীভৎস] রূপ দেখিয়া আমাদের কন্যার মাতা মেনকা দেবী বড়ই ভয় পাইয়াছেন—[তুমি চলিয়া যাও] পার্ব্বতীর সহিত তিনি তোমাকে বিবাহ দিবেন না।

শব্দার্থ—ক'র পরা—কোথা হইতে। ভাঙ্গুরা—গাঁজাখোর। ডৰাৱৈ—ভয় পাইতেছে। সরপে—সর্পের দ্বারা। সরপে বান্ধোরা হিয়া—সর্পের দ্বারা অলঙ্কৃত শরীর।

৬। কন্যাকে ঘর হইতে বিবাহ-মণ্ডপে আনার সময় আয়তীদিগের গীতের নমুনা :—

(১) সাগৰ-নন্দিনী আইয়ে।
স্বামী বৰিবাকে যাইয়ে॥—ইত্যাদি

অর্থাৎ—সাগর-দুহিতা লক্ষ্মী মাতা স্বামী-বরণ করিতে যাইতেছেন। [এই গীতের দ্বারা কামরূপীয়া কন্যাদিগের স্বামী-বরণ করিতে যাইবার পদ্ধতির আভাষ দেওয়া হইল]

[উক্ত গীতের পর শঙ্করদেব বিরচিত লক্ষ্মী স্বয়ম্বরের পাঁচালী-পদ গীত হয়]

কোন কোন আয়তী উপরিউক্ত গীতের পরিবর্ত্তে শঙ্করদেব বিরচিত রুক্মিণী হরণের বিবাহ-গীত গায়, যথা :—

(২) "রুক্মিণী আলাল হৰি এ চৌদিশি পোহৰ কৰিয়ে"—ইত্যাদি

অর্থাৎ—রুক্মিণী দেবী চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া [বিবাহ-মণ্ডপে] আসিলেন।

৭। কামরূপ অঞ্চলে কলিতা, নাপিত কেওট, কোচ আদি জাতির কুমারীরাও স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য কখন কখন 'খিচাগীত' গাইয়া থাকে। এই গীত দ্বারা পুরোহিত ঠাকুর, বরের ভ্রাতা, বরযাত্রী প্রভৃতি ব্যক্তিকে ব্যঙ্গপূর্ব্বক আক্রমণ করা হইলেও তাঁহারা একটু আনন্দ অনুভব করেন। খিচাগীতগুলি ছোট ছোট বলিয়া অসম্পূর্ণ নহে।

খিচা গীত

(১) আখান্ তামূল দিলি হঁ বুলি যাচিলি
মৰিবা খুজিলো লাজে।
আমি আয়তীৰ ভৰম ভাঙ্গিলি
এহি সমাজৰ মাজে॥

শব্দার্থ—আখান—একটি। তামুল—তাম্বুল (সুপারী)। হঁ—ওহে নাও না। [illegible]—দিতে চাহিলে। মৰিবা—মরিতে। খুজিলো—চাহিলাম। ভৰম—গৌরব। [illegible] করিলে।

অর্থাৎ—[বরপক্ষের যে ব্যক্তি কন্যাপক্ষের আয়তীদিগকে পান তাম্বুল প্রদান করে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতেছে] ওহে বাপু! তুমি আমাদিগকে একটী মাত্র পান দিলে [তাহাও আবার] "হুঁ—বুলি ষ.চিলি" (অর্থাৎ—অমান্য করিয়া 'নাও' বলিয়া দিলে)। ইহাতে এরূপ লজ্জা পাইলাম যে, মরিতে ইচ্ছা হইল। এত বড় সমাজের ভিতর [তুমি ঐরূপ ব্যবহার করিয়া] 'আমি আয়তীর' (অর্থাৎ—আমাদের) * গৌরব নষ্ট করিলে।

আয়তীরা বরের ভাইকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছে:—

(২) শুন বাপু শুন তোমার ভাইয়ের গুণ
ডনাত আনিছে তামুল পান
খদাত আনিছে চুন।

৮। লাজ হোমের সময় কন্যার ছোট ভাই যখন বর-কন্যার হস্তে খৈ দেয়, তখন পরস্পর (বর-কন্যা) পরস্পরের হস্ত একত্র করেন। নিম্নে তৎকালীন গীতের নমুনা দেওয়া হইল:—

আখে তুলা গীত

আখে তুলি দিয়া আখে তুলি দিয়া
তই বৰ সাদৰৰ ভাই।
আজিৰে পৰাহে আখে তুলি দিয়া
সম্বন্ধ চিঙ্গিয়া যাই॥

[এই গীতের কবিত্ব-ভাব ভুক্তভোগী (কন্যার পিতা অথবা সম্প্রদানকর্ত্তা) ব্যতীত অন্যের মর্ম্মস্পর্শী নহে]

শব্দার্থ—ডনা—কলাগাছের লম্বা (বড়) খোলা; কামরূপ অঞ্চলে বিবাহাদি কার্য্যে সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিকে খাওয়াইতে এবং পান দিতে 'ডনা' ব্যবহৃত হয়। খদা—বড় আকারের ঝুড়ি।

শব্দার্থ—আখে—খৈ বা লাজ। তুলি দিয়া—তুলিয়া দাও। সাদরর—স্নেহের। সম্বন্ধ চিঙ্গিয়া যাই—গোত্র বিচ্ছেদ হয়।

* বর পক্ষীয় লোকেরা 'সয়াই' করিয়া আয়তীদিগকে 'তাম্বুল' ও পান দিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ— তুমি আমার বড় স্নেহের ভাই ছিলে। আজ যত পার আমাদের (বর-কন্যার) হাতে তুমি খই তুলিয়া দাও। আজ হইতে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ উচ্ছেদ হইল, অর্থাৎ—তোমাদের সহিত গোত্রচ্ছেদ করিয়া আমি অন্য গোত্রে যাইতেছি।

৯। বরকে বিবাহ-মণ্ডপ হইতে বেদির সম্মুখে আনিয়া উপবেশন করাইবার কালীন আয়তীদিগের গীতের নমুনা :—

বৰ বহা গীত

বৰি আনি পাৰি দিলা বৰুণৰে পিড়া।
ভাল গাছৰ ভাল পিড়া বহিছে বড়ুৱা॥
কুহ পাৰি আচমন্ কৰে জীৱন যদুৰায়।
আকে ঠাৰি বহি আছে শহুৰ জঁৱাই॥

১০। টীকধৰা (কেশবন্ধন) উপলক্ষে কন্যাদাতা বরের মস্তকে একগাছি মালা পরাইয়া দেন। এই মালাটীকে 'টীকর মালা' বলে। 'টীক ধরা'কালে আয়তীদিগের গীতের নমুনা প্রদত্ত হইল :—

(১) ৰামচন্দ্ৰ ৰাজা—এ— জনক-নন্দিনী শান্তি
পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰকান্তি।
হৰৰ পাৰ্ব্বতী যেন ৰামৰ জানকী তেন
ৰামচন্দ্ৰ ৰাজা—এ—॥

[এই গীতের পর আয়তীরা কবি মাধব কন্দলী-রচিত রামায়ণের সীতা স্বয়ম্বরের পাঁচলী-পদ গাহেন]

শব্দার্থ—পাৰি দিলা—পেতে দেওয়া হ'ল। বৰুণৰে—বরুণ নামক গাছের। বহিছে—বসিয়াছে। বড়ুৱা—বড় লোকের উপাধি বিশেষ। কুহ পাৰি—কুশ বিস্তার করিয়া। আচমন—মুখে জল দেওয়া কার্য্য বিশেষ। জীৱন যদুৰায়—জীবন তুল্য যদুরায়। আকে ঠাৰি—একই প্রকারে। আকে ঠাৰি...শহুৰ জোঁৱাই—শশুর জামাই [একই] একই উদ্দেশ্যে পঞ্চ দেবতার পূজার জন্য অপেক্ষা করিয়া] বসিয়া আছেন।

অর্থাৎ—রাজা রামচন্দ্রের সহিত পূর্ণিমার চন্দ্রসদৃশ কান্তিযুক্ত সীতা দেখীর কেমন শোভা! হরের সহিত পার্ব্বতীর শোভা যেরূপ—সীতা রামের যুগল শোভাও তদ্রূপ।

(২) এ সদাশিব এ তোমার দেখো শুক্লবর্ণ কাঁয়া
ত্রিশূল ডম্বরু হাতে টীকর মালা ললা মাথে
সঙ্গে শোভা করে মহামায়া।

[অতঃপর আয়তীরা কালিকা পুরাণের পাঁচালী-পদ গাহেন]

অর্থাৎ—ওহে সদাশিব! আমরা দেখিতেছি, তোমার কায়া শুক্লবর্ণ; তোমার হস্তে ত্রিশূল ও ডমরু [ডুগ্‌ডুগি]; মস্তকে 'টীকর মালা' এবং তোমার সঙ্গে মহামায়া শোভা করিতেছেন।

১১। বিবাহ-মণ্ডপে সপ্তপদীগমন আদি বৈদিক ক্রিয়াগুলির পর কন্যাদাতা, পুরোহিত ঠাকুরের কথামত "আকাশর দেবতা, পাতালর নাগ আরু পৃথিবীর মনুষ্যসকল সাক্ষী হব। আজির পরা শ্রীমান......... অমুক আরু শ্রীমতী.........অমুকীর ধর্ম্মদেউল বান্ধা হল" এই বাক্যটী আবৃত্তি করত একাসনে উপবিষ্ট বর-কন্যার মস্তকোপরি আতপ তণ্ডুল ছড়াইয়া দেন। ইহার তাৎপর্য্য—এই দম্পতিযুগল ধর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত 'দেউল' [মন্দির] মধ্যে একত্রে দাঁড়াইয়া যেন সংসারধর্ম্ম পালন করে—কখনও যেন ধর্ম্ম ছাড়িয়া না থাকে। আয়তীদিগের তৎকালীন গীতের নমুনা :—

ধর্ম্মদেউল বান্ধা গীত

জনকর * ঘরে আজি করে কয়না দান।
ধর্ম্মর বান্ধিছে দেউল পর্ব্বত সমান॥
বিয়াত বহি আইদেউ মাথে দিছে হাত।
আকাশর দেবগণে করে আশীর্ব্বাদ॥

* কেহ কেহ "জনক" এবং কেহ বা 'ভীষ্মক" বলিয়া গায়। [অষ্টাদশ] জনক, সীতা দেবীর পিতা, এবং [বিদর্ভরাজ ভীষ্ম]ক" রুক্মিণী দেবীর পিতা ছিলেন

ডালত পরি হনুমন্ত গুণিছে মনত।
সীতা হলি দিব লাগে অবশ্যে রামত॥

অর্থাৎ—অদ্য জনক রাজার ঘরে কন্যাদান হইতেছে। সেজন্য পর্ব্বতসদৃশ ধর্ম্মের 'দেউল' [মন্দির] নির্ম্মাণ হইয়াছে। 'আইদেউ' [মাতৃদেবী—এখানে সীতাদেবী] মাথায় হাত দিতেছেন এবং আকাশের দেবতাগণ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। গাছের ডালে বসিয়া বীর হনুমান মনে মনে গুণিতেছে যে, যখন সীতাদেবী [কন্যা] জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে রামচন্দ্রের [জামাতার] হস্তে অবশ্যই দিতে হইবে।

১২। বর-কন্যার বেহুবারি প্রদক্ষিণ, বিবাহ-মণ্ডপের শেষ ক্রিয়া। ৫১ পৃষ্ঠায় আমরা ইহার ছবি প্রদর্শন করিয়াছি। অগ্রে কন্যা এবং বর তৎপশ্চাতে থাকিয়া 'বেহুবারি' পাঁচ বার অথবা সাতবার প্রদক্ষিণ করিলে পর আয়তীরা যে গীত গায় তাহার নমুনা :—

বেহুবারি ঘুরোয়া গীত

বেহু বারির উপরে তামারে কলসী
ঢালে রঘুনাথে পানী—এ

শব্দার্থ—ডালত পরি—ডালে বসিয়া। হলি—হইয়াছেন [জন্মগ্রহণ করিয়াছেন]।

"ডালত......রামত" ইহার ভাবার্থ—যখন কন্যাসম্প্রদান হইয়াছে, তখন তাহাকে অবশ্য সৎপাত্র-হস্তে অর্পণ করিতেই হইবে; ইহাতে মনে কিছুমাত্র দুঃখ করা উচিত নহে। কন্যার বিবাহ দিবার সময় pangs of separation [বিচ্ছেদ বাধা] যে কিরূপ, তাহা সম্যক্ অনুভূত হয়। উহার উপশম হেতু এই গীতের মধ্যে সংসারত্যাগী হনুমানের ও তাঁহার প্রবোধ বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। "ক্ষুদ্র মাগিবাহা" নিবাসী শ্রীযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরি মহাশয় লেখককে বলিয়াছেন :—কামরূপে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ (গণক) ও প্রকৃত কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রচলিত গোত্রাচ্ছেদনের সময় উচ্চারিত গোত্রভিদ্ গোত্রভিদ্ বজ্র বাহো ইত্যাদি বেদমন্ত্রের যে তাৎপর্য্য—কামরূপের আয়তীদের স্বাভাবিক ভাব-তরঙ্গ-প্রসূত উপরিউক্ত গীতটীরও তাৎপর্য্য তদ্রূপ"।

শব্দার্থ—'দেউল' সংস্কৃত দেবকুল [মন্দির] এবং "বেহু" "বাহ শব্দের অপভ্রংশ।

ঘুরে রাজা ঘুরে প্রজা, ঘুরে অকারণ।
রামচন্দ্র রাজা ঘুরে ভার্য্যারে কারণ॥
চাউল চাই চালেঙ্গি ঘুরে হরি হরি।
চাউল চাই চালেঙ্গি ঘুরে॥
জগতের রাজা রামচন্দ্র দেউ।
ভার্য্যার পাছে পাছে ফুরে॥

অর্থাৎ—বুাহ-দণ্ডের উপরে তামার কলসী [শোভা করিতেছে]। রঘুনাথ জল ঢালিয়া দিতেছেন। রাজা-প্রজা [সকলেই] অনর্থক ঘুরিতেছেন। [কেবল] রাজা রামচন্দ্র ভার্য্যার কারণ ঘুরিতেছেন। চালুনি চাউল পাইলে যেমন ঘুরে, সেইরূপ পৃথিবীর রাজা রামচন্দ্র ভার্য্যা [সীতা]কে পাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছেন।

১৩। আগ দিয়া—বেহুবারি প্রদক্ষিণের পরেই বর-কন্যাকে একটী পাটীতে বসাইবার পর উভয়ের সম্মুখে 'ডুনি' [তণ্ডুল পাত্র], ঘট, 'সহস্র বাতি' প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। অতঃপর কন্যার মাতা [উপবাস-পূর্ব্বক] তৎপরে খুড়ীমা ও অন্যান্য সম্পর্কীয়া মহিলারা 'ডুনি' হইতে তণ্ডুল এবং আমপত্র দ্বারা 'টেকেলি' [ঘট] হইতে জল লইয়া উভয়ের মস্তকে সিঞ্চন করেন এবং 'সহস্র বাতি' [প্রদীপথালা] হইতে নির্গত শিখার তাপ দেন। কন্যার মাতা প্রথমে ঐ মাঙ্গলিক ক্রিয়াটীর তৎপরে অন্যান্য মহিলারা উহার অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানটীর নাম 'আগ দিয়া'। উক্ত 'সহস্র বাতি'তে প্রায় নয়টী প্রদীপ থাকে। নিম্ন-আসামে আগ দিয়া উপলক্ষে বর-কন্যার মস্তকে অল্প চাউল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। উজনী অঞ্চলে এই প্রথাটীকে "মূরত চাউল দিয়া" বলে। ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় আমরা "আগ চাউল দিয়া"র বিষয় বলিয়াছি।

বারি—দণ্ড। তামারে—তামার। চাই—পাইয়া। চালেঙ্গী—চালুনি। দেউ—দেবতা।

আগদিয়া গীত

(১) দেউত্তায় করে আমা ঘুমা কণিকা বরিষে।
লখী আই আগ দেই মনত হরিষে।
সরগত ফুটিয়াছে থপা থপি তরা।
লখী আই আগ দেই নাচে অপেশ্বরা।

অর্থাৎ—'দেউতা' [মেঘ] পাতলাভাবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে [এবং] কণিকা-বৃষ্টি হইতেছে। 'লক্ষী মাতা' [এখানে কন্যার মাতা] [তদ্রূপ] মনের আনন্দে 'আগ' দিতেছেন [অর্থাৎ—তিনি কণিকা-বৃষ্টির মত 'দুনী'র চাউল এবং ঘটের জল সিঞ্চন করিতেছেন]। [তখন] স্বর্গে অসংখ্য তারকা থলো থলো ফুলের মত [হইয়া] প্রস্ফুটিত হইয়াছে [উহারাও যেন ঐ আনন্দময় দৃশ্য দেখিতেছে]। কন্যার মাতার 'আগ দিয়া' [অনুষ্ঠান দেখিয়া] অপ্সরারা [আনন্দে] নৃত্য করিতেছে।

১৪। 'আগ দিয়া'র পরেই বর-কন্যার মধ্যে 'আঙ্গুঠি লুকোয়া' এবং দুইটী "পরমান সালোয়া" [পায়সপূর্ণ বাটীর চালাচালি]র পর উভয়ে পাশা খেলে। ইহা 'আগ দিয়া' অনুষ্ঠানের অঙ্গ বিশেষ। পাশা খেলার সময় আয়তীরা নিম্নোদ্ধৃত ধরণের গীত গাহেন।

পাশা খেলোয়া গীত

পাশা খেলাইলরে—এহে—রাম মহাবীর
চলৈ ধীরে ধীর
কার ঘরর কাচা সনা কুঁয়াল শরীর।
পাশা খেলাইলরে॥ ধ্রুং

শব্দার্থ—খেলাইলরে—খেলিতেছে। চলৈ—চালিল। খেলৈ—খেলায়।

রামে সীতাই পাশা খেলৈ লক্ষ্মণে আছে চাই।
আজি যদি পাশাত ঘাটে রামত কার্য্য নাই॥
এক ঢাল দুই ঢাল তিন ঢালত ঘাটি।
ইচিপ্ যদি ঘাটে রামে, কিরিতি দিম কাটি॥
কিরিতি তোমার নিয়া প্রভু, কিরিতি তোমার নিয়া।
মিরিগ্ মারিয়া আমাক ছাল আনি দিয়া॥
সেই মৃগ ছালে যদি বসিবাক পাওঁ।
সরগর যত ভোগ (মই) আতেসে ভোগাওঁ॥

অর্থাৎ—মহাবীর রামচন্দ্র ধীরে ধীরে পাশা খেলিতেছেন। লক্ষ্মণ ঠাকুর, রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর পাশাখেলা দেখিতেছেন। যদি আজ পাশা খেলায় রামচন্দ্রের হার হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আবশ্যক নাই। [রামচন্দ্র] এক ঢাল, দুই ঢাল, তিন ঢাল হারিলেন এবং এবার [চতুর্থ বার] যদি তিনি হারিয়া যান [তাহা হইলে] তাঁহার কীর্ত্তি লোপ করিয়া দেওয়া হইবে। [এবারও রামচন্দ্র হারিয়া গেলেন, তখন সীতা দেবী দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "কিরিতি তোমার নিয়া প্রভু, কিরিতি তোমার নিয়া" অর্থাৎ—প্রভু! আপনার কীর্ত্তি আপনি লউন (অর্থাৎ আপনাতে বজায় থাকুক)। একটি [সুবর্ণ] মৃগ মারিয়া আমাকে তাহার ছাল আনিয়া দিউন। আমি যদি সেই মৃগচর্ম্মে বসিতে পাই [তাহা হইলে] ভূতলে স্বর্গসুখ অনুভব করিব।

শব্দার্থ=গেলাইলরে—খেলিতেছে। চলৈ—চালিল। খেলৈ—খেলায়। আছে চাই—দেখিতেছে। ঘাটে—হারিয়া যায়। রামত কার্য্য নাই—রামকে নিষ্প্রয়োজন। ঢাল—চাল বা খেলার শেষ ক্রিয়া। ঘাটি—হার বা পরাজয়। ইচিপ (coloquel) এবার; কেহ কেহ ইহার পরিবর্ত্তে 'ইহার' শব্দ ব্যবহার করেন। কিরিতি—কীর্ত্তি। দিম—দিব। কাটি—কাটিয়া অর্থাৎ লোপ করিয়া। কিরিতি দিম কাটি—ইহা এখানে দাম্পত্য প্রণয়ের আস্থুরে বাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিয়া—লউন। ভোগ—সুখ-স্বচ্ছন্দ। আতেসে—এই স্থানে অর্থাৎ পৃথিবীতে। ভোগাওঁ—ভোগ করিব।

উজনী অঞ্চলের বিয়ানাম

পঞ্চম অধ্যায়

'উজনী' অঞ্চলে বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরিকৃত হইলে পর বরপক্ষের বাটী হইতে কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়া কন্যার ভ্রূযুগলের মধ্যে সিঁন্দুরের টিপ অথবা সীঁতায় সিন্দুর-রেখা দেন ও তৎপরে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করান। অসমীয়ারা প্রথম ক্রিয়াটিকে সেন্দূর পিন্ধোয়া ও দ্বিতীয়টিকে জোড়ন পিন্ধোয়া বলেন :—

১। সেন্দুর পিন্ধোয়া নাম

শেওঁতা ফালিলে মারে দুয়ো হাতে ধরি।
শিরত সেন্দুর দিলে আশীর্ব্বাদ করি।
নেমু টেঙা খূপি থাপি বজাররে লোণ।
আঠু কাঢ়ি সেন্দূর পিন্ধাই সেই জনী বা কোন ?

২। জোড়ন পিন্ধোয়া নাম

পানত পত্র লেখি দিলাহে আইতি
পানত পত্র লেখি দিলা।
সেই পত্রখানি পাই রামচন্দ্রই
অলঙ্কার পঠিয়াই দিলে॥
রামচন্দ্রর অলঙ্কার দেখোঁতে চমৎকার
কোন সোণারিয়ে গঢ়া।
সেই রাজ্যত আছে যে বঙ্গালী সোণারি
সেই সোণারিয়ে গঢ়া॥
মারার অলঙ্কার থোয়াহে আইতি
দেউতারার অলঙ্কার থোয়া।

বামে দি পঠাইছে বিচিত্র অলঙ্কাৰ
হাত জোড় কৰি লোৱা ॥

'জোড়ন পিন্ধোয়া'র পর কন্যার স্নানার্থ নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে মহিলাদিগের জল তুলিবার কালীন গীত :—

৩। পানীতোলা নাম

ৰাম ৰাম ধ্রুং

যমুনাৰ ঢৌ দেখি ৰাধাৰ কঁপে হিয়া।
ঘাটে নাৱে চপাই দিয়া অ নাৱৰীয়া ॥
ই ফালৰ চাকনৈয়া সি ফালৰ ঢৌ।
তামৰ কলসী ৰাধা ভৰিলেনে নৌ ॥
তামৰ কলসীত ৰাধাই ভৰিলেক পানী।
উজান ঘাটৰ পৰা এৰি দিলে নৌকাখানি
স্বৰগত জলি আছে থুপি থুপি তৰা।
ৰাধাই পানী তোলে নাচে অপেশ্বৰা ॥

মধ্য-আসাম ও উপর-আসাম অঞ্চলে বরের বাড়ীতে বরের এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যার স্নানার্থ মহিলারা নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে 'পানী' (জল) তুলিয়া আনিয়া ঘরের চালে সিঞ্চনান্তর গৃহপ্রবেশ করিয়া থাকেন। পানী সিঞ্চনকালে তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত ধরণের গীত গাহিয়া থাকেন :—

৪। চালত পানী দিয়া নাম

জয়।

চালত পানী দিবা ধাৰে নিছিগিবা
টেকেলি নকৰা সুদা।

—মাৱাৰ—মায়ের। দেউতাৰাৰ—বাপের।

অতি সাৱধান হবা নিয়মকৈ সোমাবা
মৰল চাই টেকেলি থবা ॥
দুৱাৰ মেল দুৱৰী অৰ্জ্জুন কুৱঁৰী
দুৱাৰত ঘুনুচা-জৰি।
শিলৰ পাতে দুৱাৰ মেলিদে ঘৰিণী
কলচী ভিতৰে কৰোঁ ॥

বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে 'দৈয়ন দিয়া' প্রথার অনুষ্ঠান হয়।

৫। দৈয়ন দিয়া নাম

ৰাম ৰাম ধ্রুং

সুৱৰ্ণৰ খাটতে আইদেউ শুই আছে
সি কথা মনত নাই।
লাখৰ-বাখৰ কৰি ইন্দ্ৰৰ পটেশ্বৰী
আইদেউক জগোৱা গৈ।
আজি আইদেউক দৈয়ন দিছে
সিংহ দুৱাৰতে ৰই ॥
দৈয়ন দিয়া দৈয়ন দিয়া
আপোনাৰে আই।
ভাল কৰি দৈয়ন দিয়া
হৃদয় জুৰাই যায় ॥

৬। স্নানের সময় আয়তিরা ঠাট্টা করিয়া যে গান করে, তাহাকে নোৱাওঁতে গোৱা জোৱা নাম বলে:—

থকুৱা-বেঙেনাৰ জোকা হৰি হৰি
থকুৱা-বেঙেনাৰ জোকা।

শব্দার্থ—ধার—জলধারা। নিছিঙৰা—ছেদ করিবে না। টেকেলি—ঘট। মরল—মণ্ডল বা চক্র। দুৱরী—দারোয়ান। মেলিদে—খুলিয়া দাও।
শব্দার্থ—লাখর-বাখর—হর্ষোৎফুল্ল ভাব। থকুয়া-বেঙেনা—ছোট বেগুন।

এই জনা আহিছে আইতিক নোৱাবলৈ,
নাকতে সেঙুৰৰ থোপা ॥
নাৱৰ তলি পেটে সেলাই, হৰি হৰি
নাৱৰ তলি-পেটে সেলাই।
এই জনা আহিছে আইতিক নোৱাবলৈ
নাওঁ যেন পেটতো ওলায় ॥

৭। পানী ধলাত নাম *

ঐ সখি ধ্রুং

আইদেউৰ পদুলিত হালি আছে নল।
কলহে কলহে ঢালে যমুনাৰে জল ॥
মেঘ বৰণ শ্যাম তনু দিগম্বৰ বেশ।
পিঠিত পৰিয়া আছে আউল জাউল কেশ ॥
স্নান কৰি আইদেৱে মাগে এক বৰ।
কোন মতে মোৰ স্বামী হব দামোদৰ ॥
স্নান কৰি আইদেৱে সুৰত দিছে হাত।
স্বৰ্গৰ পৰা দয়াময়ে দিছে আশীৰ্ব্বাদ ॥
স্নান কৰি আইদেৱে কপে থৰে থৰি।
পেলাই দিয়া পাটৰ বস্ত্ৰ পিন্ধা লাহে কৰি।
নোৰাই ধুৱাই আইদেউক আগত আছে চাই।
মৰমিয়াল মাকৰ মন মৰমে বুৰায় ॥

৮। বেইত ঘূৰা নাম

মাকৰ আঁচলতে কিবা মধু আছে,
চকু লুভী আইতিয়ে ফুৰে পাছে পাছে ॥

শব্দাৰ্থ—জোকা—থোল। সেঙুৰয়—শিকলি।
• পানী ধলাত নাম—কন্যা যখন 'বেই' এর উপর বসে তৎকালীন গীত।
শব্দাৰ্থ—আউল জাউল—এলোমেলো। লাহে কৰি—আস্তে আস্তে।

বেঁইতে ঘূৰোঁতে ফুৰণি লাগিলে
সোমাই চামৰ পিৰাত বহে হে।
চামৰ বৰে পিৰা তাৰে চাৰি খুৰা
বহিছে সোণৰ চেকুৰা।

৯। 'বেই' প্রদক্ষিণের পর কন্যাকে যখন পিঁড়ার উপর বসান হয়, 'নামতি আই'দিগের তৎকালের গান :—

লাজ এৰি দিয়া, ওৰণী গুচুৱা
কেশ তাৰ মেলিব লাগে।
দাপোন কাকই আনা ওচৰলৈ
চুলিৰ জঁট ভাঙ্গিব লাগে॥
আকাশ মণ্ডলে পূর্ণ চাঁদ ওলালে
ত্রৈলোক্য পোহৰ কৰে।
ওৰণী গুচালে সখিৰ মুখ খনে
প্রজাৰ মন মোহিত কৰে॥
সৰুৰে এ পেৰা কেশকে বঢ়ালা
এ দালি নিছিগা কৰি।
তোলনিৰ কাৰণত মাকে মুৰ মেলাওঁতে
ছিগিল চেনেহৰে চুলি॥

১০। বর, কন্যার বহির্ব্বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর সঙ্গিনীগণ সেখানে তাঁহার রূপ বর্ণনার্থ নিম্নোদ্ধৃত গীত গাহিয়া থাকেন :—

চন্দ্রো চিকুণে সূর্য্য চিকুণে
চিকুণে সৰগৰ তৰা হে।

শব্দার্থ—চামর—শাল নামক কাঠের। বরে পিরা—বড় পিঁড়া।

শব্দার্থ—দাপোন—দর্পণ। কাকই—কাঙুনি। সরুরে এ পেরা—ছোট বেলা থেকে। এদালি—একগাছি। নিছিগা—ছেঁড়া। তোলনির—প্রথম ঋতুর সময়। মুর মেলাওঁতে—কেশ বিন্যাস করা। ছিগিল—ছিঁড়িল।

তাতোকৈ চিকুণে আমাৰ বোপাদেও
ওলাল বৰ ঘৰৰে পৰা হে ॥
পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰ যেন আহিছে ওলাই
দেখিলে পাতক হৰে হৃদয় জুড়ায়।

১১। বর, কন্যার বাটির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সম্বৰ্দ্ধনার জন্য কন্যার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া 'নামতি আই'দিগের গান :—

দৰা আদৰিবলৈ যোৱা নাম

ৰাম ৰাম ধ্রুং

কলৰগুৰিৰ পৰা মাতে জোঁৱাই লৰা
আদৰি নিয়াহি শাহু হে।
ৰৰা লাহৰি নেপাইছো আহৰি
বৰা জুৰিছোঁ আছু হে।
সেই ধানে বানি খুন্দিম পিঠাগুৰি
তোমালৈ লৈ যাম লাক্ষ হে।
আদৰি নিয়াহি সাদৰি শাহু আই
বস্ত্ৰ সিংহাসনৰ পৰা হে।

১২। বর অথবা কন্যাকে 'বেই'এর উপর বসাইয়া তাহাদের গাত্রে পিষিত মাসকলাই ও তৈল-হরিদ্রা এক সঙ্গে মাখাইবার পর তাহাদিগকে স্নান করান হয়। স্নানান্তে পাঁচজন অথবা সাতজন সধবা স্ত্রীলোক মাঙ্গলিক উদ্দেশ্যে উভয়ের মস্তকের উপর অল্পঅল্প করিয়া কিঞ্চিৎ চাউল ছড়াইয়া দেন। ইহাকে 'মূরত চাউল দিয়া' বলে।

মূৰত চাউল দিয়া নাম

আগত দিয়া পাছত দিয়া পঞ্চ আয়তীয়ে ৰাম ৰাম।
দুৰ্ব্বাঘটৰ পানী আনি ৰামৰ মূৰত দিয়া ৰাম ৰাম॥

শব্দার্থ—ৰৰা-অপেক্ষা কর। লাহরি—প্রিয় সম্বোধনসূচক শব্দ। আহরি—অবসর। বরা—কুটিবার জন্য কিছু পরিমাণ ধান। জুরিছো—প্রস্তুত করিতেছি। বানি—ভানিয়া (husking).

ীতে পানী নাই পাৰকে সুবুৰে ৰাম ৰাম।
আকাশতে পক্ষি নাই জাকে জাকে উৰে ৰাম ৰাম॥
পুখুৰীৰ চৌপাশে মৃগ পহু চৰে ৰাম ৰাম।
তাক দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰ ধেনু ধৰে ৰাম ৰাম॥
দলি মাৰি পেলাই দিয়া ফটিকৰে মালা ৰাম ৰাম।
তুমি দিবা ফটিক মালা আমি দিম কিয়ে ৰাম ৰাম॥
সত্যে সত্যে বিয়া দিলে সত্যভামাৰ জীয়ে ৰাম ৰাম।
ৰূপ পিন্ধে সোণ পিন্ধে, পিন্ধে মেজাঙ্কৰী ৰাম ৰাম॥
দেবাঙ্গ ভূষণ পিন্ধে ইন্দ্ৰে দিছে আনি ৰাম ৰাম॥

১৩। কন্যা সম্প্রদানের পর 'নামতি আই'রা নিম্নোদ্ধৃত ধরণের গীত গায়। ইহার নাম সম্প্রদান দি আতালে গোয়ানাম ঃ—

স্বামী সেবা ললা আজি এ পিতৃ হল পৰ।
আজি ধৰি সুদা হল এ কুণ্ডিল্য নগৰ॥
সোঁও হাতে ভীষ্ম ৰজা এ বাওঁ হাতে হৰি।
তাৰ মাজে প্রকাশিছে রুক্মিণী সুন্দৰী॥
মাধৱক চিন্তি আয়ে এ আছে এত কাল।
আজি আয়ে স্বামী বৰে এ নেপাতা জঞ্জাল॥

শব্দার্থ—আগত—অগ্রে দিয়া—দাও। পাছত—পরে। মূৰত—মস্তকে। পাৱকে—তীরদেশে। সুবুৰে—প্লাবিত হয় না। জাকে জাকে—ঝাঁকে ঝাঁকে। চৌ—চারি পহু—হরিণ। দলি—ঢিল। দলিমাৰি পেলাই দিয়া—ফেলিয়া দাও। কিয়ে—কি। ৰূপ—রৌপ্যালঙ্কার। মেজাঙ্কৰী—এক প্রকার উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র।

শব্দার্থ—অতালে—শেষ হইবার পর। সোঁও হাতে—দক্ষিণ হস্তে। নেপাতা—করিও না। সুদা—খালি। আজি ধরি—আজ থেকে।

১৪। হোমৰ ওচৰলৈ ছোৱালী নিয়া নাম

(এ ধ্রুং) ভীষ্মক নন্দিনী আই এ

স্বামী বৰিবলৈ যায় এ।

হাতত পুষ্পৰ মালা লৈ এ

(স্বামী বৰিবলৈ যায় এ)।

গৈ পাবা হোমৰ সভা এ

বহি পাবা বৰ।

কৃষ্ণ হেন স্বামী পাবা এ

চিন্তানো কিহৰ ?

১৫। বরপক্ষের স্ত্রীলোকেরা যদি কোন বিদ্রূপাত্মক নাম গায় তাহা হইলে কন্যা পক্ষের স্ত্রীলোকেরা তদুত্তরে নিম্নোদ্ধৃত ধরণের গীত গায় :—

যোৱানাম

ৰাম ৰাম শুনা কানে পাতি গাঁৱৰ বুঢ়া মেঠা

তাইহঁতে যোৱানাম গাই হে।

ৰাম ৰাম জপাৰ মুৰে মেলি, যোৱানাম আনিছোঁ

তাইহঁতে লঘুহৈ যায় হে॥

ৰাম ৰাম হাবিৰ কৌপাতে জতুলা-জুতুলী

ঢাপৰ কৌপাতে থিয়।

ৰাম ৰাম যোৱানাম গায়তী বেটিৰ চৰেখাতি

জোকাই লাথি থালি কিয়॥

শব্দার্থ—কিহর—কিসের।

শব্দার্থ—বুঢ়া মেটা—প্রাচীন লোক। তাইহঁতে—তাহারা (স্ত্রীলোকেরা)। জপা—এক জাতীয় বেত্র নির্ম্মিত বাক্স। লঘুহৈ—লজ্জাহীনা হইয়া। কৌপাত—বালির পাতা। জতুলা-জতুলী—গুটিয়া যাওয়া, খাট খাট। ঢাপ—চিপি। গায়ন্তি—গাহিকা। জোকাই—ঠাট্টা করিয়া।

১৬। কন্যার বাটীতে শুভ-বিবাহ-কার্য্যান্তে বরকে লইয়া কন্যার সম্পর্কীয়ারা নিম্নোদ্ধৃত ধরণের হাস্যোদ্দীপক গীত গাহিয়া থাকেন :—

(ঐ ৰাম) কৈলাশৰ হৰে আহে মোৰ ঘৰে,
জানিলোঁ গৌৰীক লাগে হে।
(ঐ ৰাম) নিদিওঁ মই গৌৰীকে জটীয়া শিৱলৈ,
সৰ্পে সৰ্পে ফেঁট মেলি আছে হে।
(ঐ ৰাম) কৈলাশৰ পৰা মহাদেউ আহিছে,
বৃষভ স্কন্ধে উঠি হে।
(ঐ ৰাম) বাৰে বছৰতো বাহি গা নোধোৱে,
গোন্ধে যায় প্ৰাণ ফুটি হে॥
(ঐ ৰাম) ৰভাৰ ওপৰে সৰ্পে গুঞ্জৰিলে
পাৰ্ব্বতী বুলিলে খাই হে।
(ঐ ৰাম) মহাদেৱ বুলিলে নেখাই পাৰ্ব্বতী
তালৈকো আছে উপায় হে।
বাঘ চালে পাৰি মহাদেউ বহিছে
নাৰদে শঙ্খ বজাইছে।
মেনকা বুলিয়ে পৰিলে পাৰ্ব্বতী
মহাদেউৰ জণ্টালৈ চাই হে।

১৭। ফুলশয্যা নাম *

ফুলৰে ইচনী ফুলৰে বিচনী
ফুলৰে শয়নৰ পাটী।
শয়নৰ পাটীতে ঘুমতি নাহিলে
কৃষ্ণ হল ভোমোৰা জাতি॥

শব্দার্থ—ফেঁট—ফণা। জটীয়া—জটাধারী। ৰভাৰ—চন্দ্রাতপের। চাই—দেখিয়া।

কোবাই নামাবিৰা কালিন্দ্ৰী ভোমোৰা
ফুলৰে লাগিব দোষ।
ফুল চুপি ভোমোৰা উৰাৰত কৰিলে
পাৰগৈ আপোনাৰ ৰাজ ॥
ভোমোৰা পুৰতে স্বামী নামে ললে
উভতি চৰীয়া বই।
উভতি চৰীয়া বব কেনৈ কৰি
সোতৰ সীমা সংখ্যা নাই ॥
সদৌ চেৰা স্তুতি যাব তবে পৰি
লব ভৰা স্তুতি নাম

১৮। ফুলশয্যা নাম *

ৰই বংশী বাবা কনাই ৰই বংশী বাবা।
তোমাৰ কন্যা সজাই থৈছে অযাচিতে পাবা ॥
আহিয়াছে কৃষ্ণচন্দ্ৰ বজাইছে মুৰুলী।
নাৰাই ভৰি মালা গাথি থৈছে ৰুকুণি ॥
আইদেউৰে কাপোৰেতে থুপি থুপি ফুল।
দ্বাৰকাৰে কৃষ্ণ আহি মাৰে জাতি কুল ॥

শব্দার্থ—পাটী—বিছানা। উরায়ত করিলে—উড়িয়া গেলে। রাজ—রাজ্য, দেশ। বই—বহিয়া। কেনৈ করি—কেমন করিয়া। সদৌ—সমস্ত। চেরা—চরপড়া। তরে পরি যাব—শুকাইয়া যাইবে।

শব্দার্থ—রই—আস্তে আস্তে। বাবা—বাজাইবে।

* ফুলশয্যা নাম—১৮৪৮ শকের ২রা কার্ত্তিক তারিখে লেখক ৺মধুমিশ্র সত্রের ভকতানী শ্রীমতী তরাই দাসীর নিকট এই গীত দুইটি শুনিয়াছিলেন।

আসামে বিধবা বিবাহ

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে কোন কোন পরাক্রান্ত অনার্য্য নৃপতি বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দুই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরূপ রীতি যে তাহাদের যথেচ্ছাচারিতায় সংঘটিত হইয়াছিল, প্রণিধান-পূর্ব্বক বিচার করিলে তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেহ কেহ বলেন—"মহাভারতে আভাস পাওয়া যায়, দময়ন্তী জানিতেন, নলরাজা নিরুদ্দেশ হইলেও জীবিত ছিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর পিতা ইহা জানিতেন না। মহাভারতের যুগে বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকিলে দময়ন্তীর পিতা তদীয় প্রাসাদে স্বয়ংবর সভার অধিবেশনে বাধা দিতেন।" যাহা হউক অনার্য্য সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের কোনরূপ আভাস এই দুই প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত কলিযুগে 'নিয়োগ' পদ্ধতি রহিত হইয়াছে। ইহা বিবাহের অন্যতম পদ্ধতি বিশেষ নহে। অপুত্রক বিধবার পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকালে তাহার দেবর অথবা জ্ঞাতি উপগত হইতে পারিত। এই প্রথাকে 'নিয়োগ' এবং এই বিধবার গর্ভোৎপন্ন সন্তানকে 'ক্ষেত্রজ' বলে। নিয়োগ-প্রাপ্ত রমণীকেও বিধবার যাবতীয় আচার পালন করিয়া চলিতে হইত। আদিত্য পুরাণকার নিয়োগ গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন।

কোন স্মৃতি শাস্ত্রকার "বিধবার বিবাহ হউক" বলিয়া স্পষ্টভাবে কোন বিধি-বিধান দেন নাই। মনু, বিধবা-বিবাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র বলিয়াছেন, "বিধবা-বিবাহের কোন শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতি নাই।" 'বিষ্ণু স্মৃতি'তে বিধবার পক্ষে দুইটী পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং আর একটি

সহমরণ অবলম্বন। বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মিতাক্ষরা নামক টিকায় 'বিষ্ণুস্মৃতি' হইতে এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"ভর্ত্তরি প্রেতে ব্রহ্মচর্য্যং তদম্বারোহণং বা ॥—১।৮৬

অর্থাৎ—স্বামী মরিয়া গেলে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে অথবা 'অন্বারোহণ' (সহমরণ) করিতে হইবে।

পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই :—

গতে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ২৭

অর্থাৎ—স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিয়া গেলে, সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে অথবা পতিত হইলে, এই পঞ্চ বিধ আপদে স্ত্রীলোকদিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধি আছে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য—শ্লোকস্থ 'পতিতে' অর্থে পতিত হইলে, অর্থাৎ স্বামী শাস্ত্রবিহিত আচার-ব্যবহার অথবা সংস্কার-ভ্রষ্ট হইলে নারী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে। এক্ষণে কথা হইতেছে—বর্ত্তমান যুগে কয়জন ব্যক্তি বেদ-বিহিত আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম করেন না? এরূপ স্থলে নারী মাত্রকেই পুনর্ব্বিবাহের বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত "পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতি-রন্যো বিধীয়তে" এই উক্তির অন্তর্গত পতি শব্দে ঠিক স্বামী বুঝায় না। বাগ্‌দানের * পর পাত্রকেও যে পতি বলিয়া অভিহিত করা চলে, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অন্যান্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যা। সুতরাং পরাশরের এই বিধান বাগ্‌দত্তা কন্যা সম্বন্ধে প্রযুজ্য—বিবাহিতা স্ত্রী সম্বন্ধে নহে। যাহা হউক, নারদীয় পুরাণেও পরাশরের ঐ বচনটী আমরা দেখিতে পাই। ইহা একটী উপপুরাণ।

যে নারী অন্য ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহ করে, সাধারণতঃ তাহাকে

---

* বাগ্‌দান—প্রায় ৫০ বৎসর (অর্থাৎ প্রায় ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দ) পূর্ব্বে বৈদিক কন্যাগণের বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দান হইত।

'পুনর্ভূ' এবং তৎপুত্রকে 'পৌনর্ভব' বলা হইত। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কি অক্ষত যোনি, কি ক্ষত যোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে। প্রমাণ যথা :—

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ ॥—১।৬৭

বশিষ্ঠ বলেন :—

পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥—১৭ অঃ

অর্থাৎ—পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ-সংস্কার হইতে পারে।

মহাভারতের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী যুগ হইতে হিন্দুর সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যে সকল জাতির লোকেরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সমাজে বিধবা বিবাহ আমোল পায় নাই। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় —উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা ছিলেন সংযমী। তাঁহাদের সামাজিক রীতি-নীতি সাত্ত্বিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা বিধবা কন্যাদিগকে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। ইহার ফলে ঐ কন্যাদিগের মনে সংসার অসার, ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দ কিছুই নহে এইরূপ বোধ হইলে, ভগবৎ চিন্তা মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া তাহাতেই তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিতেন।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকজন প্রোথিতনামা স্মৃতিকারের অভিমত বিবৃত করা হইল। এক্ষণে অসমীয়া পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য বঙ্গদেশে এই বিবাহের প্রচলন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাউক :—বহুকাল হইল এদেশে বিধবা বিবাহ অতীব গ্লানিকর কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় তথাকথিত বৈষ্ণব ও কাওরা ব্যতীত অতি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু-সমাজে এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও

আমরা বিধবা-বিবাহ দেখিতে পাই না। মহাপ্রভু তদীয় ভক্তগণকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিতে অথবা উঠাইয়া দিতে বলেন নাই। কেবল তথাকথিত বৈষ্ণবগণ কণ্ঠি বদল করিয়া আপনাদের অনুরূপ সমাজে বিধবাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। পশ্চিম-বঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজে আজিও বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয় নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গের কয়েকজন উচ্চ-শিক্ষিত নমঃশূদ্র বিগত ১৯২৪-২৫ সাল হইতে তাহাদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনার্থে সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছে। আজিও (অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) বঙ্গদেশে বিধবার গর্ভজাত পুত্র সকল শ্রেণীর হিন্দুর অস্পৃশ্য। অসমীয়া হিন্দুসমাজ এ বিষয়ে অত্যন্ত উদার। বিধবার গর্ভজাত ভ্রূণ হত্যা নিবারণার্থ ১৩।১৪ বৎসর হইল শ্রীযুত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবত রত্নের উদ্যোগে বহু অর্থব্যয়ে নবদ্বীপ ধামে 'মাতৃমন্দির' নামক একটী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে।

আসামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থ ব্যতীত তথাকথিত কায়স্থ এবং কলিতা, কেওট, কোঁচ, নাপিত, কুমার, নট প্রভৃতি জাতির সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। আসাম কলিতা প্রধান দেশ। ইঁহারা কৃষিজীবি। বিগত ১৯২২ সালের প্রারম্ভে গৌহাটী অঞ্চলের চামটা, বেলসর প্রভৃতি গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত কলিতা জাতীয় ভদ্রলোক উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন দেখিয়া অথবা কলিকাতার 'মেছে' (Mess) বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণসহ একত্র ভোজনের বিড়ম্বনা ভোগ কিংবা মহাত্মা * * সেনের পন্থানুসরণ—[বিবেকের দোহাই প্রদান]—করিয়া আপনাদিগকে 'ক্ষত্রিয় কলিতা' বলিয়া সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন। কারণ যাহাই হউক, অতঃপর তাঁহারা সমাজে উপর্য্যুপরি ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন চালান। ইহার ফলে প্রথমে তাঁহাদের কয়েকজন আত্মীয় স্বজন এবং তৎপরে অন্যান্য স্থানের কলিতাগণ তাঁহাদের দেখাদেখি

কলিতা ক্ষত্রিয় হইল, বিধবা বিবাহ কিন্তু পূর্ব্ববৎ রহিল

ক্ষত্রিয় হইয়াছেন ও হইতেছেন। কিন্তু আজিও গৌহাটী অঞ্চলের এই নব্য ক্ষত্রিয় কলিতা-সমাজে বিধবা-বিবাহের পূর্ব্ববৎ প্রচলন আছে। যাহা হউক, আসামে কলিতা, কেওট, নট আদি বিভিন্ন জাতির সমাজে বহুকাল হইতে একই পদ্ধতিতে বিধবা-বিবাহ হইতেছে। সে দেশে হিন্দু আহোম, হিন্দু ছুটীয়া, সুতকুলিয়া, নদীয়াল, বৃত্তিয়াল প্রভৃতি জাতির সমাজে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিধবা বিবাহের স্ত্রীআচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি বিধবা-বিবাহে 'কলর গুরিত গা ধুয়ান'র কালে গাত্রহরিদ্রার আবশ্যক হয় না। হোম করিবার বিধিও নাই।

আসামে হিন্দু বিধবা-বিবাহে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান নাই

মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে এই বিবাহ উপলক্ষে 'বেই' নিষ্প্রয়োজন। বিধবার বিবাহকালে আয়তি বা 'নামতি আই'রা বিবাহ-বিষয়ক গীত গাহেন না। উজনী অঞ্চলে তৎকালে 'নামতি আইরা' সচরাচর বিদ্রূপাত্মক 'জোড়ানাম' গাহিয়া থাকেন। এই অঞ্চলে বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদকালে পঞ্চ আয়তিরা যে 'নাম' গায়, কোন বিধবার তাহাতে যোগদান করা নিষিদ্ধ। 'নামনি' ও 'উজনী' অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থ জাতীয় বিধবারা কদাচ শাঁখা, সিন্দূর কিংবা কোন রংয়ের পাড়ওয়ালা কাপড় পরিধান করেন না। পুনর্ব্বিবাহ হইলেও কলিতা, কেওট আদি জাতীর বিধবাকে শেষোক্তটী ব্যতীত শাঁখা, সিন্দূর ঘুচাইয়া ফেলিতেই হয়।

দত্ত কন্যাকে পিতামাতার পুনরায় সম্প্রদান করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আমাদের মতে—যদি বিধবার বিবাহ দিতে হয়, কন্যার শ্বশুর শাশুড়ী কেবল মাত্র

অক্ষত যোনি বিধবা-কন্যার বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত

তাহা দিতে পারেন। "অক্ষত যোনি" (স্বামী সহবাস যাহার হয় নাই) বিধবা-কন্যার পুনর্ব্বিবাহ মনু (১৭৬ শ্লোক ৯ম অধ্যায়), বশিষ্ট (১৭ অধ্যায়), যাজ্ঞবল্ক্য (আচারাধ্যায় ৬৭ শ্লোক) এবং বিষ্ণু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত।

তেজপুরের শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত বড়কাকতি মহাশয় বলেন (১) "দরঙ্গ জেলার তেজপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা-বিবাহে গাত্র-হরিদ্রা দেওয়া অথবা প্রথম বিবাহে যেরূপ নিয়মমত হোমাদির অনুষ্ঠান করা হয়, এ অঞ্চলে তদ্রূপ করা হয় না। পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামস্থ ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ সভায় সম্মিলিত হইলে পর, পাত্রীকে বরপক্ষের অলঙ্কার পরিধান করাইয়া সভাস্থলে উপস্থিত করান হইলে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জলযোগ করেন।"

নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় বর, বিধবার পিত্রালয়ে কিংবা তাহার কোন আত্মীয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে 'আগ চাউল' দেওয়া হইলে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু নিম্ন-আসাম অর্থাৎ—গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার প্রথা অনুসারে বিধবাকে তাহার পিত্রালয়ে অথবা মৃত স্বামীর বাটীতে 'আগ চাউল' দেওয়া হয়।

বরের আগমন আগ চাউল দিয়া ও অন্যান্য প্রথা

যদি কন্যা, স্বামীগৃহে যাইবার পূর্ব্বে বিধবা হয় এবং তাহার দ্বিতীয় সংস্কার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নূতন স্বামী ঢাক-ঢোলের বাদ্য সহ তাহাকে পিত্রালয় হইতে একটু আড়ম্বর করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়। বিধবা-বিবাহে 'আগ চাউল' প্রদান কার্য্যটী সংক্ষেপে হয়। অবশ্য ভদ্রলোক হইলে একটু শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য পূরাভাবে উহার অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে পায়সপূর্ণ পাত্রদ্বয়ের আদান-প্রদান হয় না। 'আগ চাউল' দেওয়ার অগ্রে কন্যার বাটীতে উলুধ্বনী ব্যতীত শঙ্খ বাজান কিংবা বিবাহের কোন নিয়ম প্রতিপালিত হয় না; কেবল বিধবাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। বরের বাটীতে 'আগ চাউল' দেওয়া হইয়া গেলে খাওয়া-দাওয়া হয়।

(১) ১৯২৩ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র।

নিম্ন-আসামে বিধবার পূর্ব্ব স্বামীর গৃহে কিংবা পিত্রালয়ে কোনরূপ উদ্বাহ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয় না। বিধবা বিবাহিত হইলে পিত্রালয়ে যাইতে পারে—তাহাতে কোনরূপ সামাজিক প্রতিবন্ধ নাই। আসাম অঞ্চলের সর্ব্বত্র পূর্ব্বকথিত জাতীয় বিধবার বিবাহ বহুবার হইতে পারে। তাহাতেও সমাজে কোনরূপ আপত্তি নাই। মনে করুন—স্বামীর মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি তাহার বিধবা-পত্নীকে বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু হইল। তখন ইচ্ছা করিলে সেই বিধবা, তৃতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে, এবং তৃতীয় পতির মৃত্যু হইলে চতুর্থ পতি—এইপ্রকার যত ইচ্ছা তত পতি গ্রহণ করিতে পারে। বিধবারা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পতি গ্রহণ করিলে নিষ্ঠাবান আসমীয়ারা তাহাদের স্বামীর এই বিবাহ-কার্য্যটীকে সাধারণতঃ 'ঢেমনি আনা' বলেন। যাহা হউক 'ঢেমনি'র পাণিপীড়নার্থ যে কোন সময় তাহাকে বরের বাটিতে আনা যায়।

ঢেমনি আনা

বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রগণকে কামরূপ অঞ্চলের লোকেরা 'সুত কুলিয়া' বনাম 'বরিয়া' বলে। প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র যদি মাতার সহিত দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে, অসমীয়ারা ঐ পুত্রকে 'গুরগুরীয়া' বলেন। যাহা হউক স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় উদ্‌যোগী হইয়া সর্ব্বপ্রথম গভর্ণমেণ্টের দ্বারা বিধবা-বিবাহের আইন 'পাস' করাইয়া লন। এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বিধবার গর্ভজাত পুত্রগণ সম্পত্তির বৈধ অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আসাম অঞ্চলেও বিধবার প্রথম পতির ঔরসজাত পুত্র, বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায় না। সে বড় হইলে তাহার নিজ পিতার সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে। সতীন পুত্রেরা ও বিধবার পুত্রেরা সমভাবে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায়।

আসামে অসবর্ণ বিবাহ

সপ্তম অধ্যায়

মনু সংহিতার মত অত্রি, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, গৌতম, পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রসমূহে উচ্চ-বর্ণের পুরুষের সহিত নিম্ন-বর্ণের কন্যার বিবাহের

প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি-বিধান

অনুমোদন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেগুলিতে উচ্চ-জাতির কন্যার সহিত নিম্ন-জাতির পুরুষের বিবাহ সমর্থিত হয় নাই। এই প্রকার বিবাহের প্রথমটিকে অনুলোম এবং দ্বিতীয়টিকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হয়। মনুসংহিতার প্রাধান্যকালে ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন; কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন এই ছিল যে, ব্রাহ্মণ অগ্রে সবর্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নিমিত্ত সবর্ণার পাণিগ্রহণ প্রথমতঃ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। শতপথাদি ব্রাহ্মণ রচনার যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তৎকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের নিকট বেদবেদান্তের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ইহার প্রমাণ—শতপথ ব্রাহ্মণের ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রকরণ। রামায়ণের যুগেও ক্ষত্রিয়ের চারি বর্ণের কন্যা গ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে এবং জৈন পদ্মপুরাণে দেখা যায়—দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও সুপ্রভা নামে পত্নী চতুষ্টয় চারি বর্ণের ছিলেন। পরাশর তদীয় স্মৃতির প্রারম্ভে "অসবর্ণ বিবাহ বৈধ" কিন্তু শেষে তিনি উহাকে অবৈধ বলিয়াছেন। শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন, "অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ অসবর্ণ বিবাহকে বৈধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় পরাশরের শেষোক্ত উক্তি প্রক্ষিপ্ত।" দেবল সংহিতাকার অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। এই সংহিতার প্রচলন গুজরাট অঞ্চল ব্যতীত অন্য দেশে নাই। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"অনুলোম বিবাহজাত পুত্রগণ মাতার সবর্ণ প্রাপ্ত এবং প্রতিলোম বিবাহজাত পুত্রগণ বর্ণসঙ্কর হইবে।" কিন্তু শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহজাত সন্তানের

মাতৃসবর্ণ প্রাপ্তির নির্দ্দেশ থাকিলেও অনেক স্থানে জাতকেরা পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, দৃষ্ট হয়। যদু পুরু, সগর-পুত্র প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্থল। মহাভারতে

মহাভারতের যুগে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ

আমরা দেখিতে পাই—পরশুরাম, ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যযাতি, ক্ষত্রিয় হইয়া শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান হইতে প্রসিদ্ধ যদুবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্যাস, কৈবর্ত্ত-কন্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার বর্ণানুসারে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে অনুলোম ও প্রতিলোম এই দুই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং বিবাহোৎপন্ন সন্তান পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন।

[স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীর নৃপতিবর্গ স্থানলাভ করিতে সমর্থ হইতেন, এরূপ পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রে অনুলোম ও প্রতিলোম উভয় প্রকার বিবাহ হইত]

সেকালে ভারতখণ্ডের রাজ্যসমূহের রাজা-প্রজা নিকটস্থ এবং দূরস্থ দেশের সমান শ্রেণীর লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন। রাজায় রাজায়

সেকালে বৈবাহিক আদান-প্রদান

বিবাহ-সম্বন্ধ ইতিহাস ধরিয়া রাখে। প্রজাদের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধের লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐরূপ শত শত সম্বন্ধ সহজেই ঘটে। কয়েকজন রাজার বিবাহের দৃষ্টান্ত যথা :—কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য, গৌড়াধিপতি জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে ; নেপালের রাজা শিবদেবের পুত্র জয়দেব, কামরূপরাজ হর্ষের কন্যা রাজ্যমতী বা রাজ্যদেবীকে ; সম্রাট ধর্ম্মপাল, রাষ্ট্রকুটরাজ পরবলের কন্যা রান্নাদেবীকে, বর্ম্মরাজ জাতবর্ম্মা, চেদিরাজ কর্ণের দ্বিতীয় কন্যা বীরশ্রীকে ; বিজয় সেন বাঙ্গালার শূররাজবংশ-কন্যা বিলাস দেবীকে ; বল্লাল সেন, চালুক্য রাজবংশজ রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বল্লাল সেন একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপালে রাজত্ব করিতেন। তিনি বঙ্গ, বারেন্দ্র, বাগ্রী, রাঢ় ও মিথিলা এই পঞ্চজনপদের (১) একছত্র নৃপতি ছিলেন। মুদ্রিত বল্লাল চরিতে আমরা দেখিতে পাই যে, গৌড়াধিপতি বল্লাল সেন, গোবিন্দ আঢ্য নামক জনৈক সুবর্ণবণিকের কন্যাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছিলেন :—

বল্লাল সেনে অযথা দোষারোপ

অসবর্ণ বিবাহেতে বিধি নাই এ কলিতে
কিন্তু রাজা তাহা না শুনিল।
বণিক কুলেতে ধন্যা গোবিন্দ আঢ্যের কন্যা
বলে ধরে বিবাহ করিল॥" *

Assiatic Society হইতে যে মূল বল্লাল চরিত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই কথা নাই। বল্লাল 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামক দুইখানি স্মৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন এবং ছত্রিশটী 'মেল'বন্ধন করেন। মহারাজ বল্লাল স্মার্ত্ত-বিশ্বাসী, ধর্ম্মবিশ্বাসী, পরমধার্ম্মিক ও পরমপণ্ডিত ছিলেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস —তাঁহার দ্বারা কখনও এরূপ কার্য্য সম্ভবে না। আমরা দেখিতে পাই—শিক্ষিত বৈদ্য, বারেন্দ্র কায়স্থ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, কৈবর্ত্ত ও যুগী জাতির লোকেরা বল্লাল সেনের উপর নানারূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কয়েক ঘর বৈদ্য ব্যতীত বারেন্দ্র কায়স্থ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও সুবর্ণ বণিকেরা এই রাজার সময়ে কোনরূপ রাজসম্মান কিংবা সামাজিক কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদের প্রাচীন কারিকায় [কুলগ্রন্থে] যদি মহারাজ বল্লাল সেনের কোন

(১) বঙ্গ—পদ্মার পূর্ব্বপার। বারেন্দ্র—পদ্মার উত্তর পার; বাগ্রী—গঙ্গার পশ্চিম পার, রাঢ়—গঙ্গার পশ্চিম পার।

* আনন্দ ভট্ট সঙ্কলিত বল্লাল চরিতের উপর আমাদের আস্থা নাই। ইনি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া অনেক সামাজিক বিষয় অযথাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

কদাচারের বিষয় উল্লেখ থাকিত, আমরা তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইতাম।

প্রাচীন কারিকায় উক্তির পোষকতা আবশ্যক

বৈদ্যদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কুলগ্রন্থ কণ্ঠহার ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে খুলনা জেলার সেনহাটী নিবাসী রামকান্ত দাস কর্ত্তৃক এবং চন্দ্রপ্রভা ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে কাঁচড়াপাড়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভরতমল্লিক কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। যদুনন্দন-কৃত বারেন্দ্র কায়স্থদিগের যে 'ঢাকুর' আছে, তাহাও চন্দ্রপ্রভার সমসাময়িক। চারি শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগকে জাতীয় রীতিনীতির প্রতি অধিকতর অনুরাগী দেখা যায়। Ethnology in Ancient Historical Documents (২) নামক [বাঁশবেড়ীয়া রাজবংশের গৌরব প্রচারার্থ এবং নানারূপ কল্পনা করিয়া লিখিত] পুস্তিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দিনাজপুর, বাঁশবেড়ীয়া ও সেওড়াপুলির রাজবংশের আদিপুরুষ দেবদিত্য, বৈদ্যজাতীয় বল্লাল সেনের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্পর্দ্ধার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন! কিন্তু "উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বিবরণ" তৃতীয় খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় ঐ বংশের পুরুষীনামায় 'দেবদত্ত' এবং তৎপুত্র আদিত্য দত্তের নাম দৃষ্ট হয়—দেবদিত্য নাম এই পুস্তকের কোথায়ও নাই। সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্যজাতীয় [সুতরাং দ্বিজবর্ণ] 'সেখশুভোদয়' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। বাঙ্গালার কৈবর্ত্তরা আপনাদিগকে বর্ত্তমানে মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যকন্যা মাতার গর্ভজাত পুত্রকে মাহিষ্য বলিয়াছেন। উহাদের জীবিকা রাজান্তঃপুর রক্ষা ইত্যাদি। কৃষি বৃত্তিক বা হালুয়া কৈবর্ত্ত অথবা নৌজীবী জালুয়া দাশ বা কৈবর্ত্ত, "মাহিষ্য" বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত ও যুগী জাতির লোকেরা নিরক্ষর ছিল! ইহাদের কোনও প্রাচীন কুলগ্রন্থ থাকা সম্ভবপর নহে।

(২) ইহার লেখক Rai Bahadur B. A. Gupte, F. Z. S., F. R. S. A. University Lecturer on Ethnology, Calcutta.

পূর্ব্ব-আসাম অপেক্ষা পশ্চিম-আসামে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অনেক বেশী। বঙ্গদেশের মত আসামে ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীবিভাগ কিংবা কৌলিন্য প্রথা নাই। অসমীয়া প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বিগত ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় লেখকের অখিল মিস্ত্রীর লেনস্থ আবাসে আগমনপূর্ব্বক বিবিধ কথা প্রসঙ্গকালে বলিয়াছিলেন—অসমীয়া ব্রাহ্মণদিগকে মোটামুটীভাবে ছয়টী শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা:—১। সত্রাধিকার গোস্বামীবংশ, ২। ভট্টাচার্য্য বংশ, ৩। দেবল, ৪। গ্রাম্য যাজক, ৫। অগ্রদানী ও ৬। হাবুঙ্গীয়া বংশ। কলং নদীর তীরস্থ ডিফলু সত্রের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত কীর্ত্তিচন্দ্র দেব নাতি গোঁসাঞী মহোদয় বলেন—"নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াপূত আরু অযাজক অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ সকলক উত্তম শ্রেণী বোলে। যাজক প্রতিগ্রাহী, দেবল ব্রাহ্মণ মধ্যম শ্রেণী। সন্ধ্যা, গায়ত্রী রহিত নামমাত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে প্রাকৃত শ্রেণী বুলি ধরা হয়। উত্তম শ্রেণীর ব্রাহ্মণর ভিতর যি সকল জ্ঞানী, সেই সকলর অধিকাংশে অনুরূপ কুলক্রিয়া চাই বৈবাহিক সম্বন্ধ করে। কিন্তু কেতিয়াবা সমশ্রেণীর ভিতরত সম্বন্ধ করিবলৈ অভাব হলে 'স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি' নীতিশাস্ত্রের এই উপদেশ মূরত লৈ দ্বিতীয় আরু তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণর লগতো বৈবাহিক সম্বন্ধ করে দেখা যায়। আসামত প্রাকৃত শ্রেণীর ব্রাহ্মণর ভিতরত কাল সংহতির মহন্তও পরিছে। অথচ সি বিলাকর লগতো অপর দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণে সম্বন্ধ করা দেখা গৈছে। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ আরু বঙ্গালখাটা ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব আসামত নাই।" বর্ত্তমানে উপর-আসামে ব্যতীত মধ্য বা নিম্ন-আসামে হাবুঙ্গীয়া ব্রাহ্মণের বসবাস নাই। ইঁহারা আচারহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এখানকার অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের সহিত বিবাহের আদান-প্রদান করেন না।

অসমীয়া ব্রাহ্মণ মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ও অসবর্ণ বিবাহ

নদীয়ার কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ন্যায়বাগীশের বংশধরগণ বহুকাল হইতে কামাখ্যা পাহাড়ে বসবাস করিলেও অসমীয়া ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন না। বঙ্গদেশে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। আসাম

ভিন্ন বর্ণের অসমীয়া হিন্দুর অসবর্ণ বিবাহ নাই

অঞ্চলের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে। এখানকার কলিতা, কৈঁওট, কোচ প্রভৃতি হিন্দুগণ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা আপনাদের অপেক্ষা নিম্ন-বর্ণের ব্যক্তির গৃহ হইতে কন্যা আনয়ন করেন না বটে, কিন্তু অনেক সময় কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন। বৈদ্য জাতীয় সরকারী উকিল রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন, লেখকের প্রশ্নোত্তরে বিগত ১৬৷৩৷২৪ তারিখে গৌহাটীস্থিত পানবাজার হইতে

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান

লিখিয়াছিলেন—"শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা ব্যতীত আসামে বৈদ্য জাতির বসবাস নাই বলিলে চলে। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল বৈদ্য জাতির লোক কাজকর্ম্ম বা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে গোয়ালপাড়া বা কামরূপ অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা সংখ্যায় এত অল্প যে, উল্লেখযোগ্য নহে।" ৺উমেশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন তদীয় গ্রন্থে অসমীয়া বেজ বড়ুয়াদিগকে 'বৈদ্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বৈদ্য জাতীয়। আমরা বেজবড়ুয়াদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া শুনিয়াছি; আর অনুসন্ধানান্তে জানিয়াছি—'বেজ' শব্দের অর্থ বৈদ্য। আহোম রাজগণের পারিবারিক চিকিৎসার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজসরকারে 'বেজ বড়ুয়া' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, গ্রে ষ্ট্রীটস্থ কল্পতরু প্রেস হইতে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতি' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বৈদ্য প্রবোধিনী'র তৃতীয় সংস্করণে আমরা দেখিতে পাই—"আসামের বেজ বড়ুয়া নামক ব্রাহ্মণগণ তত্রত্য ব্রাহ্মণ সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আসামী ভাষার 'বেজ বড়ুয়া'

নামের অর্থ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ। (বৈদ্যের অপভ্রংশ 'বেজ' এবং ব্রাহ্মণ বাচক 'বটু শব্দের অপভ্রংশ 'বড়ুয়া'*)। বাঙ্গলার বৈদ্যদিগের মত বেজ বড়ুয়াগণের মধ্যে চিকিৎসা বৃত্তির প্রচলন ও 'বৈদ্য' বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহাদের সহিত অন্য ব্রাহ্মণদের কন্যার আদান-প্রদান চলে। (প্রমাণ স্বরূপ বৈদ্য-হিতৈষিণী ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামীর পত্র দ্রষ্টব্য)।" উক্ত কল্পতরু প্রেসের তৎকালীন ম্যানেজার তারাপ্রসন্ন বাবুকে লেখক এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—জখলাবন্ধার বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পত্নীর চিকিৎসার্থ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ৯৪নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আসিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"আপনারা তো বৈদ্য। আমরা ব্রাহ্মণ হইয়া আমাদের দেশে বেজ বড়ুয়া উপাধিধারী বৈদ্যদিগের সহিত বিবাহের আদান-প্রদান করিয়া থাকি।" তখন কবিরাজ মহাশয়ের কি আনন্দ! তিনি তাঁহার হস্তে এক টুকরা কাগজ প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন—"আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার এই কথাটী ইহাতে লিখিয়া দিউন। রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমার এখানে সস্ত্রীক অবস্থান করুন।" উক্ত জখলাবন্ধার গোস্বামী মহাশয় তখন উহাতে যাহা লিখিয়াছিলেন, ১ম বর্ষের বৈদ্য-হিতৈষিণীর ১ম সংখ্যায় (পৃঃ ২১) তাহার প্রকাশিত অবিকল নকল, যথা :—

"মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী, মহাশয়েষু—সবিনয় নিবেদন,

আসামে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের কোন প্রভেদ নাই। আসামে বৈদ্যেরা "বেজ বরুয়া" নামে খ্যাত। তাঁরা ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে

---

* বড়ুয়া— ব্যাখ্যাটী নিতান্ত হাস্যকর হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতির লোকেরাও গুণকর্ম্ম হেতু আহোম রাজাদিগের নিকট হইতে এই সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বৈদ্য ও আসামের বেজ বরুয়া একই জাতি নহেন। একমাত্র বেজ বড়ুয়ারা অন্যতম অসমীয়া ব্রাহ্মণ।—লেখক

বিবাহাদি চলাচল আছে। - আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ শ্রীযুক্ত মাণিক্য চন্দ্র বেজ বরুয়ার সঙ্গে হইয়াছে, উনি "বৈদ্য"। বিনীত—

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা গোস্বামী বি, এল, উকিল
(জখলাবন্ধা সত্র) নগাঁও, আসাম।

[শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিবাদ পত্র 'বিবাহের উপসংহার' এ প্রকাশ করা হইল]

উপর-আসামে কায়স্থ-কন্যার অভাবে তথাগত কায়স্থের কল্পিতা-কন্যার পাণিপীড়ন

উপর-আসামে বর্ত্তমানে বিশুদ্ধ কায়স্থের সংখ্যা নগণ্য। সরকারী উকিল রায় বাহাদুর কালিচরণ সেন যিনি বহুকাল ধরিয়া আজিও (অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) আসামে বসবাস করিতেছেন, বিগত ১১।৩।২৪ তারিখে পত্রে তিনি লেখককে লিখিয়াছিলেন—"উপর-আসামে খাঁটি কায়স্থ আছে কি না সন্দেহ। তত্রত্য যাঁহারা আপনা-দিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে।" অহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ কর্ত্তৃক 'উজানী' অঞ্চলে আনিত যে আটঘর বিশুদ্ধ কায়স্থের বংশধর স্বজাতীয় কন্যাভাবে অসবর্ণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাঃ— শ্রীরাম রায়, গৌরধ্বজ, পিতাম্বর ঘোষ, বীরজীৎ, উদ্ধব, জনার্দ্দন ও আরও দুই জন ব্যক্তি। এই কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ কনৌজ হইতে এবং কেহ কেহ অন্যত্র হইতে কোচবিহারে আসিয়া বসবাস করেন। রাজা জয়ধ্বজ সিংহ ইঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া শ্রীরামকে চলিহা, গৌরধ্বজকে দুয়োরা, পিতাম্বরকে নামতিয়াল, বীরজীৎকে মাটিখোয়া, উদ্ধকে গজপুরীয়া, জনার্দ্দনকে শলগুরীয়া এবং অপর দুইজনকে যথাক্রমে অভয়পুরী ও ভুকোরীয়া উপাধি প্রদান করত সম্মানিত করিয়াছিলেন। লখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় প্রকৃত কায়স্থদিগের সংখ্যা অধিক না

থাকায় আদান-প্রদানের অভাবে ইঁহাদের বংশধরেরা বাধ্য হইয়া তত্রত্য কলিতা জাতির সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। চলিহা বংশে শ্রীযুত কুলধর চলিহা [কিছু দিনের জন্য Non-Co-operator], শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চলিহা [Excise Inspector] প্রভৃতি; এই সুরেন্দ্রনাথ আসাম জননীর অন্যতম কৃতী সন্তান। দুয়োরা বংশে—সুপ্রসিদ্ধ মণিরাম দেওয়ান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু হয়। এই বংশের অন্যতম ব্যক্তির নাম শ্রীযুত নীলমণি ফুকন (ডিব্রুগড়); নামতিয়াল বংশের আদি পুরুষ পিতাম্বর ঘোষ অত্যন্ত কৃশ ছিলেন বলিয়া রাজা জয়ধ্বজ সিংহ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'শুকানি কাইথ'। এই বংশে রায়বাহাদুর কনকলাল বড়ুয়া ও শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মাটীখোয়া বংশে শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত বড়ুয়া বি-এল (শিবসাগর), গজপুরীয়া বংশে শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ ও শ্রীযুত রিপুঞ্জয়—(স্থান—চারিং), শলগুড়ি-বংশে শ্রীযুত বেণুধর রাজখোয়া (E. A. Commr.) অভয়পুরীয়া বংশে শ্রীযুত রত্নেশ্বর বড়কাকতি (চারিং) ও তকোরীয়া-বংশে শ্রীযুত রাধানাথ ফুকণ (চারিং) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

প্রকৃত কায়স্থ ও সম্পন্ন কলিতার সামাজিক রীতি

যে সকল খাঁটী কায়স্থের বংশধরগণ বৈদিক সংস্কারহীন অথবা কায়স্থোচিত যাবতীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া কলিতাদিগের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াও আপনাদিগকে 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং কখনও আপনাদিগকে 'কলিতা' বলিয়া পরিচয় দেন না, আমাদের মতে তাঁহাদিগকে "কল্‌তা-কায়েত" বা তৃতীয় শ্রেণীর কায়স্থ নামে অভিহিত করা যায়। অনেক স্থানে সচ্ছল অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত কলিতারা অপরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট আপনাদিগকে 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। Mr. B. C. Allen মহোদয় ইহা অবগত হইয়া লখিমপুর জেলার গেজেটীয়ারে (Vol. viii page 117) লিখিয়াছেন—"Kalitas who have risen above the necessity of manual labour frequently describe

themselves as Kayasthas." যাহা হউক, অসমীয়া প্রকৃত কায়স্থগণ, আমাদিগের কথিত ঐ শ্রেণীর কায়স্থগৃহ হইতে কন্যা আনয়ন কিংবা সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে তাহাদের সহিত এক পংক্তিভুক্ত হইয়া ভোজন করেন না। এমন একদিন ছিল, কামরূপ জনপদের কায়স্থদিগের প্রভাব প্রতিপত্তি, সদাচার ও অকপট মনোবৃত্তি দেখিয়া কলিতাদি জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণবৎ সম্মান করিতেন। কায়স্থ হইতেই অসমীয়া সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল।

অসমীয়া জাতি বিশেষের প্রথা

লখিমপুর জেলায় কলিতা ও কেওট এই দুই বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভুরি ভুরি বিবাহ হইয়া থাকে। এই জেলাবাসী কুমার-কলিতা, সরু কোচ, মালি এবং সোনারী জাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহের প্রচলন আছে। শিবসাগর জেলার সুবিস্তৃত মাজুলি অঞ্চলে কলিতা ও কেওট জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান নাই। এই দুই জেলায় এবং নগাঁও ও তেজপুর অঞ্চলের বহু পল্লীগ্রামে ঐ সকল জাতির অধিকাংশ কন্যা সাধারণতঃ বয়স্থা না হইলে পরিণীতা হয় না। পথে, ঘাটে, মাঠে তাহাদিগের অবাধ কথাবার্ত্তা এবং মেলামেশাও হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ভালবাসার সঞ্চার এবং তৎপরে অবৈধ বিবাহ সংঘটিত হয়। 'উজনী' অঞ্চলের কোন কোন স্থানে কোন কোন সাধারণ কলিতা যুবক, মধ্যে মধ্যে কেওট জাতীয় যুবতীকে হরণ করিয়া অথবা ভুলাইয়া লইয়া উপপত্নীভাবে গৃহে রাখিয়া থাকে এবং ইহার ফলে সে সমাজচ্যুত হইয়া 'কেওট' হইয়া যায়। যদি কোন কেওট যুবক, কোন কলিতা জাতীয় যুবতীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করে, তাহা হইলে সে আর জাতিচ্যুত হয় না—কেওটই থাকিয়া যায়। এই কলিতা-কন্যাকে বাধ্য হইয়া চির জীবনের জন্য পিতামাতার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হয়। কলিতা সমাজের কোন ব্যক্তি তাহার হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিলে সমাজচ্যুত হইয়া থাকে। এই সমাজচ্যুত ব্যক্তি ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব, স্মৃতিসর্ব্বস্ব সংগ্রহ, প্রায়শ্চিত্তক্রম ও রিপুঞ্জয় স্মৃতি এই চারিখানি শাস্ত্রগ্রন্থের যে কোন একখানির বিধান অনুসারে

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং কয়েকজন স্বজাতিকে ভোজন করাইয়া কলিতা সমাজভুক্ত হইয়া থাকে। আসামে উচ্চ-জাতির কন্যার সহিত নিম্ন-জাতির পুরুষের পরিণয়-ব্যাপার দূষণীয় নহে। উচ্চ-জাতির পুরুষ, নিম্ন-জাতির কন্যার পাণিপীড়ন করিলে ঐ কন্যার জাতি প্রাপ্ত এবং সমাজচ্যুত হন। মিষ্টার বি, সি, এলেন মহোদয় Lakhimpur Dt. Gazetteerএ [vol. viii পৃঃ ১১৭] সত্যই লিখিয়াছেন ঃ—An unmarried girl who becomes pregnant does not forfeit her position in the society, unless her lover is of lower caste."

শ্রীশ্রী৺দিনজয় সত্রের 'অধিকার মহন্ত' শ্রীশ্রীযুত হৃদয়ানন্দচন্দ্র গোসাঞী মহোদয় আহোমরাজপ্রদত্ত গৌরবজনক মটক শব্দটীকে অজ্ঞতাবশতঃ অগৌরবকর মনে করিয়া আপনাকে 'মতেক' [অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের এক মত] বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

মটক ও মতেক

মোয়ামরীয়া যুদ্ধের পর হইতে অসমীয়া হিন্দুরা, মায়ামরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোসাঞীদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশার্থ 'মটক' শব্দটী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কাজেই পরবর্ত্তী 'বুরঞ্জী' [ইতিহাস] লেখকগণ 'মটক' শব্দের ইচ্ছামত অর্থ লিখিয়াছেন। বিগত ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে আহোম ভাষাজ্ঞ রায় সাহেব শ্রীযুত গোলাপচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় যোড়হাটে লেখককে বলিয়া ছিলেন—"মটক, টাই ভাষার শব্দ। 'ম' অর্থে জ্ঞানী অথবা শক্তিশালী এবং 'টক' অর্থে পরীক্ষিত বুঝায়। মটকের অর্থ—পরীক্ষিত জ্ঞানী অথবা শক্তিশালী ব্যক্তি।" ১৯৩১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'বাতরি' পত্রিকায়ও আমরা তাঁহার এই উক্তির পোষকতা পাইয়াছি। মিষ্টার বি, সি, এলেন মহোদয় লখিমপুর জেলার অধিবাসী প্রসঙ্গে [Vol. viii, p. 126] লিখিয়াছেন—At the present day the Moamarias or the Mataks are cut off from communion with the other Vaishnavas of Assam. Men of all castes are

মটক কলিতা, ব্রাহ্মণ, আহোম

members of this sect, but a Matak Kalita, Brahman or Ahom cannot intermarry or eat with other Kalitas, or Ahoms; and the Matak members of each Brahman caste form an endogamous section in it."

বিগত ১৮৩৮ শকের ১৮ই পৌষ তারিখে লিখিত ৺বেঙ্গেনাআটীর স্বর্গীয় দেবানন্দ মহন্তের পত্র হইতে জানা গিয়াছে—"তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মুরারিদেব ও অনিরুদ্ধ ভূঞা একই বংশের লোক।" মহাপুরুষ শঙ্করদেব, অনিরুদ্ধদেবকে বর্জ্জন করিতে তাঁহার শিষ্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া "আদি চরিত" নামক পুথিতে উল্লেখ আছে। অনিরুদ্ধ দেবের নামে কলঙ্ক এবং দিহিঙের যদুমণির বংশের গৌরব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই এই পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক বিষয় লিখিত আছে, সেগুলির পোষকতা আসামের আর কোনও 'বুরঞ্জী'তে পাওয়া যায় না। যদুমণিদেব ও অনিরুদ্ধদেবের মধ্যে প্রগাঢ় সৌখ্য ছিল। এই যদুমণিদেবের বংশধর কৈবল্যনন্দদেব, আহোমরাজ বিরুদ্ধে মহাপুরুষ অনিরুদ্ধদেবের কয়েকজন বংশধরের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করাইয়া ছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ রাজসম্মান ও প্রভূত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনিরুদ্ধদেব ও তাঁহার বংশের কথা

[শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্দচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় ও ৺মদারখাট সত্রাধিকার মহন্ত ৺রমানন্দদেবের মধ্যে বহুকাল মনমালিন্য ছিল। পরে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলে মদারখাটের ঐ মহন্ত তাঁহার সহিত প্রীতিভাব স্থাপনে বাধ্য হন। লেখক ৺দিনজয় সত্রের উক্ত ধর্ম্মাচার্য্যের পত্নী ৺গৌরীবতী দেবীর দশাহ (পূরক পিণ্ড) ও মাসিক শ্রাদ্ধ পশুপতির পদ্ধতি অনুসারে রীতিমতভাবে সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন। ৺পুরণিমাটী-মায়ামরার বর্ত্তমান ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিগ্রহ স্মরণ করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। মহাপুরুষ গোপাল আতার প্রতিষ্ঠিত কোনও মহন্তের কিংবা অন্য কোনও সংহতির শিষ্যকে তদুপলক্ষে আগমন করিতে দেখা যায় নাই। কেবল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ও আর তিনজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ডিব্রুগড়ের জনৈক শিক্ষয়িত্রী শ্রীশ্রী৺দিনজয় সত্রে "পণ্ডিত বিদায়" লইতে আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও মায়ামরা-দিনজয় সত্রাধিকারের সামাজিক অবস্থা এইরূপ।]

শ্রীযুত বীরহরি দত্ত বড়ুয়ার নিকট আমরা শুনিয়াছি—"গৌহাটী অঞ্চলের কোন কোন স্থানে কখন কখন কলিতা ও বৈশ্য জাতির মধ্যে বিবাহ হয়।" ইহাতে কলিতা কিংবা বৈশ্যের নাকি জাতি যায় না। বিগত ১৯২৪ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে কামরূপের টীহু গ্রামে আমরা মান্যবর শ্রীযুক্ত ঘনকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বয়োবৃদ্ধ ও জাতিতে কলিতা। চৌধুরী মহাশয় বলেন—"উপর ও মধ্য-আসামের কলিতাদিগের গৃহে নিম্ন-আসামের কলিতাদিগের বিবাহের আদান-প্রদান পূর্ব্বে ছিল না এবং এখনও নাই। নিম্ন-আসামের কোন কলিতা-সেখানকার কলিতা-কন্যা গ্রহণ করিলে সমাজচ্যুত হইয়া থাকেন। বৈশ্য জাতির গৃহে আমাদের বিবাহ হয় না।" বড়নগরের চকাবাউসী গ্রামে মহাপুরুষ নারায়ণ দাস বা ঠাকুর আতার বংশধরগণ বর্ত্তমানে সত্র স্থাপনপূর্ব্বক বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের বিবাহ-প্রণালী নূতন ধরণের। তাঁহারা কলিতা-কন্যা বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহাদের কন্যাগণকে নাপিতদিগের গৃহে সম্প্রদান করিয়া থাকেন—কোন কলিতার সহিত বিবাহ দেন না।

ডোম-ব্রাহ্মণের ডোম-কন্যার পাণিগ্রহণ

আসামে ডোম জাতির ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 'অসবর্ণ-বিবাহ' প্রচলিত আছে। তাহারা ডোম-কন্যা বিবাহ করে, কিন্তু নিজ কন্যাকে ডোমের সহিত বিবাহ না দিয়া স্বজাতীয় লোকের সহিত বিবাহ দিয়া থাকে। ডোমের ব্রাহ্মণেরা যে সকল ডোম-কন্যাকে বিবাহ করে, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে ডোম-কর্ত্তৃক পাচিত অন্ন খাইতে দেওয়া হয় না। কেন না—তাহারা নিম্নবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণে গিয়াছে। আসাম দেশীয় ডোমেরা বঙ্গদেশীয় ডোমদিগের (৪) শ্রেণীভুক্ত নহে। আসামের ডোম জাতি

(৪) বঙ্গদেশীয় ডোম—ইহারা অনার্য্য ও অতি নীচ জাতি বলিয়া গণ্য। চণ্ডালদিগের ন্যায় গ্রামের প্রান্তভাগে ইহাদের বাসস্থান। আত্মীয় বা বন্ধুহীন মৃতের

'নদীয়াল' নামে পরিচিত। অধুনা কোন কোন স্থানের নদীয়ালরা আপনাদিগকে 'কৈবর্ত্ত' বলিয়া পরিচয় দিতেছে। যাহা হউক, ইহারা বঙ্গদেশের জালি কৈবর্ত্তবিশেষ—মৎস্য ধরিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। রায় বাহাদুর স্বর্গীয় গুণাভিরাম বড়ুয়া মহোদয়ের অনুমান মতে অসমীয়া ডোমেরা দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভুত। মিষ্টার বি, সি, এলেন বলেন *—"The Doms or as they prefer to call themselves Nadiyals, are the boating and fishing caste of Assam. * * * Marriage does not take place till the girl is fully grown, and they are free from any puritanical notions with regard to the relations between the sexes. Their priests are said to be descended from a Brahmin father and a Nadiyal mother, but for all practical purposes they are Nadiyals and intermarry with Nadiyal girls". এলেন মহোদয়ের এই উক্তি যে ধ্রুব সত্য, উপর-আসামে ও মধ্য-আসামে তদ্বিষয়ে আমরা বহু প্রমাণ পাইয়াছি।

শরণীয়া, সরু কোচ ও কোচ জাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ

আসাম অঞ্চলে কাছাড়ি নামে যে জাতি আছে, তাহারা মদ্য, শূকর, মোরগ প্রভৃতি হিন্দুর অখাদ্য খায়। এই জাতির যে সকল লোক এই সকল কদাচার পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে, অসমীয়া গোস্বামিগণ তাহাদিগকে 'শরণ' দান করেন। তাহারা 'শরণ' লইলে "শরণীয়া" নামে অভিহিত হয়। অন্য শ্রেণীর হিন্দুগণ এই শরণীয়াদিগের জল গ্রহণ করেন না। শরণীয়াদিগের দুই তিন পুরুষ

শববহন ও কাঁসিদান ইহাদের কার্য্য। স্যার এস, এম ইলিয়টের মতে ইহারা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী।

* Assam District Gazetteer, Vol. VIII, P. 121.

চলিয়া গেলে এবং হিন্দুদিগের মত তাহাদিগের আচার-ব্যবহার ও নিয়ম প্রণালী পাকা হইলে পর তাহাদিগকে সরু কোচ ও জল-আচরণীয় জাতির মধ্যে পরিগণিত করা হয়। গারো, মিকির প্রভৃতি জাতির লোকেরাও এই প্রকারে 'শরণীয়া' হইতে পারে। কায়স্থ জাতীয় মহাপুরুষ শঙ্করদেব সর্ব্বপ্রথম এইরূপ প্রথায় অ-হিন্দুদিগকে হিন্দু করেন। উপর-আসামের সত্রগুলির "অধিকার মহন্তদিগের" কৃপায় কাছাড়ী জাতীয় শিষ্যেরা এক্ষণে সদাচারী হইয়াছে। যাহা হউক, আসাম অঞ্চলে শরণীয়া জাতির গৃহে কোন শ্রেণীর হিন্দু-কন্যার বিবাহ হয় না। শরণীয়া সরু কোচেরা উন্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনেক সময় অর্থব্যয় করিয়া কোচ-কন্যার পাণিগ্রহণ করে। বিবাহের অন্তে এই কন্যার সহিত কোচদিগের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। কন্যার জাতি নষ্ট হইয়া যায়।

কোচবিহার রাজ্যে এবং রাজধানীর পশ্চিম দিকে ১৪ মাইল দূরে দীনহাটা মহকুমার মধ্যে "ভিতর কামতা" বা গোসানিমারী নামক গ্রামে বিগত ১৯১৩ সালে খেন বা ক্ষেণ রাজগণের পরিত্যক্ত বিশাল রাজধানীর এক ভগ্নাবশেষ আমরা দেখিয়াছি। এই বংশের প্রথম রাজা কান্তনাথ প্রথমে এক ব্রাহ্মণের গোচারণ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহার পিতার নাম ভক্তেশ্বর এবং মাতার নাম অঙ্গনা। প্রজাগণ কান্তনাথকে অরাজক পশ্চিম কামরূপের শূন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে তিনি নীলধ্বজ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম চক্রধ্বজ এবং পৌত্রের নাম নীলাম্বর।

কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ক্ষেণ জাতির অস্তিত্ব লোপ

কোচবিহার রাজ্যে 'সেন কুঙর' ও 'সিংহ কুঙর' উপাধিকারী যে অল্পসংখক ব্যক্তি বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা ঐ ক্ষেণ রাজবংশ-জাত কি না ঐতিহাসিকগণের গবেষণাসাপেক্ষ। কামরূপ ও গোয়াল-পাড়া অঞ্চলের ক্ষেণরা বহুস্থানে কলিতা, কোচ ও রাজবংশী জাতির

সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সমাজে মিশিয়া গিয়া তিনটী বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। আসামের সম্ভ্রান্ত ঘরের ছুটীয়া ও আহোম জাতির লোকেরা ও আপনাদিগকে রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দেন। উত্তর বঙ্গে আমরা ক্ষেণদিগকে পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই। ক্ষেণরা হলাকর্ষণ করেন। তাঁহাদের মহিলারা বসন্ত-কালে "তিস্তা বুড়ীর" পূজা করিয়া থাকেন। দেনধা উপাধিধারী পূজারী ব্যতীত তিস্তা বুড়ীর পূজা কিন্তু ঠিক হয় না—অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মতে—"ক্ষেণ জাতি কোচ, মেছ প্রভৃতি জাতির ন্যায় অনার্য্য ছিল।" ব্রাহ্মণদিগের উপর এই কামরূপী জাতির (Kamrupee tribe) রাজাদিগের বিশেষ আধিপত্য থাকায় তাঁহারা নিজ জাতিকে হিন্দু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্‌যোগে পশ্চিম কামরূপে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-দিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানের শিক্ষিত ক্ষেণরা বর্ত্তমানে 'ক্ষেণ' না লিখিয়া 'সেন' উপাধি লিখিতেছেন। কিন্তু সেন ও খেন একই জাতি নহে—কেবল উচ্চারণ ভেদে 'খেন' সেন হইয়াছে। অসমীয়া ভাষায় 'স' টী 'খ' রূপে উচ্চারিত হয়। অসমীয়ারা সেনের উচ্চারণ খেন করেন। কিন্তু কোচবিহারে 'সেন' উচ্চারণ হয়। Eastern Bengal Dt. Gazetteer (Vol, XI. P, 46) এ বলা হইয়াছে—"In Rangpur District the Khens or Khyans who number 12000 are also given a place among the Sudras. They are said to be the caste to which the Dynasty of king Nilamber belonged, who was overthrown by Hussain Shah. In Assam they are known as Kalitas." কেহ কেহ বলেন—"জাতির

আসামের ক্ষেণ জাতীয় লোকেরা কলিতা নামে পরিচিত হইয়াছেন

লইয়া কলিতাদিগের গৌরব করিবার কিছুই নাই। কেননা—নানা জাতির লোক লইয়া কলিতা জাতি গঠিত হইয়াছে।” কোন জনবহুল জাতির সম্বন্ধে এরূপ ভাবের কথা অশ্রদ্ধেয়। জাতি কাহাকে বলে?” আদিতে বৌদ্ধ থাকিলেই বা দোষ কি? বাঙ্গালা দেশের কায়স্থরা [এবং ব্রাহ্মণেরাও] কি? কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়েই শুধু এক জাতির লোক নহেন, পরন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারিবর্ণের লোকই বর্ত্তমান কায়স্থ জাতিতে রহিয়াছেন। লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস—কলিতারা আদিতে বৌদ্ধ ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে H. B. Baden Powell M. A, C. I. E. মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত Indian Village Community নামক পুস্তকেও [পৃঃ ১৩৪—৩৫] এ বিষয়ের পোষকতা পাওয়া যায়।

পরাশর গোত্রজ কায়স্থ ৺অনিরুদ্ধ ভূঁঞার প্রপিতামহ ৺হরিবর গিরি প্রতাপশালী 'ভূঞা' হইয়া লৌহিত্য নদের উত্তর পারে অবস্থিত নারায়ণপুর হইতে আধুনিক তিনসুকিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে—“ইনি কল্পতরু নামক যোগশাস্ত্র মতে মহামায়াকে পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট করেন ইঁহারই বংশধর অনিরুদ্ধ [ভূঞা] দেব ক্ষত্রোচিত অসিবৃত্তি ও রাজনীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অন্তিমকাল পর্য্যন্ত জাতি নির্ব্বিশেষে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। রায়সাহেব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় কৃত এবং আসাম-গৌরীপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার প্রভূত অর্থানুকূল্যে ১৯২৬ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত “Social History of Kamrup” (Pt. ii, p. 152)এ লিখিত হইয়াছে—অনিরুদ্ধ ও তাঁহার বংশধরেরা লখিমপুর ও শিবসাগর অঞ্চলের হাড়ী ও ডোম জাতীয় শিষ্য ভজাইবার

অনিরুদ্ধদেবের পরিচয়; তদীয় বংশধরের উপর অযথা অপবাদ

জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমাজভুক্ত ছিলেন, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং কলিতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।" শেষ কথাটী বসুজা মহোদয়ের সহকারীর কল্পনাপ্রসূত। ৺আউনীআটী, ৺দক্ষিণপাট ও ৺গড়মুড় সত্রের ধর্ম্মাচার্য্যগণের হাজার হাজার ডোম ও হাড়ী আদি অস্পৃশ্য জাতীয় শিষ্য আছে। এই ধর্ম্মাচার্য্যরা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। আসাম ও বঙ্গদেশে গুরুগিরি বা শিষ্য ভজানর প্রথা একরূপ নহে। অস্পৃশ্য জাতির শিষ্য ভজাইলে বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত প্রথা মত আসামে কোনও গোসাঞী-গুরুর জাতি নষ্ট হয় না।

৺মায়ামরার গোসাঞীদিগের বিবাহ-প্রসঙ্গ

মহাপুরুষ অনিরুদ্ধ ভূঞার বংশজাত ধর্ম্মাচার্য্যগণ আজিও 'উজনী' অঞ্চলের কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। এখানে প্রকৃত কায়স্থ-কন্যা দুষ্পাপ্য বলিয়া এখানকার কোন কোন কাথ মহাজন [কায়স্থ বলিয়া পরিচিত মহন্ত] কন্যাকে গৃহে আনাইয়া পুরোহিত দ্বারা শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তাঁহার অঙ্গশুদ্ধি করাইবার পর পাণিগ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে যে গুরুস্থানীয় ব্যক্তি কন্যাসহ আসিয়া থাকেন, তিনিই সম্প্রদান করেন। বরপক্ষ কন্যা-সম্প্রদানের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুরোহিত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এই পুরোহিত ঠাকুর, কামরূপীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত-দিগের মত অন্যের শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্ম করিতে পারেন না। যাহা হউক, উজনী অঞ্চলের কায়স্থ জাতীয় ধর্ম্মাচার্য্যদিগের এরূপ ভাবে বিবাহের পর তাঁহাদিগের স্ত্রীরা পিত্রালয়ে কাহারও পাচিত অন্নভোজন করিতে পারেন না এবং কচিৎ তাঁহাকে সেখানে যাইতে দেওয়া হয়। তাঁহাদের এই বিবাহ শ্রীহট্ট অঞ্চলের বহুস্থানের কায়স্থ, বৈদ্য ও সাহু—এই তিনটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত বিবাহের অনুরূপ। চট্টগ্রামের হাটহাজারি, রাউজান, উত্তর রাউজান প্রভৃতি স্থানে; ব্রাহ্মণবাড়ী মহকুমার মধ্যে কালিকচ্ছ ব্যতীত অন্যস্থানে; ঢাকার মহেশ্বরদি পরগণায়;

গত হৃদয়ানন্দচন্দ্র অধিকার গোস্বামী—শ্রীশ্রী৺দীনজয়-মায়ামরা সত্র

মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় কায়স্থ ও বৈদ্য মধ্যে আজিও [অর্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ] বিবাহের আদান-প্রদান আছে। ঐ সকল স্থান পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত হইলেও তত্রত্য কোনও কায়স্থপ্রধান স্থানে কায়স্থ ও বৈদ্যমধ্যে বিবাহের আদান-প্রদানের কথা শুনা যায় না। যোড়হাট নর্ম্মাল স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুত হরিনারায়ণ দত্ত-বরুয়া বিগত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে কায়স্থ-সমাজ নামক পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে, তিনি ৺বেঙ্গেনাআটীর সত্রাধিকারীকে উপর-আসামের কায়স্থ বলিয়া জানেন। দত্ত-বরুয়া মহাশয় কামরূপের "আর্য্য কায়স্থ সমাজ"ভুক্ত এবং বহুদিন হইতে আসামের নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। উক্ত অনিরুদ্ধ দেব এবং ৺বেঙ্গেনাআটীর সংস্থাপক একই বংশসম্ভূত। যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—প্রাচীন কামরূপ জনপদে উপনিবিষ্ট কায়স্থের বহু বংশধর তত্রত্য বিশাল কলিতা সমাজে এখনও মিশিয়া যান নাই এবং তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেছেন। চলিহা, ভুয়োরা আদি উপাধিধারী আধুনিক কলিতারা পূর্ব্বে কায়স্থ ছিলেন।

অনিরুদ্ধ দেব প্রতিষ্ঠিত ৺মায়ামরা সত্রের সপ্তম ধর্ম্মাচার্য্য অষ্টভুজ মহন্ত, আহোমরাজ লক্ষ্মীনাথ সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার

মটকের মহন্ত

পরবর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্য পীতাম্বর চন্দ্রের পুত্র ভজনানন্দ দেব যোড়হাটের অন্তর্গত মালৌ-পথার হইতে আসিয়া ডিব্রুগড় মহকুমার বগডুং মৌজার নপাম নামক স্থানে এবং দিনজয় নদীর তীরদেশে ৺দিনজয় নামে সত্র স্থাপন করেন। এই সত্রের বর্ত্তমান ধর্ম্মাচার্য্যের নাম শ্রীশ্রীযুত হৃদয়ানন্দচন্দ্র দেব। ইঁহারই পূর্ব্বপুরুষগণ [পীতাম্বরচন্দ্র, সপ্তভুজ বা গাগিনী বড় ডেকা এবং ভরত সিংহ] রাজ্যলোলুপ হইয়া কামরূপ জনপদের মহন্তগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হইলে কাহারও প্রাণবধ, কাহারও ধর্ম্মনষ্ট এবং কাহারও সত্রে অগ্নিসংযোগ আদি পাশবিক

অত্যাচার করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ জিঘাংসু মহন্তগণের বংশের লোকেরা নাকি মটক নামে অভিহিত। মটকরা উপর ও মধ্য-আসামের বহু হিন্দুর ঘৃণার পাত্র হইয়া আছেন এবং তাঁহাদের সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেছেন। উক্ত ৺পুরণিমাটী-মায়ামরা সত্রের কোনও ধর্ম্মাচার্য্য ঐ রাজবিদ্রোহী মহন্তদিগের সহিত যোগদান না করায় নিগ্রহীত হইয়াছিলেন এবং এখনও জ্ঞাতি সত্রের ধর্ম্মাচার্য্যসহ তাঁহাদের নিরতিশয় মনমালিন্য রহিয়াছে। ৺পুরণিমাটী-মায়ামরা সত্রের ধর্ম্মাচার্য্যকে এই হিসাবে মটক বলা যায় না। ৺দিনজয়, ৺গড়পারা ও ৺মদারখাট সত্রের প্রভুরা মটক হইলেও সদাচারী। ৺দিনজয় সত্রে অবস্থানকালে লেখক, শ্রীশ্রীযুত হৃদয়ানন্দচন্দ্র গোসাঞী প্রভুকে যুক্তি দিয়া ৺মদারখাট সত্র হইতে ৺চিদানন্দ গোসাঞী কৃত ৺মায়ামরা সত্রের গোসাঞী বংশের চরিত আনাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়—স্বার্থসিদ্ধির এবং গৌরবরদ্ধির জন্য এই চরিত পুঁথিখানির মধ্যে পরে বহু প্রক্ষিপ্ত পদ প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

বর্ত্তমান কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায় অত্যল্প সংখ্যক প্রকৃত কায়স্থ বসবাস করিতেছেন। ধুবড়ী অঞ্চলের রাঙ্গামাটীর প্রাচীন দাশবংশীয় কামরূপীয় কায়স্থ বুলচাঁদ বড়ুয়ার কন্যাকে কোচরাজ বংশীয় ৺খগেন্দ্রনারায়ণ নাজির দেও বিবাহ করিয়াছিলেন। মুনসী যদুনাথ ঘোষ কৃত "রাজোপাখ্যানে" এই বিবাহের উল্লেখ আছে। উক্ত বুলচাদের বংশধর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী [রাজোপাধি প্রাপ্ত] শ্রীযুত প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়কে গোয়ালপাড়া জেলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থগণ শিষ্টাচারবশতঃ 'সমাজপতি' বলিয়া স্বীকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। অসমীয়া অপেক্ষা বাঙ্গালীর সহিত গাঢ়তর ঘনিষ্ঠতার ফলে স্বজাতীয় সমাজ সত্বেও ইনিই কলিকাতায় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের গৃহে সর্ব্বপ্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ [অবশ্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া] হইয়াছেন।

রাঙ্গামাটির দাস বংশ তথা গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী বংশ
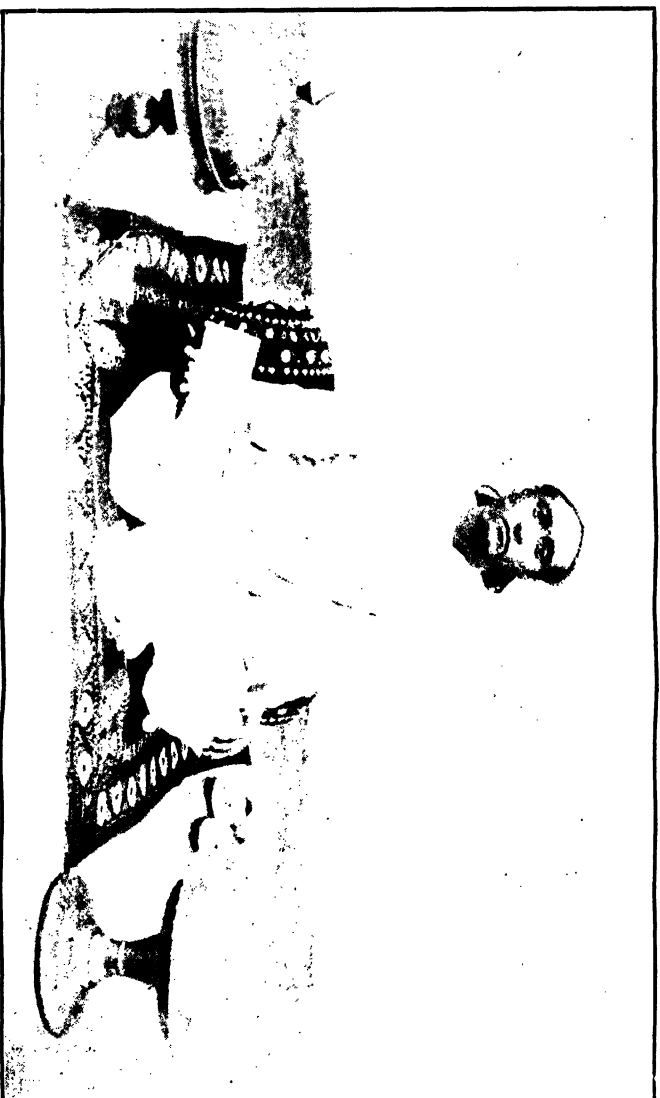
ধর্ম্মাসনে উপবিস্ট, শ্রীশ্রীউৎসবানন্দ অধিকার গোস্বামী—৺মায়ামরা পুরাণিমাটি সত্র

বিগত ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্ত্তিক তারিখে তদীয় বাটীতে আহুত "নিখিল গোয়ালপাড়া জেলা কায়স্থ সমিতি"র সভাপতির অভিভাষণের ৩৭শ পৃষ্ঠায় [১৫নং দফাতে] উল্লেখ ছিল ঃ—"কামরূপে কায়স্থ ও কলিতায় বিবাহ হয়, গোয়ালপাড়ায় তাহা হয় না।" কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গোয়ালপাড়া জেলার কোথায়ও কায়স্থদিগের জাতীয় সমাজ ছিল না। এই লেখকের পরামর্শে ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে উক্ত রাজা মহাশয় গৌরীপুরে কামরূপীয় কায়স্থদিগের একটী জাতীয় সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

নিম্ন-আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত মেছপাড়া ষ্টেটের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ আপনাদিগকে রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাসস্থান লক্ষ্মীপুরে। বংশপরিচয় প্রদানকালে তাঁহারা আপনাদিগকে থানা-কমললোচনের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এখানকার ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যে মামলা-মকদ্দামা (Title suit) হইয়াছিল তদুপলক্ষে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইচ্ছামত বংশতালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তবে ৺রণারাম চৌধুরী হইতে বংশতালিকা বর্ত্তমানে ঠিকই আছে। আমাদের অনুসন্ধান মতে—এই বংশের পূর্ব্বপুরুষের নাম থান সিং। ইঁহার পুত্রের নাম উমেদ সিং এবং পৌত্রের নাম কমললোচন সিং। সম্রাট আরাঙ্গজেব, [অম্বরপতি রাজারামের পুত্র] বিষণ সিংকে পার্ব্বত্য জাতি ও আহোমরাজকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কামরূপে পাঠাইয়া দেন। ধুবড়ীস্থিত শিখদিগের ধর্ম্মমন্দিরে রক্ষিত 'সোরথ পঞ্চম' পুঁথিতে ভট্টকবি অমরচাঁদ লিখিয়াছেন যে, তিনি ঐ সময় অম্বরাধিপতির সহিত ধুবড়ীতে আসিয়াছিলেন। উক্ত থান সিং ও তৎপুত্র উমেদ সিং যুদ্ধে বিষণ সিংকে সাহায্য করায় জায়গীর স্বরূপ

মেছপাড়া ষ্টেটের ভূম্যধিকারী বংশ

দক্ষিণকুল সরকার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। মেছপাড়া ষ্টেটের ভূম্যধিকারিগণের কন্যাগ্রহণ ও কন্যাপ্রদানের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায় তাঁহারা বিভিন্ন বর্ণে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাদিগের জাতি নষ্ট হয় না! গোয়ালপাড়া জেলার দশকর্ম্মান্বিত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মেছপাড়ার ভূম্যধিকারীদিগের অনুগ্রহভাজন হওয়ায়, তাঁহারা উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের সমতুল্য সামাজিক মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। মেছপাড়ার ৺খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির, শ্রীযুত নগেন্দ্রনারায়ণের, শ্রীযুত প্রভাত-চন্দ্রের, মিঃ এস, এন, চৌধুরীর * (Bar-at-law), ৺রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর (Bar-at-law) ৺জিতেন্দ্রনারায়ণের, শ্রীযুত যতীন্দ্র-নারায়ণের এবং শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ চৌধুরির * এবং কন্যাগণের মধ্যে শ্রীমতী সরজুবালা দেবীর, ৺বনলতা দেবীর [সিদলির রাজা শ্রীযুত অভয়নারায়ণ দেব সহ], শ্রীমতী গিরিবালার, ৺শরৎকুমারীর, শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর, শ্রীমতী অশ্রুমতীর, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির এক ভগিনীর [কোচবিহারে], শ্রীমতী সুচারুর [শ্রীহট্টে] এবং শ্রীমতী সুরুচির বিবাহ স্বজাতীয় সমাজে নিষ্পন্ন হয় নাই।

উপসংহার—এই প্রবন্ধটীর নাম "অসবর্ণ বিবাহ" হওয়া সঙ্গত নহে। কারণ—নাম, জাতি এক শব্দ বা একার্থ শব্দ নহে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ লেখাই সঙ্গত। সপ্তম অধ্যায়ে যে সকল জাতির আচারের বিষয় লেখা হইল, তাহাদের মধ্যে ডোমের ব্রাহ্মণের পক্ষে [পৃঃ১২৭] কেবল ডোমের কন্যাকে বিবাহ করাকেই অসবর্ণ বিবাহ বলে। উৎকৃষ্ট রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত হাড়ির বামুণের কন্যার বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ নহে। যেহেতু, উভয়ের বর্ণ এক—উভয়েই ব্রাহ্মণ। ক্ষেণ, কলিতা, কোচ, কৈবর্ত্ত, তিলি, মালি, ধোপা প্রভৃতির পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান অসবর্ণ বিবাহ নহে। কেননা, উহাদের বর্ণ এক—শূদ্র।

শ্রীহট্টে অসবর্ণ বিবাহ

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের মধ্যে বর্ত্তমানে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ জাতিত্বের দাবী করিতেছেন। রাজা রাজবল্লভের আমোল হইতে আবার কতক অংশ অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করত বৈশ্যোচিত আচার পালন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—"স্মৃতি সংহিতা ও অমরকোষে অম্বষ্ঠেরা বৈশ্যমাতৃক জাতি বলিয়া বর্ণিত থাকিলেও হিন্দুসমাজের অতি প্রামাণিক ও পূজ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, পুরাণ ও বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে এই অম্বষ্ঠ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ আছে।" বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেহার এবং যুক্ত প্রদেশে বারো শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে অম্বষ্ঠ একটী শ্রেণী এবং তাঁহাদের অনেকেরই ব্যবসায় 'চিকিৎসা' [both Phisician and Surgeon] রহিয়াছে। মুঙ্গের এবং গয়া জেলায় যত কায়স্থ আছেন, তাহার অন্ততঃ দশ আনা এই অম্বষ্ঠ মহাশয়েরা। কায়স্থের প্রাচীন কুলগ্রন্থে ও বৈদ্যদিগের চন্দ্রপ্রভায় যে সকল ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে, সে গুলির দ্বারা এই উভয় জাতির মধ্যে বহু সম্বন্ধের পরিচয় নাকি বহুলভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের মতে—"বৈদ্য ও কায়স্থ অভিন্ন জাতি।"

বৈদ্য জাতি ও তাঁহাদের সামাজিক আচার

১১৮ পৃষ্ঠায় আমরা বৈদ্য জাতির কুলগ্রন্থ 'চন্দ্রাপ্রভা'র কথা বলিয়াছি। শ্রীহট্ট অঞ্চলে বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। ইহার কারণ—আসামের শ্রীহট্ট অঞ্চল বৈদ্য ও কায়স্থদিগের প্রাচীন বাসভূমি নহে। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তথায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং

বৈদ্য ও কায়স্থ অভিন্ন জাতি

তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ স্বজাতীয় কন্যার অভাবে পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান করিতে বাধ্য হন। পশ্চিমবঙ্গে এই দুই জাতির মধ্যে বিবাহ হওয়া দূরের কথা—এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন পর্য্যন্ত করেন না। কিন্তু জাতিত্ব হিসাবে শ্রীহট্টে বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবের সম্বন্ধ আমরা [লেখক] দেখিতে পাই। পশ্চিম-বঙ্গের বৈদ্যরা উপবীতধারী। পনর দিনে তাঁহাদের অশৌচ অন্ত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বৈদ্যের উপবীত নাই এবং তাঁহারা মাসাশৌচী। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্টের বৈদ্যগণ অনুপনীত। তাঁহাদের অশৌচকাল একমাস। পশ্চিম-বঙ্গের বৈদ্যগণ পূর্ব্ব-বঙ্গের বৈদ্যদিগের সহিত বৈবাহিক কার্য্য করেন না। ত্রিপুরাদি স্থানের বৈদ্যরা অন্যজাতির সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাচীন বাসীন্দা বৈদ্য জাতি নাই—কাছাড় অঞ্চলেও তদ্রূপ।

শ্রীহট্টের সাহু জাতি

প্রায় সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে—[বাদসাহ হুমায়নের রাজত্ব-কালে]—ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের মন্ত্রী উমানন্দ ও 'পাত্র' দেবানন্দ বৈদ্যকুলোদ্ভব এই দুই ব্যক্তি ও কয়েকজন কায়স্থ 'সাহা বণিক'সংসৃষ্ট এক সামাজিক ঘটনাবশতঃ রাজা কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও সমাজ-দণ্ডিত হইয়া পৃথক্ হইয়া থাকেন। কালব্যবধানে মূল বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ হইতে বর্জ্জিত দলের লোকেরা 'সাহু' নামে পরিচিত হন। আমরা এ বিষয়ে পরে বলিব। শ্রীহট্টে কায়স্থ ও সাহু মধ্যে পরবর্ত্তীকালে সামাজিক দলাদলি কিরূপ পাকিয়া উঠিয়া ছিল তৎসম্বন্ধে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে লেখককে বলিয়াছিলেন—"সাহু এবং শুঁড়ী মূলত একই জাতি নহে। বাল্যকালে আমি দেখিয়াছি, কায়স্থরা সাহুদিগকে হুঁকা দিতেন না। কোন সম্ভ্রান্ত সাহুও কায়স্থের হুঁকা ব্যবহার করিতে

সাহস করিতেন না। যদি কোন ধনাঢ্য সাহু কোন কায়স্থ কন্যার পাণি-পীড়ন করিতেন, তাহা হইলে সেই কন্যা আর কখনও পিত্রালয়ে যাইতে পারিত না—যাইলে তাহার পিতা জাতিচ্যুত হইতেন।"

রায় সাহেব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-কৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে (পৃঃ ৩৪১) আমরা দেখিতে পাই—"সাহু জাতি, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ হইতে পুত্র, কন্যা লইয়া যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন তাহা নহে, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় অনেক ব্যাক্তি এই সমাজে মিশিয়াও পড়িয়াছেন। এই সমাজের সেন, মজুমদার, সোম, পুরকায়স্থ প্রভৃতি উপাধি বৈদ্য ও কায়স্থ বংশব্যঞ্জক। কিন্তু মূল কায়স্থ বা বৈদ্য সমাজের সহিত এই সাহু সমাজের কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই।" লেখকের অনুসন্ধান মতে—বসুজা মহাশয়ের এই উক্তি ধ্রুব সত্য। কায়স্থ কন্যার সহিত কশ্চিৎ সাহু পুত্রের যে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা বরাবাহন-বিবাহ নহে। এরূপ বিবাহস্থলে সমাজের অগোচরে কন্যাকে বরের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ঐ কন্যা চিরদিনের জন্য সেখানে থাকিয়া যায়—পিত্রালয়ে আর আসিতে পারে না। দুঃস্থ ব্যতীত সম্পন্ন ঘরের কোন কায়স্থ কন্যার বিবাহ, সাহু জাতির গৃহে হয় না। এই বিবাহ সামাজিক বিবাহ নহে। ইহা সমাজের অগোচরে ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচার অথবা দুঃস্থ ব্যক্তির অর্থকৃচ্ছ্রতা কিংবা অর্থলুব্ধ ব্যক্তির অর্থ প্রাপ্তির ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে মাত্র।

প্রতাপান্বিত রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যদিগকে 'অম্বষ্ঠ' আখ্যা দিয়া শূদ্রাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈশ্যাচার গ্রহণ করেন। এখনও (অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে) পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক বৈদ্য শূদ্রাচারী আছেন—তাঁহারা বৈশ্যাচার গ্রহণ করেন নাই; অথচ উপবীতী ও অনুপবীতী বৈদ্যদিগের মধ্যে এখনও বৈবাহিক আদান-প্রদান ও আহার-বিহার চলিতেছে। রাজা রাজবল্লভের পূর্ব্বে

রাজা রাজবল্লভের বৈশ্যাচার গ্রহণ

কোন বৈদ্যের পৈতা ছিল না। বৈদ্যরা যদি অম্বষ্ঠ জাতির হইতেন, রাজা রাজবল্লভের আমলে তাঁহাদের আচার ও অশৌচের পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়াছিল কেন? তবে কি বৈদ্যরা সঙ্কর জাতি? শ্রীযুত ভূপতি কাব্যতীর্থ মহাশয় কথা প্রসঙ্গে লেখককে বলিয়াছিলেন—

বৈদ্যেরা কোন জাতি? কায়স্থ ক্ষত্রিয় না মৌলিক জাতি?

"তাঁহারা উচ্চ বর্ণের মিশ্রণজনিত সঙ্কর জাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন।" পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩ ও ১৬৪ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে, কায়স্থ 'মৌলিক জাতি'—ক্ষত্রিয় বা শূদ্র নহেন। এই পুরাণের মতে কায়স্থ ব্রহ্মকায়োদ্ভব। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ভূপতি কাব্যতীর্থ ও ৺গীস্পতি কাব্যতীর্থ কায়স্থকে মৌলিক জাতি ব্যতীত শূদ্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা কায়স্থ পত্রিকার মারফতে ও কতিপয় সভা সমিতিতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের শূদ্রত্ব খণ্ডন করিয়াছেন এবং দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—"কায়স্থ" ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত নহেন। কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের মতে কায়স্থের উপবীত গ্রহণ শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। আমরা জানি—কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থিত কায়স্থের উপবীত গ্রহণের কয়েকজন প্রধান ও আদি ব্যবস্থাপক উহা কদাচ গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালী কায়স্থগণের কুলশাস্ত্রের আদিশূর রাজাও "অম্বষ্ঠ শ্রেণীর কায়স্থ" বলিয়াই কথিত হইয়াছেন এবং যাহা হইতে শূর এবং সেন বংশের রাজাদের জাতি [ক্ষত্রিয়, কায়স্থ না বৈদ্য] লইয়া কতই মারামারি চলিতেছে। বেহারে আমাঠ নামক একটী জলাচরণীয় জাতি আছে। ইহারাই বা কে? আমরা বৈদ্য জাতিকে অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠ কায়স্থ এবং বৈদ্য এই তিন মূর্ত্তিতে দেখিলাম। বামুনের বেশে কোন বৈদ্যকে কখনও ভারতীয় সমাজে দেখা যায় নাই। বোম্বাই প্রদেশের কায়স্থরা হৈহয় সহস্রার্জ্জুনের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। ইহা হইতে কায়স্থ জাতির প্রাচীনত্ব অবগত হওয়া যায়।

সেন বংশীয় কোন রাজার নিকট বৈদ্য জাতীয় কোন ব্যক্তি কোন প্রকার কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের সময়ে কোন তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে কিংবা কুলগ্রন্থে বৈদ্য জাতির কুলবন্ধনের নাম-গন্ধও নাই। বৈদ্য জাতির মর্য্যাদা আমরা আধুনিক মনে করি। ৺রামকান্ত দাস "পঞ্চসপ্ত তিথৌ শাকে" (১৫৭৫ শকে) 'কণ্ঠহার' নামক বৈদ্যকুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। তখনও বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠ মর্য্যাদা গ্রহণের সাধ হয় নাই। ১৫৯৭ শকে ভরত মল্লিক 'চন্দ্রপ্রভা' নাম্নী কুলপঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া বৈদ্য জাতির প্রথম মর্য্যাদা অম্বষ্ঠ (৬) খ্যাতি প্রচার করেন। চন্দ্রপ্রভার ৮০ বৎসর পরে প্রবল প্রতাপ রাজা রাজবল্লভ সর্ব্বপ্রথম বৈদ্য-সমাজে বৈশ্যাচার প্রবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হন। বঙ্গদেশে বৈদ্য জাতির দ্বিজত্ব স্থাপনে তাঁহার অন্যূন দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যাহা হউক, বৈদ্যরা আধুনিক জাতি নহে, পুরাণ, সংহিতাদিতে ইহাঁর উল্লেখ আছে।

বৈদ্য জাতির কুলমর্য্যাদা।

শ্রীহট্টের বৈদ্যগণ এখনও (অর্থাৎ—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) উপবীত ধারণ করেন নাই। তাঁহারা অনুপবীত কায়স্থের ন্যায় মাসাশৌচ পালন করিতেছেন। এই অঞ্চলে প্রাচীন কালাবধি বৈদ্য, কায়স্থের এবং কায়স্থ, বৈদ্যের পাচিত অন্ন এখনও প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গের বৈদ্যরা আপনাদিগকে বৈশ্য জাতি বলিয়া স্বজাতির মধ্যে বহু আন্দোলন করত গা ঝাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া সম্প্রতি শ্রীহট্ট অঞ্চলের কয়েকটী স্থানের বৈদ্যরা তাঁহাদেরই অনুকরণে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। লেখকের অনুসন্ধান মতে—শ্রীহট্টের বৈদ্যরা সংখ্যায় প্রায় চারি হাজার।

(৬) অম্বষ্ঠ—মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে লিখিত আছে—"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্রই অম্বষ্ঠ।

সাহু প্রসঙ্গ = শ্রীহট্ট জেলার সদর, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্ট— এই মহকুমাত্রয়ে কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহু জাতির বাস। হবিগঞ্জ ও

সাহু জাতির বাস ও সাহা বণিকের সাহু-কন্যা গ্রহণ

সুনামগঞ্জে এই তিন জাতির লোকেরা সংখ্যায় অল্প। শ্রীহট্ট অঞ্চলে যে সকল সাহা বণিক (শুঁড়ী) আছেন, তাঁহারা ইঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কাছাড় অঞ্চলে অল্পসংখ্যক কায়স্থ ও সাহু আছেন। শ্রীহট্টের সাহুরা কাছাড়ের সাহুদিগের গৃহে বিবাহের আদান-প্রদান কিংবা খাওয়া-দাওয়া করেন না। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে সাহু ও সাহা বণিকদিগের মধ্যে বিবাহের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ধনাঢ্য সাহুরা বহু দিন হইতে যেমন অর্থ বিনিময়ে অবস্থাহীন কায়স্থ কন্যা গ্রহণ করিতেছেন, সঙ্গতিপন্ন সাহা বণিকেরাও তদ্রূপভাবে অস্বচ্ছল ঘরের সাহু-কন্যাকে বধূরূপে বরণ করিতেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য— উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ও কামরূপের সাহাদের জল অচল নহে।

শ্রীহট্টের সাহু সম্প্রদায়

নবম অধ্যায়

[১]

বৈদ্য বংশীয় মন্ত্রী উমানন্দ ও পাত্র দেবানন্দ, উত্তর-পশ্চিম দেশাগত (?) দেওয়ান আনন্দনারায়ণ এবং কায়স্থ জাতীয় নারায়ণ মণ্ডল ও গোবিন্দ পুরকায়স্থ—এই পাঁচজন প্রধান ব্যক্তি ও অপর অপর ব্যক্তিরা সাহা বণিক (শুঁড়ী) সংশ্লিষ্ট এক সামাজিক ঘটনার পর পৃথক্ হইয়া বসবাস করিতে থাকিলে আধুনিক দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলবি-বাজার) মহকুমার অন্তর্গত কাছাড়ীগ্রাম নিবাসী পরাশর গোত্রজ

রাজপণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ শর্ম্মা তাঁহাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্পাদনার্থ পুরোহিত বৃত হন। এজন্য তাঁহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহু জাতির বিবরণ অধুনা বিস্মৃত হইতে চলিয়াছে এবং এইজন্যই অনেকে—[বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা]—ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানের সাহা বণিক (শুঁড়ী) জাতির সহিত ইঁহাদিগকে একই শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে কাহারও এ ভ্রম না হউক, ইহাই লেখকের ইচ্ছা। শ্রীহট্টে 'সাহা বণিক' সংশ্লিষ্ট সামাজিক ঘটনার বিবরণ দ্বিতীয় দফায় উল্লেখ করা হইল।

লেখকের ইচ্ছা

[২]

ঢাকাবাসী বৈদ্য বংশীয় শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাসগুপ্ত ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে "শ্রীহট্টের ইতিহাস" নাম দিয়া এক ক্ষুদ্র আকার (৮ পেজি ডিমাই ফর্ম্মার ২৮ পৃষ্ঠা) বিশিষ্ট প্রবন্ধ পুস্তিকা-কারে ছাপাইয়া ছিলেন। এই প্রবন্ধটি "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক দিবস ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের মন্ত্রী উমানন্দ সহচরবর্গসহ সাগরদীঘির তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তৎসময়ে একজন ব্রাহ্মণ দীঘির অপর পাড়ে কয়েকজন 'সাহা'কে তর্পণের মন্ত্র পাঠ করাইতেছিলেন। দীঘির পাড়ে অনেকগুলি লোক সমবেত দেখিয়া মন্ত্রী সেই স্থানে গমন করেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ অশুদ্ধ হওয়াতে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণকে শুদ্ধরূপে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ শুদ্ধরূপে মন্ত্রপাঠ করিতে অসমর্থ হওয়ায় মন্ত্রীর অনুরোধে সঙ্গীয় রাজপণ্ডিত 'সাহা'-দিগকে মন্ত্র পাঠ করান। তদনন্তর মন্ত্রী ও পণ্ডিতগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জনসাধারণ সাহাদিগকে মন্ত্রপাঠ করান অপরাধে তাঁহাদিগকে

সাহা বণিক সংশ্লিষ্ট সামাজিক ঘটনা

সমাজচ্যুত করেন। রাজা সুবিদনারায়ণও প্রজারঞ্জন মানসে তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন। মন্ত্রী উমানন্দ ও পণ্ডিতগণ, সাহাগণের সহিত মিলিত না হইয়া একটী স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। এই সমাজ সাহু অর্থাৎ সাধু বলিয়া আখ্যাত হয়। শ্রীহট্টস্থ রাজা গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর এই সাহু বংশসম্ভূত একজন অতি উদারচেতা, ধর্ম্মভীরু, স্বজনপ্রিয় ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি। ইঁহার দয়াদাক্ষিণ্য গুণে তদধীনস্থ দীনদরিদ্র প্রজাগণ সর্ব্বদা সুখে শান্তিতে কালযাপন করিতেছেন।"

লেখকের মন্তব্য

এই বিবরণটী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে বর্ণিত বিবরণসহ প্রায় ঐক্য আছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের বিবরণটী প্রাচীন 'কুলাঞ্জলী' নামক হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণ অবলম্বনে লিখিত। তাহাতে ইটার রাজাই বিচারক ছিলেন। ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। শ্রীহট্টীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ "বৈদিক নির্ণয়"এ উল্লেখ আছে যে, ইটার রাজা সমাজপতি ছিলেন। প্রমাণ যথা:—"জাতঃ সুবুদ্ধি শুদ্ধশ্চ রাজা পরম ধার্ম্মিকঃ। দুষ্টানাং দমনশ্চৈব শিষ্টানাং পরিপালকঃ।" এবং 'সর্ব্বান দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সমাজ বন্ধনং কৃতং।" যাহা হউক, দাসগুপ্ত মহাশয়ের এই পুস্তিকায় 'প্রজারঞ্জন' জন্য মন্ত্রী প্রভৃতির পদচ্যুতি লিখিত আছে। এই পুস্তিকা শ্রীহট্টের সুপ্রচারিত প্রাচীন জনশ্রুতি মূলে লিখিত বলিয়াই বোধ হয় এবং সেইজন্যই শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের সহিত সামান্য প্রভেদ।

[৩]

উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে শ্রীহট্টে আগত আনন্দনারায়ণের কথা আমরা ১৪২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। শুনা যায়—ইনি না কি বৈদ্য বংশীয় ছিলেন।

মুসলমান অধীনে শ্রীহট্টে দেওয়ান আনন্দনারায়ণ

সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট দেশ গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। দরবেশ শাহজলালের সময় হইতে এই দেশ প্রকৃত

পক্ষে দিল্লীর বাদশাহের অধীনে আসে। শ্রীহট্ট সীমান্ত দেশ বলিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে সেখানে প্রেরণ করা হইত। শাসন বিভাগে একজন প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। রাজস্ব বিভাগে যিনি নিযুক্ত হইতেন, তাঁহার উপাধি ছিল দেওয়ান। উত্তর পশ্চিম দেশে অবস্থানকালে আনন্দনারায়ণ দিল্লীশ্বরের দেওয়ান হইয়া শ্রীহট্ট সহরে আগমন করেন। তৎকালে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন ইউসুফ খাঁ বাহাদুর। আনন্দনারায়ণের উপাধি ছিল 'রায়'। এই খেতাব বর্ত্তমানের 'রায়' ও 'রায় বাহাদুর' এর মত ছিল না। তৎকালে 'রায়'দিগকে সহস্র সৈন্যের—[তন্মধ্যে পাঁচশত অশ্বারোহী]—এবং 'রায় বাহাদুর'দিগকে তিন সহস্র সৈন্যের—[তন্মধ্যে দুইশত অশ্বারোহী] —অধিপতির মর্য্যাদা দেওয়া হইত। দেওয়ান আনন্দনারায়ণ রাজ-প্রদত্ত এইরূপ মর্য্যাদাপন্ন ছিলেন। তাঁহার সময়ে উত্তর শ্রীহট্ট, দক্ষিণ শ্রীহট্ট ইত্যাদি বিভাগ ছিল না। সাহা বণিক সংশ্লিষ্ট এক বিবাদ

দেওয়ানের পদ্মিনী কন্যা গ্রহণ

মূলে বৈদ্য-সমাজভ্রষ্ট সেন বংশীয়া এক পদ্মিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীহট্টে বস-বাস করেন। তদ্‌বংশে সৎকায়স্থ ও বৈদ্য কন্যা সংগ্রহ করিয়া বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হইত। সেই বংশে দেওয়ান মুক্তারাম ও

আনন্দনারায়ণের বংশধরগণ

তৎপুত্র মাণিকচাঁদের উদ্ভব। আনন্দনারায়ণ হইতে মাণিকচাঁদ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণ উত্তরাধিক্রমে মুসলমান অধীনে শ্রীহট্টের 'দেওয়ান' অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ সাহের সময়ে ১৭৪৫ খ্রীঃ অব্দে যুবক মাণিকচাঁদ দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট-কলেক্টরীর কাগজ-পত্রে উল্লেখ আছে যে, ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে তিনি শ্রীহট্টের আদি ইংরাজ শাসনকর্ত্তা (Resident) মিষ্টার হলাণ্ডকে 'চার্জ্জ' (charge) বুঝাইয়া দিয়া ঢাকায় চলিয়া যান। ইহা

হইতে বুঝা যায়, মাণিকচাঁদ দীর্ঘজীবী ছিলেন। দেওয়ান মাণিক-চাঁদের বংশধর মুরারীচাঁদ রায়ও বৈদ্যমূল 'সাহু' জাতীয় ছিলেন। 'বাবু' তাঁহার খ্যাতি ছিল। সমগ্র শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে 'বাবু' বলিলে কেবল তাঁহাকেই বুঝাইত। স্বর্গীয় রাজা গিরিশচন্দ্র আদিতে বৈদ্য-পুত্র ছিলেন। 'বাবু'র পুত্রাদি ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা কমলা দাসীর সহিত জনৈক কায়স্থের বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। কমলা দাসী, দীপচন্দ্র নন্দী চৌধুরীর পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র ব্রজগোবিন্দকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম রাখেন গিরিশচন্দ্র। রাজা গিরিশচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে মুরারীচাঁদ কলেজ স্থাপন করেন। দ্বিতীয় দফায় বিবৃত বিষয় মধ্যে তাঁহার যে সকল গুণগ্রামের উল্লেখ আছে, সেগুলি সঠিক বলিয়া আমরা (লেখক) অনুসন্ধানান্তে অবগত হইয়াছি। রাজা গিরিশচন্দ্র সাহু সংজ্ঞা হীনতার পরিচায়ক জ্ঞানে কাগজ-পত্রে কখনও আপনাকে 'সাহু' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ইঁহার পুত্র কুমার শ্রীযুত গোপিকা-রমণ রায়ও আপনাকে 'সাহু' বলিতে হীনতা বোধ করেন।

[৪]

সুবিদনারায়ণের পতন ও সাহু-সমাজ গঠন

পূর্ব্বোক্ত উমানন্দ, দেবানন্দ আদি ব্যক্তিগণ সাগরদীঘিতে পূর্ব্বোক্ত তর্পণের মন্ত্র উপলক্ষে যোগদান হেতু রাজসমীপে দোষ স্বীকার না করায় রাজ আজ্ঞায় তাঁহারা নিজ নিজ সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিলে, আধুনিক দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলভিবাজার) মহকুমার অন্তর্গত কাছাড়ী গ্রামবাসী পরাশর গোত্রজ রাজপণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ শর্ম্মা তাঁহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পাদনার্থ পুরোহিত বৃত হন। অতঃপর বৈদ্যকুলোদ্ভব (?) দেওয়ান আনন্দনারায়ণ ঐ সমাজ-ভ্রষ্ট দলের সেনবংশীয় (বৈদ্য বংশীয়) পদ্মিনী-কন্যার পাণিগ্রহণে কৃত-সংকল্পের কথা রাজা সুবিদনারায়ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে

এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। দেওয়ান মূল ঘটনা অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করায় রাজা তাঁহাকে সমাজচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ মনান্তর হয়। দেওয়ান তখন সমাজ-দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে অভয় দেন এবং দিল্লীতে গিয়া রাজা সুবিদনারায়ণের বিরুদ্ধে রাজস্ব আদায়ক্রমে তাঁহার সমস্ত আত্মসাৎ, সৈন্যবৃদ্ধি—ইত্যাদি অভিযোগ করেন। তাহা শুনিয়া দিল্লীশ্বর, সুবিদনারায়ণকে দমন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ইউসুফ খাঁ বাহাদুরের সহিত পরামর্শ করিতে আদেশ দেন। ইহার কিছুদিন পরে দেওয়ানের পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় 'রাজ্যপরিদর্শক' পাঠান বংশোদ্ভব খোয়াজ ওসমান খাঁ একটী অছিলা করিয়া রাজা সুবিদনারায়ণের 'ইটা' রাজ্য ধ্বংস করেন। যাহা হউক, দেওয়ান আনন্দনারায়ণ স্বজাতীয় সমাজভ্রষ্ট হইয়া ঐ সমাজচ্যুত ব্যক্তিগণের দলভুক্ত হন। তিনি ও উক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না—'সাহু' বলিয়াই কালব্যবধানে পরিচিত হইলেন। দেওয়ানের আনুকূল্যে শ্রীহট্টে সাহু-সমাজ গঠিত হইল। ঐ সমাজের লোকেরা আজিও কায়স্থ ও বৈদ্যের ন্যায় লেখ্যবৃত্তি অব্যাহত রাখিয়াছেন।

[৫]

শ্রীহট্ট অঞ্চলের সাহু মাত্রেরই পূর্ব্বপুরুষ কায়স্থ বা বৈদ্য-মূল সাহু নহেন। বহুসংখ্যক কায়স্থ ও বৈদ্য, সাহু-কন্যা গ্রহণ করিয়া সাহু সমাজভুক্ত হইয়াছেন। কানাই বাজারের নিকটস্থ মৈনা নিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুত অচ্যুত-চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহোদয় বাঙ্গালা ও আসামের বিদ্বৎ-সমাজে সবিশেষ পরিচিত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ দেবোপাধি কায়স্থ জাতীয়

সাহু মাত্রেরই পূর্ব্ব-পুরুষ কায়স্থ বা বৈদ্য-মূল সাহু নহেন

৺মাছুরাম দেব উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত ঘিলাছড়া পরগণার পাটোয়ারী ছিলেন। ইঁহার ঔরসে ও দময়ন্তী দেবীর গর্ভে বিনন্দরাম দেবের জন্ম হয়। বিনন্দরাম সারদাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার চারি পুত্র। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ হারদাস দেব ভ্রাতৃবিরোধ বশতঃ ১১০৩ সনে ঘিলাছড়াস্থ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া জফরগড় পরগণায় আসেন এবং এই পরগণার অন্তর্গত মৈনা গ্রামে লহনা নাম্নী কায়স্থ-মূল একটী সাহু-কন্যাকে বিবাহ করেন। জাফরগড়ের পার্শ্বেই প্রতাপগড় পরগণা। এই পরগণায় তিনি ভাগী (নামান্তর ভাগীরথী) নাম্নী জনৈক বিশুদ্ধ কায়স্থ-কন্যাকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই বিবাহে তাঁহার চারি পুত্র জাত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিন পুত্র পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র কানুরাম দেব

কানুরাম দেব ও মহাত্মা শান্তিরাম ঠাকুর

শ্রীহট্টের পানিশালী পরগণাস্থিত পানিশালী নামক বিখ্যাত আখড়ায় বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণব স্মৃতি ও ভক্তিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ভূষিত শান্তিরাম ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই মহাপুরুষের প্রভাবে শ্রীহট্টের তদানীন্তন নবাব হাজি হুসেন খাঁ বাহাদুর এক সনন্দে (নং ১০৬৪) ইঁহার পূজিত দেবতার নামে শ্রীহট্টের রয়ালজোর পরগণা হইতে ১।০৮৩ ভূমিদান করেন। শ্রীহট্টের অপর নবাব হরকিষুণ দাস মসস্থর উলমূলক আর এক সনন্দে (নং ১১০৫) শ্রীহট্টান্তর্গত ঢাকাউত্তর পরগণা হইতে তাঁহাকে ৬৷৲১॥ ভূমিদান করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ শান্তিরাম ঠাকুর ১১৯৩ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ কেহ সাহু ছিলেন না। ইঁহার প্রপিতামহ উক্ত হরিদাস দেবের প্রথমা স্ত্রী কায়স্থ-মূল সাহু জাতীয়া ছিলেন। সাহু-কন্যা গ্রহণ হেতু কায়স্থ হরিদাসের বংশধরগণ—[তথা মৈনার বর্ত্তমান চৌধুরী বংশ] —সাহু নামে পরিচিত হইয়াছেন।

[৬]

কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহু সম্প্রদায়েরই উমানন্দ (মন্ত্রী), পাত্র দেবানন্দ, তহশীল কর্ম্মচারী নারায়ণ মণ্ডল ও প্রধান লেখক গোবিন্দ পুরকাইত—

তিন বংশের সাহুদিগের কায়স্থ-কন্যা অপরিহার্য্য

ইটার রাজার এই চারি জনে অধস্তন বংশ সাবেক ঘর এবং অষ্টপতি নামধেয় আর একটী বংশ অপেক্ষা উচ্চবর কেহই নাই।* অষ্ট পতির বিষয় দশম দফায় বিবৃত করা হইল। উমানন্দ ও দেবানন্দের বংশ বিলোপ ঘটিয়াছে। এক্ষণে কেবল নারায়ণ মণ্ডল, গোবিন্দ পুরকাইত এবং অষ্টপতির বংশ বিদ্যমান আছেন। ইহারা কায়স্থ সম্প্রদায়ের ব্যতীত আপনাদের সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে পারেন না বলিয়া শ্রীহট্টে সাহু ও কায়স্থ মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে ইহা এত ব্যাপক হইয়া পড়ে যে, এই বিষয়টী আইনে বিধিবদ্ধ হইয়া পড়ে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ৺গোলাপ শাস্ত্রী এম-এ বি, এল কৃত এবং ১৯০২ সালে বি, ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Hindu Law" নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭৫)ও উল্লেখ আছে—I may mention to you that in the Eastern Districts such as Sylhet and Tippara there is a custom of intermarriage between the Kayasthos and the Sahoos.

[৭]

আমরা সবিশেষ অনুসন্ধানান্তে অবগত হইয়াছি—সাধারণ ঘরের সাহুরা ব্যবসায়-বাণিজ্য অথবা উচ্চ শিক্ষার ফলে সঙ্গতিপন্ন ও মর্য্যাদাশালী হইলে সাধারণতঃ বংশগৌরব হেতু মূল কায়স্থ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ দফায় লিখিত বিশিষ্ট ঘরের সাহুরা ব্যতীত ইঁহারা নিজ সমাজে

---

* দশম দফায় এই সামাজিক উপাধির বিষয় লিখিত হইল। ইহা ত্রিপুরারাজের Palace Superintendentএর পদের ন্যায় একটী পদ বিশেষ।

উচ্চ ঘরে বর অথবা কন্যা পাইলে কদাপি মূল কায়স্থ জাতীয় বর অথবা কন্যা আনিতে চাহেন না। কেন না—নিজ সম্প্রদায়ে উচ্চ ঘরে সম্বন্ধ করিতে পারিলে সামাজিক উন্নতি ঘটে। কায়স্থ-কন্যা আনিলে তাহা হয় না। নীচ ঘরে বিবাহ করিলে বংশগৌরব লাঘব হয় বলিয়া অভাব স্থলে উক্ত সঙ্গতিপন্ন ও মর্য্যাদাশালী সাহুরা কায়স্থ-কন্যা অথবা কায়স্থ জাতীয় বর আনিতে বাধ্য হন। এইরূপ ব্যাপার এখনও (অর্থাৎ—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) শ্রীহট্ট অঞ্চলে চলিতেছে।

[৮]

শ্রীহট্টের সাহুরা, কায়স্থ ও বৈদ্য সম্ভূত ছিলেন, তদ্বিষয়ে "কুলাঞ্জলী" নামক হস্তলিখিত একখানি পুথি আছে। বর্ত্তমান কাল (অর্থাৎ—১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) হইতে অনূ্ন ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছিল। সাহুরা যে কায়স্থের সমতুল্য অথবা অব্যবহিত পরবর্ত্তি জাতি বলিয়া দাবী করেন এবং কায়স্থ সহ তাঁহাদের কন্যার বিবাহ দেন, তৎসম্বন্ধে W. W. Hunter কৃত Dacca Blue book" নামে—[অধুনা লুপ্ত]—১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত একখানি গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠার এক স্থানে লিখিত আছে—The Sylhet Sahoos claim to rank with or immediate below the Kaistos to whom they give their daughter in marriage.

[৯]

সাহুরা যে কায়স্থ ও বৈদ্য-মূল জাতি, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণস্বরূপ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একখানি প্রাচীন দলিল এখনও (অর্থাৎ—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) আছে। ইহার অধিকারী হইতেছেন—শ্রীযুত নবকুমার দাস, মুন্সেফ কোর্ট, পোঃ আঃ—করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টের ২২ জন প্রসিদ্ধ কায়স্থ ও বৈদ্য, ঐ দলিলে কয়েকজন সাহুকে বৈদ্যবংশোদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করত নিজ নিজ নাম দস্তখত করিয়াছেন।

[১০]

পঞ্চম দফায় লিখিত "অষ্টপতি" শব্দটী একটী সামাজিক উপাধি। এই [অষ্ট পতি] শব্দের অর্থ—আটঘর বা গোষ্ঠির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বিবৃত

অষ্টপতি, শ্রীহট্ট সমাজ, দক্ষিণভাগ সমাজ ও উজান সমাজ

কায়স্থ-মূল সাহুদের মধ্যে কালক্রমে দুইটি দল হয়। শ্রীহট্ট সহরে এক দলের অবস্থিতি। এই স্থান সুরমা নদীর উত্তর পারে স্থিত। প্রথম দল শ্রীহট্ট সহরে—[সুরমা নদীর উত্তর পারে] বাস করিতেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে "শ্রীহট্ট সমাজ" বলে। দ্বিতীয় দল সরমা নদীর দক্ষিণ পার—[ইন্দানগর, ইটা প্রভৃতি স্থান]—বাসী বলিয়া দক্ষিণভাগ সমাজ নামে অভিহিত। কালে দক্ষিণভাগ সমাজ হইতে উজান সমাজ বলিয়া কথিত আর এক বিভাগ উৎপন্ন হয়। এই শ্রীহট্ট সমাজ, দক্ষিণভাগ সমাজ ও উজান সমাজ কেবল কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহুদের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল—সাহা বণিকদের দ্বারা হয় নাই। সাহা বণিক জাতি মধ্যে তরফ, দিনারপুর প্রভৃতি নামধেয় যে কয়েকটী সমাজ আছে, সেগুলি উক্ত তিন সমাজ হইতে ভিন্ন। শ্রীহট্ট সমাজের প্রধান ব্যক্তিবর্গ মধ্যে স্বর্গীয় রাজা গিরিশচন্দ্রের বাড়ী গণনীয়। দক্ষিণভাগ সমাজের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান চারি ঘর ছিল—যথা, মন্ত্রী উমানন্দ, দেবানন্দ নারায়ণ মণ্ডল ও গোবিন্দ পুরকাইত। এই চারি ঘরের পরে অষ্টগোষ্ঠির লোকেরা উচ্চ বলিয়া গণ্য হয়। এই আট গোষ্ঠির নাম যথা—অশ্বপতি, শিখিপতি, মেধাই, গঙ্গাই, দুর্গাদাস, জটুদুর্গা দাস দুর্গা ও ঘুটা। এই আট গোষ্ঠির মধ্যে অশ্বপতিকে প্রধান্য দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া এই গোষ্ঠি, অষ্টপতি নামে খ্যাত হইয়াছেন। অষ্টপতি বংশের পূর্ব্বপুরুষ প্রত্যেকে 'লালা' উপাধি ধারণ করিতেন এবং নাম দস্তখত কালেও 'লালা' বলিয়া লিখিতেন। 'লালা' উত্তর পশ্চিম দেশে কায়স্থের উপাধি। অষ্টপতি বংশের পূর্ব্বপুরুষ সম্ভবতঃ তদ্দেশাগত ছিলেন। এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ প্রায় ১৬৭৫-৭৬ খ্রীঃ অব্দে কাছাড়

রাজের হস্তি ও অশ্ব রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া অশ্বপতি নামে অভিহিত হন। উক্ত উমানন্দ ও দেবানন্দের বংশ বিলোপ ঘটায় কোন সামাজিক বিষয় মীমাংসায় অষ্টপতির মতই গণ্য হইবে। উক্ত আট গোষ্ঠির লোকেরা ইহা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। একারণও ইঁহারা অষ্টপতি বলিয়া কথিত হন।

অষ্টপতি-বংশে কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তি

অষ্টপতির বংশে অনেক জন স্বনামধন্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমরা মাত্র কয়েক জনের বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম। উকীল ৺গৌরীচরণ মুন্সী একজন পরম জ্ঞানী ও অতি গম্ভীর ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন পারস্য ভাষাবিৎ মৌলানাবৎ তাঁহার মান্য ছিল। গৌরীচরণের তিন পুত্র—১। ৺চৈতন্যচরণ দাস, ২। ৺বৈষ্ণবচরণ দাস ও ৩। ৺গুরুচরণ দাস। চৈতন্যচরণ নসিরাবাদের মুন্সেফ এবং বৈষ্ণবচরণ ঢাকার সবজজ হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে বহুদিন মুন্সেফ থাকিবার পর শেষ জীবনে অফিসিয়েটিং (Officiating) সবজজ নিযুক্ত হইয়া ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ৺গৌরীচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺প্যারীচরণ 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' (সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র) নামক শ্রীহট্টের সর্ব্বপ্রথম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি প্রথমে ইণ্ডিয়া আপিসের পররাষ্ট্র বিভাগে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। পরে প্যারিচরণ ঐ কর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রীহট্ট সহরে আসিয়া ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে ঐ পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে 'স্যার') সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। এইখানে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতি ও তৎসংশ্লিষ্ট মকর্দ্দমার আমূল বিবরণ তৎকালীন 'শ্রীহট্ট প্রকাশ'এ প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, উক্ত প্যারিচরণ একজন উচ্চ অঙ্গের কবিও ছিলেন।

[১১]

পূর্ব্বোক্ত আট গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম 'মেধাই' গোষ্ঠীতে ৺বিপীনচন্দ্র

দাসের উদ্ভব। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বপ্রথম রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'রসায়ণের উপক্রমণিকা' নামে একখানি সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করেন। তৎকালে বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পরিশিষ্টে তৎসঙ্কলিত বহু পারিভাষিক শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। ইনিই শেষে পুনার সুবিখ্যাতা বিদুষী ৺রমাবাঈ সরস্বতীকে বাঁকিপুরে বিবাহ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন—"রমাবাঈ ব্রাহ্মণ-কন্যা হইলেও ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে এই অসবর্ণ বিবাহ সঙ্গত হইয়াছিল।" এই বিদুষী মহিলা ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার 'ফিলাডেল ফিয়া' হইতে The High Caste Hindu Woman নামক গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করেন। তত্রত্য Rachel H. Badley M.A., M.D. সাহেব এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিপিনচন্দ্র দাসকে 'বিপিনচন্দ্র মেধাবী' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র দাস ও ব্রাহ্মণ কন্যা রমাবাঈ

[১২]

খ্রীষ্টিয় ১৮৭২ অব্দের ৩ আইনের কোন বিশেষ নাম নাই। উহাকে "কতকগুলি অবস্থায় একপ্রকার বিবাহের আইন" অর্থাৎ—ইংরাজী ভাষায় "An Act to provide a form of Marriage in certain cases" মাত্র বলা হইয়াছে। অত বড় লম্বা এবং অনির্দ্দিষ্ট নাম ব্যবহার করিতে লোকের কষ্ট হয়, সেই জন্য সাধারণে উহাকে "Civil Marriage Act" বা "ব্রাহ্ম বিবাহের আইন" বলে। খ্রীষ্টান নরনারীর বিবাহের বিবরণ গির্জ্জায় রেজিষ্টারী করিতে হয়। এই তিন আইনে একটা বিশেষ অফিসে রেজিষ্টারীর নিয়ম হইয়াছে। রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর এই বিবাহ-বিধান কাহারও প্রতি বাধ্যতার আরোপ করে না। ঐ তিন আইনকে ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্মণ ও সাহুতে যে

তথাকথিত ব্রাহ্ম বিবাহে জাতিভ্রষ্টতা ঘটে

পরিণয় হইয়াছে তদ্দ্বারা মেধাই গোষ্ঠীর গৌরব সমুন্নত হয় নাই বরং উক্ত বিপিনচন্দ্রের জাতিভ্রষ্টতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। কেননা—হিন্দুর স্মৃতি অনুমোদিত বিবাহ হইলে, ব্রাহ্মণাদি যে সকল উচ্চ-জাতি আছেন, তাঁহাদের বিবাহে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ, সপ্তপদীগমন এবং ধ্রুবদর্শন প্রভৃতি কার্য্য বেদমন্ত্রের সহিত করিতে হয়। ঐ ব্রাহ্ম বিবাহে এসকল বালাই (আপদ) কিছুই নাই। তাহার মধ্যে মধ্যে অনুঃসার, বিসর্গের কটমট উচ্চারণ নাই, টিকিধারী পুরোহিতের কোন সংশ্রব নাই। বিবাহ মণ্ডপের প্রয়োজন হয় না—ছাঁদনাতলায় যাইবারও আবশ্যক হয় না। এরূপ বিবাহ হিন্দুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং ইহার দ্বারা জাতিভ্রষ্টতা ঘটে কিনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ১৮৭২ সালের ৩ আইনের আলোচনায় আমরা তাহা বলিব।

[১৩]

কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহু জাতি প্রথমে এক অখণ্ড সমাজভুক্ত ছিল। উত্তর শ্রীহট্টের দেওয়ান বংশ তাঁহাদের সমাজপতি ছিলেন। পরে মন্ত্রী উমানন্দ বংশ সহ দেওয়ান বংশের সামাজিক বিষয়ে বিবাদ হইলে শেষোক্তরা পৃথক্ হইয়া পড়েন। সুরমা নদীর দক্ষিণে ইহাদের বাসস্থান থাকার জন্য ইহাদের সমাজ দক্ষিণভাগ নাম প্রাপ্ত এবং সহরে অবস্থিত সম্প্রদায় (দেওয়ান বংশীয় প্রভৃতি) শ্রীহট্ট সমাজ বলিয়া কথিত হয়। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে দক্ষিণভাগ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সম্প্রদায় মধ্যে সামাজিক বিধি-বিধান করিবার জন্য বড়লিখা পাহাড়ের সন্নিকটে এক স্থানে নূতন বাটিকা প্রস্তুত করিয়া তথায় সকলে সমবেত হন। এই সমাজ বাটিকা এ-বি রেলের দক্ষিণভাগ ষ্টেসন হইতে অতি নিকটে। এই বাটিকা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানটাই দক্ষিণভাগ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। পরে সাহুদের প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ গ্রামে বসবাস করেন এবং ইহার নামানুসারে দক্ষিণভাগ পরগণার সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণভাগ সমাজ, দত্ত বংশের বিবরণ ও ঐ সমাজে নবশাখ বংশ

পূর্ব্বোক্ত উজান সমাজের উৎপত্তিকালে উক্ত দক্ষিণভাগ সমাজ হইতে একটী বংশ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ বংশটী আজ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ— ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। ঐ বংশ শ্রীহট্ট সমাজ, উজান সমাজ অথবা দক্ষিণভাগ সমাজভুক্ত হয় নাই। ঐ বংশের লোকেরা দত্ত উপাধি বিশিষ্ট ঐ দেশীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। দক্ষিণভাগ নামক স্থানে যখন সামাজিক বিধি-বিধান স্থির করা হয়, তখন দক্ষিণভাগ সম্প্রদায়ে একজন কুম্ভকার জাতীয় লোককে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই কুম্ভকার-সংশ্রব জনিত দোষের জন্যই ঐ দত্ত বংশ ঘৃণায় উক্ত দক্ষিণভাগ সমাজ সহ সংশ্রব ত্যাগ করিয়া পৃথক্ থাকেন। সেই বংশ আজ পর্য্যন্ত কোন সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট না হইলেও দক্ষিণভাগ সমাজের লোকেরা তাঁহাদের বংশের কন্যাকে সাদরে বিবাহ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ঐ কুম্ভকার জাতীয় লোকটীকে দক্ষিণভাগ সমাজভুক্ত করা কালে করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মর্য্যাতকান্দি নিবাসী ঐ দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ সুদামরাম দত্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বংশে বর্ত্তমানে শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (মুন্সেফীর উকিল) জীবিত আছেন। এই ঘটনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীহট্টের কায়স্থ-বৈদ্যমূল সাহু জাতির ব্যক্তিগণ আপনাদের সম্প্রদায়কে শুদ্ধ রাখার পক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। নিম্নে চতুর্দ্দশ দফায় আর একটী বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

[১৪]

শ্রীহট্টের অন্তর্গত জলডুব নামক স্থানে 'রাঢ়' জাতি বলিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক আছে। পূর্ব্বে ইহারা 'কুশিয়ারী' বলিয়া পরিচিত হইত। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের Report on the Census of Assam (Pt. I, P. 136) এ লিখিত আছে :—"The Kusiaris are a caste indigenous to Sylhet * * *. Their complexion is generally dark and they are supposed to be descended from some hill

'কুশিয়ারী' নামান্তর রাঢ় জাতি

tribe." প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই জাতি কায়স্থ-বৈদ্যমূল সাহু সমাজে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল—কিন্তু পারে নাই। 'রাঢ়'রা অকৃতকার্য্য হইয়া পরে পঞ্চমখণ্ডের কোন কোন ব্রাহ্মণকে আনিয়া মন্ত্রাদি গ্রহণ ও মূল কায়স্থ সমাজের অনুগত হইয়া চলিতে আরম্ভ করায় এখন কিয়ৎপরিমাণে 'চল' হইতেছে, অর্থাৎ—কোন কোন কায়স্থ বাসাদিতে ঐ জাতির চাকরের হাতে জল খাইতে আপত্তি করেন না। শ্রীহট্টের মূল কায়স্থ সমাজ ইহাদিগকে যে কিছু অধিকার দিয়াছেন, কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহুরা তাহা দেন নাই।

[১৫]

শ্রীহট্টের স্থান বিশেষে ও সম্মানিত ঘরের সাহু জাতীয় বিধবারা প্রায়ই মৎস্যাহার করেন না। তাঁহারা পুঁইশাক ও অধিকাংশ স্থলে মসুর ডাইল খান না। তাঁহাদের মধ্যে মাস-কলাইয়ের ডাইলের বেশ প্রচলন আছে। ঐ অঞ্চলের কোন বিধবার চিচিঙা ও ছত্রক (বেঙের ছাতা) খাওয়া তো দূরের কথা, কোন পুরুষ বা সধবা কদাচ ঐ দুইটী খান না। শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ ও ত্রিপুরা অঞ্চলের কোন কোন স্থানে 'সহজ ভজন ধর্ম্ম' প্রচলিত আছে। যে সকল স্থানে উহা গৃহীত, তথায় বিধবাদের মৎস্য ভোজন ও একাদশী পালন সম্বন্ধে তত বাঁধাবাধি নাই। তত্রত্য নিরক্ষরদিগের মধ্যেই 'কিশোরী-ভজন' প্রায়শঃ প্রচলিত। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সহজ ভজন ধর্ম্ম অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার বাল্যবন্ধু—[পারে সদা অনুসঙ্গী পার্ষদ (?) ভক্ত]—জগদানন্দ পণ্ডিত-কৃত "প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থ"এ বিষয় লিখিত আছে। সহজ ভাবের হেয়তা কেবল প্রেম বিবর্ত্তে নহে, বহু বৈষ্ণবীয় প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। যাহা হউক, শ্রীহট্টের বহুস্থানে সহজ ভজন ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। যে সকল স্থানে ইহা প্রচলিত, তত্রত্য সাহু জাতীয় বিধবারা আসাম অঞ্চলের কায়স্থ ও নিষ্ঠাবান্ কলিতা জাতীয় ব্যক্তিদিগের

সাহুজাতীয়া বিধবাদের খাদ্য দ্রব্য

বাঢ়ীয় বিধবাদের ন্যায় মৎস্য ভক্ষণ ও কোন কোন উপবাস পালন সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের ধার ধারেন না। যাহা হউক, সাহু জাতীয় বিধবাদের খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—"যস্মিন্ দেশে য আচার"—যে দেশে যেমন প্রথা চলিতেছে, তাহাই ভাল।

[১৬]

ত্রৈপুর নৃপতি ডুঙ্গুর ফা (হরিরায়) কর্ত্তৃক ৬৪২ খ্রীঃ অব্দে মিথিলা হইতে শ্রীহট্টে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের সংবাদ পাওয়া যায়। তাহার পর খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা ধর্ম্মধর যখন কিলারগড় রাজধানীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন আরও কতকগুলি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন ঘটে। পরবর্ত্তীকালে শ্রীহট্টে বঙ্গদেশাগত অনেক রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আগমন করেন, কিন্তু শ্রীহট্টের বিস্তৃত বৈদিক সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের অনেকেই পার্থক্য হারাইয়াছেন। এখন তত্রত্য ব্রাহ্মণ মাত্রেই পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচয় দেন। এই অঞ্চলে ক্বচিৎ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন। সাহুদের ব্রাহ্মণরাও পাশ্চাত্য বৈদিক। পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে এমন দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে, গৌরবে যাঁহাদের তুল্য লোক সমগ্র জেলার মধ্যে পাওয়া কঠিন ছিল। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীহট্ট সহর বাসী স্বর্গীয় হরিশঙ্কর বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার গুণমুগ্ধ স্বাধীন জয়ন্তীয়াপতি রাম সিং (দ্বিতীয়) তদীয় রাজ্যের লাহারচক গ্রাম হইতে ৩২৫ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের ফৌজদার নবাব মহম্মদ আলি খাঁন প্রদত্ত (১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে) সনন্দ মূলে শ্রীহট্টের প্রতি মহাল হইতে তিনি দেবসেবার জন্য দৈনিক ৻১২৷৷০ কৌড়ি পাইতেন। শ্রীহট্ট জেলার এইরূপ সনন্দ প্রাপক আর কেহ দৃষ্ট হন না।

সাহুদের ব্রাহ্মণরা পাশ্চাত্য বৈদিক

[১৭]

সাহুদের ব্রাহ্মণ, মূল কায়স্থের ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ হওয়াতে ইঁহাদের আর বিশেষত্ব নাই। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পাশ্চাত্য বৈদিক ছিলেন। যজুর্ব্বেদ পদ্ধতিতে সাহুর ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ হয়। শ্রীহট্টে কায়স্থ, বৈদ্য ও সাহু জাতির ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কন্যাভাবে বিবাহের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। তবে এরূপ বিবাহের মাত্রা ক্রমশঃ কমিতেছে।

[১৮]

বঙ্গের বাহিরে বৈদ্য জাতি কখনও ছিল বা আছে—একথা বৈদ্যরা যেমন স্বীকার করেন না, কোন ইতিহাস বা অপর কোন জাতি তাহা বলেন না। এরূপস্থলে পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান আনন্দ নারায়ণকে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে একেবারে হঠাৎ বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। বরং যাঁহারা কায়স্থ ও বৈদ্যের কুল-কারিকা পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদের ঐ বিষয়ের সমালোচনা দেখিয়া এবং কুলগ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, সুপ্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ ও বৈদ্য পরস্পর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিয়াছেন এবং করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গের বাহিরে অন্যত্র যখন বৈদ্য বলিয়া স্বতন্ত্র জাতি নাই এবং কায়স্থের মধ্যে সমধিকভাবে বৈদ্যক শাস্ত্রের প্রণয়ন প্রচার দেখিতে পাইতেছি, তখন বঙ্গের বৈদ্যদিগকেও কায়স্থমূলজ একতম সম্প্রদায় বলিতে পারি।

আনন্দনারায়ণের জাতিত্ব; বৈদ্যগণ, কায়স্থ মূলজ একতর সম্প্রদায়

[১৯]

সাহুদিগের বিষয়ে যে উপাখ্যান উপস্থিত করা হইল, তাহা আমাদের অনুসন্ধান মূলক। তাঁহারা আর্য্য কি অনার্য্য, কায়স্থ কি কায়স্থেতর জাতি তাহার প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে—তাঁহাদের যাজক ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রীয়

সাহু জাতির, তথ্যানুসন্ধান

ব্রাহ্মণ কিনা? অর্থাৎ—বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির যাজকতা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সহিত সাহুদিগের ব্রাহ্মণেরা এক পাংক্তেয় অথবা অপাংক্তেয়। যদি অপাংক্তেয় হন, তাহা হইলে সাহুদিগের উচ্চ-জাতিত্বের দাবী এই স্থানে শেষ হইয়া যায়। আরও দেখিতে হইবে—তাঁহাদের আর্ষ, গোত্র, প্রবর কিরূপ? সেগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থের তুল্য কি না? শ্রীহট্টের সাহুদিগের পুরুষানুক্রমে যদি আর্ষ, গোত্র এবং প্রবর থাকে এবং শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের যাজকতা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর্য্য জাতির একতম শাখা বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। "কায়স্থ সমাজ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রাদ্ধেয় শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"সাহুলিয়ার* সাহুলি(১)দিগের সহিত যদি তাঁহাদের সমান গোত্র, প্রবর হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রীবাস্তব্য কায়স্থের বংশধর বলিয়া স্বীকার করা অসঙ্গত হয় না।"

[২০]

বরেন্দ্র সাহা ও মঘিয়া সাহা
শ্রীহট্টের সাহা জাতি
ও তাঁহাদের সমাজ

পূর্ব্ববঙ্গের পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত শ্রীহট্ট জনপদেও দুই শ্রেণীর সাহা আছে, যথাঃ—বারেন্দ্র সাহা ও মঘিয়া সাহা। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান নাই। মঘিয়া সাহা অপেক্ষা বারেন্দ্র সাহাদের সামাজিক স্থান উচ্চ। মঘিয়া সাহারা অর্থবলে বারেন্দ্র সাহার গৃহের কন্যা গ্রহণ করিলে কন্যার পিতা সমাজে পতিত হইয়া থাকেন। মঘিয়া সাহারা কাহারও নিকট আপনাদিগকে মঘিয়া সাহা বলিয়া পরিচয় দেন না। বারেন্দ্র সাহাদের এরূপ আত্মগোপন নাই। রাজসাহীর দুবলহাটীর রাজারা (১) মঘিয়া সাহা। শ্রীহট্ট অঞ্চলে কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহু ব্যতীত মৌলিক সাহা সম্প্রদায় রহিয়াছে। হবিগঞ্জ,

---

* সাহুলিয়া—এই পরগণাটী দ্বারবঙ্গেশ্বরের জমীদারীর মধ্যে।

(১) শাহুলি—ইঁহারা শ্রীবাস্তব্য কায়স্থ ও বিহার দেশের শ্রেষ্ঠ কায়স্থ।

সুনামগঞ্জ ও মৌলবীবাজার মহকুমার পশ্চিমাংশে প্রধানতঃ সাহাদের বাসস্থান। ইহাদের মধ্যে বাণিয়াচুঙ্গ সমাজ, দিনারপুর সমাজ এবং তরফ সমাজ প্রধান। এতদ্ব্যতীত কুবাজপুর ও পুটীজুরি নামে দুইটী সমাজও সাহাদের মধ্যে আছে। দিনারপুর ও কুবাজপুর সমাজ, বাণিয়াচুঙ্গ সমাজ হইতে উৎপন্ন। পুটীজুরী সমাজ, তরফের খারিজ; অর্থাৎ এই সমাজটী তরফ সমাজ হইতে গঠিত। দক্ষিণভাগ সমাজ হইতে উৎপন্ন ইটা এবং ভানুগাছ নামে দুইটী শাখা সমাজও আছে। শ্রীহট্ট জেলায় সাহাদের মধ্যে এই কয়টী সমাজ আছে। কায়স্থ-বৈদ্যমূল পূর্ব্বোক্ত শ্রীহট্ট সমাজ, দক্ষিণ-ভাগ সমাজ ও উজান সমাজের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; পুরোহিতও পৃথক্। ইটা ও ভানুগাছ সমাজ, দক্ষিণভাগ সমাজের আশ্রিত। কেননা—দক্ষিণভাগ সমাজের সহিত কেবল এইমাত্র সম্বন্ধ আছে যে, ইটা বা ভানুগাছ সমাজের কেহ যদি ঐ সমাজের কোন ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তবে কন্যার পিতা নিজ পুরোহিতের দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কন্যাদান করিতে পারেন। কিন্তু দক্ষিণভাগ সমাজের কেহ ইটা বা ভানুগাছ সমাজের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না। ইটা ও ভানুগাছ সমাজ সম্ভবতঃ (?) সাহা ও কয়েকজন সাহুর সম্মিলন দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

[২১]

সাহা বণিক ও শুঁড়ী প্রসঙ্গ

বিগত ১৯২০ সালে শ্রীহট্টের সাহা বণিকগণ সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট সর্ব্বপ্রথম আবেদন-পত্রদ্বারা প্রার্থনা জানান যে, ১৯২১ সালের সেন্সাসে তাঁহাদিগকে বৈশ্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হউক। শুনা যায়—তাঁহাদের দেখাদেখি সাহুদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে 'বৈশ্য' বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্রীহট্টের "সাহা বণিক সম্প্রদায়" ও "সাহা সম্প্রদায়" পৃথক্ নহে। এই দুইটী শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত। উভয়ই একই জাতি।

কেননা—সাহা বণিক ও সাহা মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান আছে। যাঁহারা 'খন্দ বণিক' বলিয়া দাবী করেন তাঁহারাও সাহা, সাউ, সাজী ও সৌ বলিয়া থাকেন। অন্যদিকে আগুড়ি ও ঝাড়খন্দ নামক স্থানের কৈবর্ত্তরা যখন ধনশালী হয়, তখন ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ করে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি—দিনাজপুর সহরের উপরে রামনগর বলিয়া যে পল্লী আছে, তন্মধ্যে প্রবাহিত কাঞ্চন নদের পশ্চিম পাড়ে যে সকল মুসলমান আছে তাহাদের মধ্যে প্রধান কারবারী ও ধনশালী মথুর সাহা, সাহরুদ্দিন সাহা প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ স্থলে সাহা শব্দের পূর্ব্বরূপ "সাধু" (বণিক্) ছিল বলিয়া বোধ হয়। রায় সাহেব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" এ—[বৈশ্যকাণ্ডে]—যে সাহা বণিকদিগের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি বৈশ্য বলিয়াছেন—শুঁড়ী বলেন নাই। শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ ঘোষ ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীও নিজ নিজ পুস্তকে যে সাহা বণিকদিগের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাও বৈশ্য—শুড়ী নহেন। শ্রীহট্টের সাহা বণিকরা 'বৈশ্য' বলিয়া দাবী করেন—শুঁড়ী বলিয়া স্বীকার করেন না। ইঁহারা নামের শেষে অধিকাংশ স্থলে রায়, পোদ্দার, বিশ্বাস, কোথাও বা সাহা এবং কোথাও দাস উপাধি ধারণ করেন। নবম অধ্যায়ের ১৫২ পৃষ্ঠায় যে সাহা বণিকদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা শুঁড়ী ছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কারণ—ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ে দ্বিজ ব্রহ্মানন্দ যাঁহাদিগকে তর্পণমন্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন, তাঁহারা যে শুড়ী জাতীয় ছিলেন, এরূপ স্পষ্ট কথা কোথায়ও পাওয়া যায় না। কুলাঞ্জলীতে 'সাহা" লিখিত আছে। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে বৈদ্য-সন্তান শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাস গুপ্ত শ্রীহট্টের ইতিহাস নামে যে পুস্তক লেখেন, তাহাতেও 'সাহা' লিখা আছে। আমরা অনুসন্ধানান্তে জানিয়াছি যে, সাগর দীঘীর ঐ স্থানের সন্নিকটেও শুঁড়ী জাতি ছিল না বর্ত্তমানেও নাই। ইটার সেই স্থানবাসী—

[ঐ সাহাদের পরে আগত]—সাহারাও 'শুঁড়ী' নহেন, ইহাও দেখা যায়। বর্ত্তমানেও সেই স্থানে শুঁড়ী জাতির বাস নাই। ঐ স্থানবাসী সাহারা দাস ও হালদার উপাধি ধারণ করেন। যদি কেহ বলেন,—সাগরদীঘীর ঐ সাহারা 'শুঁড়ী' হইতে পারে; তদুত্তরে লেখকের অভিমত হইতেছে—হইলেও হইতে পারে, তথাপি সংশয়স্থলে নিশ্চিতরূপে বলা সঙ্গত নহে। হবিগঞ্জের চিরাকান্দি প্রভৃতি স্থানে এখনও শুঁড়ী জাতি আছেন। তাঁহারা নামের শেষে সাহা পদবী লেখেন—কিন্তু বৈশ্যত্বের দাবী করেন না। সুনা[illegible] যাঁহারা শুঁড়ী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অবস্থা খুব উন্নত। মালদহের শুঁড়ী জাতির লোকেরা মৎস ধরিয়া বিক্রয় করে। তাহারা পশ্চিম দেশীয়। এই জেলায় মহানন্দা নদীর দুই পার্শ্বে মালদহ থানার এলাকা মধ্যে "বৈশ্য সাহা" জাতি আছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সেখানকার কায়স্থ ও রাজবংশিদিগের ন্যায় উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। মালদহ অঞ্চলের যুগীদিগেরও পৈতা আছে।

মৌলবীবাজার মহকুমাবাসী কোন কোন শৌণ্ডিক (শুঁড়ী) জাতীয় ব্যক্তি ব্যবসায় ত্যাগ করত পরিচয় গোপন করিয়াছেন। এই অঞ্চলে শুঁড়ীকান্দি বলিয়া একটি স্থান আছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—এক সময় এখানে শুঁড়ী জাতির বাস ছিল। যে সকল সাহা বণিক, বৈশ্য বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা ঐ শুঁড়ীদিগের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখেন না—এমন কি, তাঁহাদের স্পর্শ করা কোন খাদ্যদ্রব্য ভোজন করে না। উভয়ের পুরোহিতও ভিন্ন।

২৪ পরগণা জেলার নবাবগঞ্জ নিবাসী হাইকোর্টের উকিল ৺নারায়ণচন্দ্র সাহা শুঁড়ী জাতীয় ছিলেন। তিনি "বৈশ্যখন্দ বণিক ও শৌণ্ডিক" নামক

সোম সুরার সংশ্রব হেতু
শুঁড়ী নামের উৎপত্তি

পুস্তকে শুঁড়ীদিগকে খন্দ বণিক বলিয়াছেন এবং ১১৬ পৃষ্ঠায় তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮২৮ শকাব্দে প্রকাশিত তাঁহার এই

পুস্তকখানি ৩২৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এবং বহু তথ্য সমন্বিত। সাহা মহাশয় ১১৬ পৃষ্ঠায় "শম্পপণি শণ্ডিবণিক্ খন্দ সাহার বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"ইহারা (শুঁড়ীরা) বৈদিককালে সোম সুরা বিক্রয় করিত। এই সোম সংশ্রব ব্যতিরেকে ইহাদের অপর কোন মদ্য সংশ্রব ছিল না। বোধ হয়, এই সোম সংশ্রব স্মরণ ও লক্ষ্য করিয়াই লোকে ইহাদিগকে শুঁড়ী বলে।" কিন্তু এই কথাটী আমরা মানিয়া লইতে পারিলাম না। কেননা—পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনি ব্যাকরণে আছে :—"শুণ্ডিকাদিভ্যোহণ্।* ৪।৩।৭৬ অর্থাৎ—যাহারা মদ্যপানের গৃহে থাকে [মদ্য সরবরাহ করে], তাহারা শৌণ্ডিক। সুতরাং সোম রসের সহিত সুরার বা শুঁড়ীর কোন সম্বন্ধ নাই। এই শৌণ্ডিক জাতি অতি প্রাচীন জাতি। ইহাদের স্বভাব সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রিশৎ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে আছে:—

সরস্বতি ত্বমস্মা঳ অবিড্ঢি
মরুত্বতী ঘৃষতী জেষি শত্রূন্।
ত্যং চিচ্ছর্ধন্তং তবিষীয়মাণমিন্দ্রো
হন্তি বৃষভং শণ্ডিকানাং॥

অর্থাৎ—হে সরস্বতি! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। মরুদ্‌গণের সহিত একত্রিত হইয়া দৃঢ়তা সহকারে শত্রুদিগকে জয় কর। (যেরূপ) ইন্দ্র স্পর্দ্ধাবান্ দুষ্ট স্বভাব শৌণ্ডিকদিগের প্রধানকে হনন করিয়াছিলেন।

উক্ত অষ্টম মন্ত্রে শৌণ্ডিকেরা যে অনার্য্য ছিল, তাহা তাহাদের স্বভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১৪ মন্ত্রে আছে :—

কিং তে কৃন্বন্তি কিকটেষু গাবো
নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্ম্মং।
আ নো ভর প্রমগন্দস্য বেদো
নৈচশাখং মঘবন্‌রন্ধয়া নঃ॥

---

* শুণ্ডিকায়াঃ (মদ্যপান গৃহাৎ) আগতঃ শৌণ্ডিকঃ।

অর্থাৎ—"কীকট (মগধ) দেশের গাভীসকল তোমায় কি করিবে? উহারা যজ্ঞের জন্য দুগ্ধ দান করে না। দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পাত্রকেও দীপ্ত করে না। হে মঘবন্ (ইন্দ্র)! ঐ সকল নীচবংশজাত প্রমগন্দের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।" পণ্ডিতগণ প্রমগন্দদিগকে ধনশালী শৌণ্ডিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই প্রমগন্দ-দিগের যে নীচশাখা বিশেষণটী রহিয়াছে, তাহার দ্বারাই উহাদিগের ক্ষত্রিয় জাতিত্বের গৌরব, তথা সোমরসের উৎপাদন কারিত্বের গৌরব বিদূরীত হইয়া যাইতেছে। আমাদের মনে হয়—ভারতের উত্তর সীমান্তে বৃটীশ সিংহের নিয়ত শত্রুতাকারী মমন্দ জাতি ঋগ্‌বেদে বর্ণিত মগধের প্রমগন্দদিগের গোত্র পুরুষ মগন্দরাই। মহর্ষি যাস্ক বলেন—মগন্দঃ কুসীদী মাঙ্‌ গদোমামাগমিষ্যতীতি চ দদাতি। তদপত্যং প্রমগন্দোঽত্য-ন্তকুসীদকুলীনঃ। প্রমদকো বা যোঽয়মেবাস্তি লোকো ন পর ইতি প্রেপ্সুঃ। পণ্ডকো বা পণ্ডকঃ পণ্ডগঃ প্রার্দকো বা প্রার্দয়ত্যাণ্ডৌ। আণ্ডাবাণী ইব ব্রীড়য়তি তত্তস্মে। পৈচাশাখং নীচাশাখো নীচৈঃ শাখঃ।"—[নিরুক্তি ১।৩২।৪] যাহারা নীচ এবং কর্ম্মপণ্ডকারী তাহারাই শণ্ডক—মগন্দ নামে অভিহিত। উক্ত কীকট সম্বন্ধে ঋক্‌বেদের ইংরাজী অনুবাদক Wilson বলেন—"Kikata is usually identified with south Behar." মহাত্মা Weber বলেন—"In the Riksamhita, where the Kikata—the ancient name of the people of Magadha."* যাহাহউক, কায়স্থ-সমাজ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"ইহারা দ্বিতীয় মণ্ডলে তথাকথিত 'শণ্ডিক' এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালার 'শৌণ্ডিক' বা 'শুঁড়ি' জাতি।"

* Vide Indian Literature, page 70.

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন

দশম অধ্যায়

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন কিরূপে "ব্রাহ্ম বিবাহ" আখ্যা পাইল ১৫৩ পৃষ্ঠায় আমরা তাহা বলিয়াছি। আমাদের দেশে রাজা ৺রামমোহন রায় কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রবর্ত্তিত হইলেও তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্য মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়েও ব্রাহ্ম-সমাজের নরনারী হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বর্ণ এবং জাতির ভেদ এবং প্রাচীন বিবাহ-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন। কলিকাতাস্থিত "আদি ব্রাহ্মসমাজে" এখনও আমাদের পুরাতন বিবাহ-পদ্ধতিই চলিতেছে; কেবল বৈদিক সংস্কৃত ভাষার মন্ত্রগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ পড়া হয়, এই মাত্র প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মানন্দ ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে বর্ণভেদ এবং জাতিভেদের বন্ধন ও সঙ্গে সঙ্গে পৈতার ব্যবহার তুলিয়া দেওয়া হয় এবং অনেক নরনারী হিন্দুবিবাহের ব্যবস্থা উল্লংঘন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং জাতির সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হন, এবং কতকগুলি নরনারী ঐরূপ ধরণের বিবাহ—[যেমন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে বিবাহ]—করিয়া বসেন। অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসর হইতে বিভিন্ন বর্ণ এবং জাতির মধ্যে মিশ্র বিবাহ-প্রথা—[অনুলোম এবং প্রতিলোম উভয় প্রকারই *]—অবৈধ বলিয়া সমাজে এবং আইন আদালতে গৃহীত হইতে

---

* প্রাচীন ভারতে অনুলোম (descending) বিবাহ-প্রচলিত এবং প্রতিলোম (ascending) বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল স্যার হরিসিংহ গৌড় (বিখ্যাত ব্যবহারজীব) মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত আইনে হিন্দুদিগের ভিতর এই অনুলোম প্রতিলোম উভয় প্রকার মিশ্র বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ বলিয়া গৈণ্য হইয়াছে।

ছিল। এই কারণে, কোনও অনুকূল রাজবিধান বা আইনের আশ্রয় ভিন্ন ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির পরস্পর ঐরূপ বিবাহ সমাজে এবং রাজদ্বারে অবৈধ এবং ঐরূপ বিবাহজাত সন্তানেরা জারজ সুতরাং পিতৃমাতৃ সম্পত্তির অনধিকারী বলিয়া গণ্য হইবার আশঙ্কা দূরীকরণার্থ গত ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সবিশেষ চেষ্টিত হন। ইহার ফলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে এই আইন (Act III of 1872) মহামান্য গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের দ্বারা অনুমোদিত হইয়া সমগ্র ইংরেজশাসিত ভারতের একতম রাজব্যবস্থা বা আইন স্বরূপে গৃহীত এবং তদবধি প্রচলিত রহিয়াছে। উহার ভূমিকা বা Preamble টী এই—

"Whereas it is expedient to provide a form of marriage for persons who do not profess the Christian, Jewish, Hindu, Muhammadan, Parsi, Buddist, Sikh or Jaina religion and to legalize certain marriages the validity of which is doubtful. It is hereby enacted as as follows :—"

অর্থাৎ—"যেহেতু, যে সকল নরনারী খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, মুসলমান পারসিক, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্ম্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের জন্য এক রকম বিবাহ-বিধান প্রণয়ন করার এবং কতকগুলি এরূপ বিবাহকে —[যাহাদের বৈধতার সম্বন্ধে সংশয় রহিয়াছে]—বৈধ বলিয়া অনুমোদিত করিয়া লইবার আবশ্যক হইয়াছে। তজ্জন্য আইন করা যাইতেছে, যে—"

উল্লিখিত ভূমিকা বা মুখবন্ধ হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'এই বিবাহকে "ব্রাহ্ম বিবাহ" অথবা এই আইনকে "ব্রাহ্মবিবাহ আইন"ও বলা হয় নাই। যেহেতু, সাধারণ এবং নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম নরনারীরা উল্লিখিত ধর্ম্মগুলির একটীকেও স্বীকার করেন না এবং তাঁহারা পৃথিবীর যে কোনও দেশের যে কোনও সমাজের—[ঐ ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির বহির্ভূত]—নরনারীর

সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারেন, তাহার জন্যই আমাদের দেশের লোকেরা এই আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং রেজেষ্টারী-কৃত বিবাহকে "ব্রাহ্ম-বিবাহ" এবং আইনটীকে "ব্রাহ্ম বিবাহ আইন"—এই ছোট এবং সরল নাম দিয়াছে। প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত আট রকম বিবাহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "ব্রাহ্ম" বিবাহের সহিত এই তিন আইনের বিবাহের কোনও সম্বন্ধ নাই। বরংচ এই বিবাহকে **পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসমূহে অবিশ্বাসীদিগের বিবাহ** বলা যাইতে পারে। এই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি সম্পূর্ণ বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের মাতাপিতা জন্মগত যে দায়ভাগ আইনের অধীন, সেই দায়বিধির—[হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান্ Civil law এর]—ব্যবস্থানুসারে পিতৃ-মাতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন।

৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় বিধিবদ্ধ আইনের অনেক গুণ আছে যেমন, (১) বরের আঠারো এবং কন্যার চৌদ্দবৎসর বয়সের কম বিবাহ হইবার উপায় নাই, (২) পত্নীর জীবদ্দশায় স্বামী পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন না, (৩) বিধবা নারীর বিবাহ হইতে পারে, (৪) এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন এবং (৫) স্বামী বা স্ত্রী পরে যদি এমন কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, যে ধর্ম্মে পুরুষের বহুবিবাহ—[যেমন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মে]—অথবা স্ত্রীর যুগপৎ বহুপুরুষ সংসর্গ অবৈধ বা অসামাজিক বলিয়া নিন্দিত হয় না—[যেমন তিব্বত এবং নেপালের কোনও কোনও জাতি ধর্ম্মের অনুমোদিত আছে]—তাহা হইলেও তিনি নূতন কোন স্ত্রী অথবা পুরুষকে বিবাহ করিতে পারেন না। তথাপি—একমাত্র মহাদোষের কারণে উহার যাবতীয় গুণ,—[এক কলস দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র মিশ্রণের মত]—একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে। যেহেতু এই আইন অনুসারে যিনিই বিবাহ করিতে চাহিবেন, তাঁহাকেই—[বর-কন্যা উভয়কেই]—অন্ততঃ তিনজন সাক্ষীর সম্মুখে—[বরকন্যার (বিধবার পক্ষে নহে) বয়স

একুশ বৎসরের কম হইলে পিতা বা অভিভাবকেরও সম্মুখে এবং সম্মতি অনুসারে]—প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীকার করিতে হইবে—**আমি খৃষ্টান্, ইহুদী, মুসলমান, পারসিক বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্ম্ম স্বীকার করি না।**

প্রসিদ্ধ বিদুষী ব্রাহ্মণ-কন্যা পণ্ডিতা ৺রমাবাঈ সরস্বতী যখন ৺বিপিন চন্দ্র দাস এম-এ কে বিবাহ করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু ৺চিত্তরঞ্জন দাস যখন ব্রাহ্মণ-কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন—[উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিলোম সম্বন্ধ ঘটিয়া ছিল]—অথবা আমাদের হিন্দুসমাজের শিরোমণি সদৃশ সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত যে শত শত নরনারী স্বকীয় মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজেদের বর্ণ, জাতি এবং সমাজের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে হইতে স্বামী বা স্ত্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই বাধ্য হইয়া **আমি হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করি না** এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিতে হইয়াছে। আমরা জানি—এরূপ বিবাহার্থীর মধ্যে অনেক সজ্জন ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে বেদাদি সচ্ছাস্ত্রানুমোদিত ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী হিন্দু জানিয়া এবং বিশ্বাস করিয়াও এই উদ্ভট আইনের খাতিরে **আমি হিন্দু নহি** এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডাক্তার স্যার শ্রীযুত হরিসিংহ গৌড় মহাশয় তাঁহার আইনের দ্বারা হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ পুনঃ প্রচলিত করাইয়া এরূপ বিবাহার্থী নরনারীর যে মহদুপকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

য়ুরোপীয় সভ্যতা এবং শিক্ষালাভের প্রভাবে যে সকল নরনারী স্ব স্ব বর্ণ, জাতি এবং কুলের আচার-ব্যবহারের এবং তদনুযায়ী মর্য্যাদার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন এবং তদুপরি নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষের আশ্রয়স্বরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াছেন, এইরূপ নরনারীর—[তাঁহারা নিজ নিজ আদর্শানুরূপ কোন সগুণ বা নির্গুণ ঈশ্বর বা ব্রহ্মবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হউন বা না হউন]—জন্যই তিন আইনের 'সিভিল-বিবাহ'-ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত

হইয়াছিল। শ্রীযুত হরিসিংহ গৌড় মহাশয়ের আইনের আশ্রয়ে শুধু হিন্দুজাতির অসবর্ণ বিবাহের বাধা উঠিয়া গিয়াছে ;—উহার সাহায্যে ব্রাহ্মণ-বর, শূদ্রকন্যাকে কিংবা শূদ্রবর, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত বিবাহ-ব্যবস্থানুসারে—মৌলিক সংস্কৃত ভাষার—[অথবা অনুবাদিত অন্য যে কোন ভাষায়]—মন্ত্রপাঠ সহকারে আনুষ্ঠানিক—[যেমন অতিথি সৎকারের পাদ্য, অর্ঘ-মধুপর্কাদি প্রদান, সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা হোম, লাজহোম, পাণিগ্রহণ, মিত্রাভিষেক, অশ্মারোহণ, ধ্রুবদর্শন এবং চতুর্থীকর্ম্ম পর্য্যন্ত]—বিবাহ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ দয়ানন্দ স্বামিমহারাজের প্রবর্ত্তিত "আর্য্যসমাজে" এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ অনেক দিন হইতে চলিতেছে। আর্য্য-সমাজীদিগের মধ্যে অনেকেই জন্মগত বর্ণব্যবস্থা মানেন না,—গুণ এবং কর্ম্মানুসারে বর্ণ-ব্যবস্থা মানেন; তাঁহাদের সেই আদর্শমতে নির্দ্ধারিত বর্ণের মধ্যে অনুলোমক্রমেই অসবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে। ডাক্তার গৌড়ের আইনের দ্বারা "আর্য্যসমাজীদিগের" ঐরূপ বিবাহ পাকাপাকি (আইনের দ্বারা সুসিদ্ধ) হইয়া গেল। এসিয়া, আফ্রিকা, য়ুরোপ এবং আমেরিকার—অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন দেশের এবং জাতির অথবা যে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নরনারী যদি তাঁহাদের জন্মগত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া "আর্য্য সমাজের" অথবা নূতন "হিন্দুসভার" অনুমোদিত শুদ্ধিসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া "আর্য্যধর্ম্ম" বা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা যে 'জাতিতে' প্রবেশ করিতে চাহেন, সে 'জাতি'র বা সমাজের পঞ্চায়ত অথবা মাতব্বর সামাজিকেরা তাঁহাকে নিজেদের জাতিতে এবং সমাজে "তুলিয়া লন," তবেই ঐরূপ কোন (এসিয়াটীক, আফ্রিকান, য়ুরোপীয়ান বা মার্কিন) নরনারীকে এদেশের কোন হিন্দু নরনারী ডাক্তার গৌড়ের আইনের সাহায্যে বিবাহ করিতে পারেন। আমাদের দেশের রাজা, মহারাজা এবং বড় বড় জমীদারেরা আর্মানি, ইহুদী, য়ুরোপীয়ান অথবা মার্কিন কোনও বিবি বা মেমকে বিবাহ করিতে কামনা করিলে "আর্য্যসমাজী বিবাহ

পদ্ধতি" এবং গৌড় সাহেবের আইন তাঁহাদের সেই কামনা পরিপূরণ করিতে পারে। "শুদ্ধি সংস্কারে সংস্কৃত" এবং হিন্দুধর্ম্মের কোন নির্দ্দিষ্ট একটী বর্ণ, জাতি এবং সমাজে "সুগৃহীত" হইতে না পারিলে অথবা হইতে স্বীকার না করিলে, তদ্রূপ স্বদেশী বা ভিন্নদেশীয় এবং ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নরনারীর সহিত আমাদের হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজভুক্ত কোনও নরনারীর বিবাহ একমাত্র উক্ত তিন আইনের দ্বারাই হইতে পারে,—হিন্দুধর্ম্মের নরনারী ভিন্ন খ্রীষ্টানাদি ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্র-বিবাহ গৌড় সাহেবের আইনের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে না।

জাতীয় এবং কৌলীন্য মর্য্যাদার মায়া যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে কাটাইয়াছেন, তাঁহারাই শুধু তিন আইনের সাহায্যে বিবাহিত হইতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদের জাতিপাতের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। ৺বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত "বিধবা বিবাহ আইন" এবং ডাক্তার গৌড়ের প্রবর্ত্তিত "হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ আইন"—এই দুইটি আইন অনুসারে নিষ্পন্ন বিবাহে হিন্দু শাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা ষোল আনা চলিতে পারে এবং বহুস্থলেই চলিতেছে। তথাপি, উক্তরূপ বিবাহে বিবাহিত দম্পতী এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরা অর্থ সামর্থ্যে এবং পদমর্য্যাদায় খুব উচ্চ না হইলে, নিজ নিজ সমাজের মর্য্যাদা পূর্ণভাবে পান না। আইনের বলে কেহ জাতি, সমাজ অথবা কৌলীন্যের সম্মান পাইতে পারেন না,—সেগুলির কর্ত্তা ধর্ত্তা একমাত্র স্বজাতি এবং স্বসমাজের সামাজিকেরাই হইতে পারেন। অন্যান্য রাজকুলের কথা দূরে থাকুক, ভারতের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অকলঙ্ক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত মেবারের মহারাণার বংশও বিধবা বিবাহ-প্রসূত (মহাবীর হম্মীর-পুত্র) কায়স্থসিংহের দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। সেদিনও মার্কিন দেশের খৃষ্টান্ মাতাপিতার এক কুমারী কন্যা (Miss Nancy Miller—নূতন নাম শর্ম্মিষ্ঠা দেবী) এক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব ইন্দোরের এক নৃপতির সহিত সামাজিক মর্য্যাদার সঙ্গে

সঙ্গে হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিতা রাজ্ঞীর সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। তিন আইন অনুসারে বিবাহিত দম্পতি এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিরা পৃথিবীর যে কোন সভ্য এবং ভদ্র সমাজে নিজ নিজ অর্থ সামর্থ্য এবং পদমর্য্যাদার অনুরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন, কেহই তাঁহাদিগকে (ঐ আইনের ব্যবস্থানুসারে বিবাহিত হইবার জন্য) কোনও প্রকারে হীন মনে করেন না, করা উচিতও নহে। খ্রীষ্টান্ অথবা মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত পাদরী বা মৌলভীর সাহায্যে বিবাহিত সেই সেই ধর্মে আস্থাবান্ দম্পতীর অপেক্ষা তিন আইনের সাহায্যে বিবাহিত দম্পতীর সম্মান কোনও অংশে হীন নহে এবং সেরূপ মনে করার কোনও কারণ নাই। এদেশের শাস্ত্রীয় "ব্রাহ্ম বিবাহের" লক্ষণ শ্রীশ্রীমনুমহারাজ তাঁহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকে বলিয়াছেন। অন্যান্য গৃহ্যসূত্রকার এবং স্মৃতি সংহিতার ঋষিরাও এ সম্বন্ধে মনু মহারাজের সহিত একমত। সেই শ্লোকটী এই :—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ২৭"

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান পণ্ডিত প্রোফেসার জি বূহ্লার ইংরাজী ভাষায় উক্ত শ্লোকের এই অনুবাদ করিয়াছেন,—The gift of a daughter after decking her (with costly garments) and honouring (her by present of jewels) to a man learned in the Veda and of good conduct, whom (the father) himself invites, is called the Brahma rite." *Note.* The commentators Narayana and Raghavananda refer 'অর্চ্চয়িত্বা', after honouring (the bridegroom with the honey-mixture, অর্ঘ্য)।

সোজাসুজি বাঙ্গালা অনুবাদ—"বিদ্যাবান্ এবং সচ্চরিত্র বরকে সসম্মানে আবাহন করিয়া [বর এবং কন্যা উভয়কেই] বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদির দ্বারা সংকারপূর্ব্বক কন্যাদান করাকে "ব্রাহ্মবিবাহ" বলে। [মন্তব্য—পূর্ব্বে যাবতীয় বিদ্যাই (বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত এবং উপবেদ) "বেদ" নামে বিখ্যাত ছিল ; এই বিবাহে কন্যাদাতারই আগ্রহ,—কন্যা গ্রহীতার নহে]

১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে কোন পুরুষের—[তিনি যে ধর্ম্মেরই হউন]—বিবাহিতা স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে বিবাহ হইতে পারে না। Section (2) conditions :—(1) Neither party must at the time of marriage have a husband or wife living. Sec. 10 অনুসারে 2nd Scheduleএর লিখিত বর এবং কন্যার Declaration বা অঙ্গীকার পত্রে লিখিতে হইবে—I., A. B., hereby declare as follows—(1) I am at the present time unmarried বর্ত্তমান সময়ে [আমি অবিবাহিত অর্থাৎ] আমার স্ত্রী জীবিত নাই। কন্যার অঙ্গীকার পত্রও ঐরূপ, অর্থাৎ আমার স্বামী জীবিত নাই। কোনও ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর জীবিতকালে স্ত্রীর কথা লুকাইয়া রাখিয়া ঐ তিন আইন অনুসারে বিবাহ করিলে সে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের (I.P.C.) ৪৯৪ ধারা অনুসারে দণ্ডিত হইবে এবং দ্বিতীয় বিবাহ নাকচ (void) হইয়া যাইবে। অবশ্য এই আইনের (এবং গৌর সাহেবের আইনেরও) অনুমত বিবাহের ফলে উৎপন্ন সন্তানদের দায়াধিকার (succession) লইয়া নানারূপ গোলযোগ হইতে পারে ; কিন্তু কল্পনা (speculation) দ্বারা কত কি রকম গোলযোগ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ

একাদশ অধ্যায়

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সীমা পূর্ব্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পশ্চিম দিকে ভূমধ্য সমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে টরাস্ হইতে আরম্ভ করিয়া—[এসিয়ামাইনর দেশের উপর দিয়া এবং তাহার পরে]—আর্ম্মেনিয়া, মিডিয়া (মদ্র), পারস্য, আফগানিস্থান, বাল্‌খ (বাহ্লীক) এবং তিব্বত দেশের উপর দিয়া পূর্ব্বদিকে চীন দেশের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া পূর্ব্ব বা প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালার নাম ছিল "হিমালয় বর্ষপর্ব্বত"। বায়ু [৩য় অধ্যায়], বিষ্ণু [২য় অংশ ১ম ও ২য় অধ্যায়], এবং মৎস্য প্রভৃতি মহাপুরাণের মতানুবর্ত্তী হইয়া মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমার সম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকে হিমালয়ের বর্ণনায় প্রথমে বলিয়াছেন :—

ভারতবর্ষের প্রাচীন সীমা

আছেন উত্তর দিকে দেব আত্মময়
অচল কুলের রাজা নাম হিমালয় ;
পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই পারাবার
মগ্ন করি' রাখিয়াছে দুই প্রান্ত তাঁর ;
শৈলেন্দ্রের সুবিশাল শরীর আয়ত
রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড মত।

—শ্রীযুত অখিলচন্দ্র ভারতী ভূষণের অনুবাদ

গ্রীক্ ভৌগোলিক ষ্ট্রাবো, আরিয়ান, এরাটোস্থেনিস এবং ফরাসী ঐতিহাসিক এম, চার্লস রোলিন প্রমুখ পণ্ডিতেরাও এই একই কথা বলিয়াছেন।

প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণ অনুসারে কেকয় ও তৎসন্নিহিত 'মদ্র দেশ' (North Persia) বর্ত্তমান পারস্য দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্যপ হ্রদের (Caspean Sea) উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া আর্ম্মানিয়া দেশের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত ছিল। যাঁহারা ক্যানিংহাম সাহেবের পদানুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বপাঞ্জাবে কেকয় এবং মদ্র রাজ্যের অবস্থান নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা রামায়ণ মহাভারতাদির মত অবগত না হইয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন। দশরথ কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ীকে, পাণ্ডুরাজা মদ্ররাজ-কন্যা মাদ্রীকে, শ্রীকৃষ্ণ মদ্রদেশের এক রাজকন্যাকে, বসুদেব আফগান রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত ব্যাক্‌ট্রীয়ার (আধুনিক বল্‌খ দেশের) পৌরব বংশীয়া রাজকন্যা রোহিণীকে, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এরূপ শত শত বিবাহের দৃষ্টান্ত আছে। কাজেই, কামরূপের ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকেরা যদি বাঙ্গালার সমশ্রেণীর লোকের সহিত সামাজিক পান ভোজনের এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই।

কামরূপী ও বাঙ্গালী সমশ্রেণী মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন নিন্দার বিষয় নহে

পৌরাণিককালে অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির সময়ে ভারতখণ্ডের প্রাচ্য ভূভাগে মিথিলা এবং কৌশিকী-কচ্ছের পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্র নামক জনপদ এবং তাহারও পূর্ব্বে প্রাগ্-জ্যোতিষ রাজ্যের অবস্থিতি ছিল, জানিতে পারা যায়। উত্তরকালে পুণ্ড্র দেশের 'দক্ষিণাংশ বরেন্দ্র' এবং প্রাগ্জ্যোতিষ 'কামরূপ' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। উত্তরে নেপালের কাঞ্চনাদ্রি (কাঞ্চন জঙ্ঘা), পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী (দিক্ষু) নদী, পশ্চিমে করতোয়া এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত লাক্ষা বা শীতলাক্ষা নদীর সঙ্গম স্থান—এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী ভূভাগ মধ্যযুগে "কামরূপ মণ্ডল" নামে বিখ্যাত ছিল। গত অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পাদে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের বিস্তৃতি

এবং উহার প্রায় সমগ্র জলই নূতন খাতে—[যমুনা নদীর খাতে]—প্রবাহিত হইতেছে। এই যমুনা বা নূতন ব্রহ্মপুত্রের সৃষ্টি হওয়ার ফলে ও পুণ্ড্রদেশের সুবিখ্যাত এবং বিশালকায়া করতোয়া নদী লুপ্তপ্রায় হইয়া যাওয়ায় দেশের ভৌগোলিক আকার অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খালজীর—[সাধারণতঃ শিশুপাঠ্য বাঙ্গালার ইতিহাসে যিনি পিতৃনাম "বখ্তিয়ার খিলিজি" নামে পরিচিত]—বঙ্গ বিজয়ের কালে করতোয়া নদীর বিস্তার, গঙ্গা নদীর বিস্তারের তিন গুণ অধিক ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং এখনও (অর্থাৎ-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার স্থানে স্থানে ঐ করতোয়ার শুষ্ক খাতের বিস্তৃতি দেখিয়া উহার পূর্ব্ব অবস্থার বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার পূর্ব্বাংশ, রংপুর জেলার সম্পূর্ণ, বগুড়া জেলার পূর্ব্বদিকের কতক অংশ ও ময়মনসিংহ এবং ঢাকা জিলারও কিয়দংশ প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কামরূপ ও গৌড় রাজ্য

কামরূপ রাজ্যের এবং গৌড় রাজ্যের সীমা চিরকাল একরূপ থাকিত না [থাকার সম্ভাবনাও নাই—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির আয়তন এবং সীমা কতবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন]। গৌড়ের পাল বংশীয় ধর্ম্মপাল এবং সেন বংশীয় বল্লাল সেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্ম বংশীয় বজ্রবর্ম্মা প্রমুখ বাঙ্গালী রাজারা মধ্যে মধ্যে কামরূপের অংশ বিশেষ জয় করিয়া লইতেন, আবার কামরূপের ভাস্কর বর্ম্মা এবং হর্ষ বা হরিষ প্রমুখ রাজারা গৌড়বঙ্গের কোন কোন অংশ জয় করিতেন। উভয় রাজ্য মধ্যে গমনাগমনের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধ কোনও না থাকায় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের এবং কামরূপের জনসাধারণের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অন্যান্য বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে পরস্পর যাতায়াত এবং মিলন মিশ্রণ খুব স্বাভাবিক ছিল।

দিনাজপুর প্রসঙ্গ

ইতঃপূর্ব্বে কামরূপ রাজ্যের যে সীমা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে দিনাজপুর জেলার যে অংশ করতোয়া নদীর পূর্ব্ব তীরে [সামান্য অংশই] পড়িয়াছে, উহাকেই কেবল প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। করতোয়া এবং কৌশকী বা কুশী নদীর অন্তর্গত ভূভাগ মধ্যযুগে পুণ্ড্র দেশের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন কালে পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় কে, সি, আই লেখককে বলিয়াছেন— "এককালে বর্ত্তমান রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর অঞ্চল পৌণ্ড্র দেশের অন্তর্গত ছিল।" পরবর্ত্তীকালে পুণ্ড্র দেশের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার দক্ষিণে কতকাংশ বরেন্দ্র বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যকালে দিনাজপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন 'ভুক্তি'র (Division) এবং কোটীবর্ষ 'বিষয়ের' (পরগণার) অন্তঃপাতী ছিল। হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণিতে (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী) "দেবীকোট, উমাবন, কোটীবর্ষ, বাণপুর এবং শোণিতপুর"—এই পাঁচটী নাম সমপর্য্যায় ভুক্ত বলিয়া পাওয়া যায়। বর্ত্তমান দিনাজপুর অঞ্চল এক সময়ে ঐ পাঁচটী নামেই খ্যাত হইয়াছিল। এখনও এই জিলার ভিতরে বিশাল বাণগড় বা বাণপুরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির" নির্ম্মিত শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহারই একটী স্তম্ভে "কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটা বর্ষেণ ভূভূষণঃ" ইত্যাদি সমস্ত শ্লোকটী খোদিত আছে। উহা তথা হইতে আনীত হইয়া দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের উদ্যানে স্থাপিত হইয়াছে। এই কাম্বোজবংশীয় নৃপতির নাম পাওয়া যায় নাই। উক্ত শিবমন্দির প্রস্তুতির কাল ৮৮৮ শক (৯৬৬ খ্রীঃ অব্দ) বলিয়া ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। 'কামরূপ' নামক জিলাটী বর্ত্তমানে প্রাচীন কামরূপ দেশের নাম রক্ষা করিতেছে।

কালিকা পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়—বরাহরূপধারী বিষ্ণুর ঔরসে এবং ধরিত্রী দেবীর গর্ভে উৎপন্ন সীতাদেবীর সহোদর নরক, ভগবানের প্রসাদে কিরাতরাজ ঘটককে পরাজয় করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বিদেহরাজ জনক এই নরকের পালক পিতা ছিলেন। নরক, কিরাত জাতির লোকদিগকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য হইতে অপসারিত এবং ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। কিরাতেরা দেখিতে স্বর্ণস্তম্ভের সদৃশ, হৃষ্টপুষ্ট এবং উন্নতদেহ অথচ পীতবর্ণ—[Yellow coloured Mongolian], স্বেচ্ছাকৃত মুণ্ডিত মস্তক, মদ্যমাংসভোজী এবং জ্ঞানহীন ছিল। নরক ভগবানের আদেশানুসারে কিরাতদিগকে দিক্করবাসিনী নদীর পূর্ব্বদিকস্থ ভূভাগে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি কামরূপ রাজ্যে স্থান দিয়াছিলেন। নরক বহু বৎসর রাজত্ব করার পর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে পরাগতি প্রাপ্ত হন। নরকের পুত্র ভগদত্ত পূর্ব্বসমুদ্রের উপকূলবাসী চীন এবং কিরাত জাতির রাজা ছিলেন বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে। নরক কর্ত্তৃক কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য অধিকৃত হওয়ার পর কিরাতেরা দিক্করবাসিনীর পূর্ব্বতট হইতে পূর্ব্ব সমুদ্রের (প্রশান্ত মহাসাগরের ?) উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে বাস করিতেছিল। বায়ু (৪৫ অধ্যায়), মৎস্য (১১৪ অধ্যায়) এবং বিষ্ণু (২য় অংশ, তৃতীয় অধ্যায়) প্রভৃতি প্রাচীন মহাপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাত জাতির নিবাস ভূমি ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে আছে—"পূর্ব্বে কিরাতাহ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনা স্মৃতাঃ।" অন্যান্য মহাপুরাণে ঠিক একই কথা আছে। এই 'যবনাঃ' অর্থাৎ যবন দেশকে সংস্কৃত ভাষায় যোনি, গ্রীক ভাষায় Ionia, প্রাকৃতে যোন এবং প্রাচীন পার্শিকে Yuna বলে। এই দেশ (Ionia) ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল। যাহা হউক,

কামরূপ আদিতে কিরাত দেশ ও তথায় দ্বিজাতির বাস

মহাভারতের কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই যে কামরূপ মণ্ডলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির বাস এবং বৈদিক সভ্যতা ও সদাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভারতের মহাযুদ্ধের সময়েরও পূর্ব্ব হইতে মিথিলা, পুণ্ড্র এবং বঙ্গ রাজ্যের সহিত কামরূপেও যে আর্য্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং তদনুগত সদা-

কামরূপ মণ্ডলে সামাজিক বিবিধ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মন্তব্য

চারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সমগ্র পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক সাহিত্য তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত সদাচারের সঙ্গে সঙ্গে অবৈদিক বা লোকায়তিক বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত এবং আচার ব্যবহারও ভারতখণ্ডের এই উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে মহারাজ চক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধনের সখা ভগদত্ত বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা কুমার(১) ভাস্কর বর্ম্মদেব কামরূপে রাজত্ব করিতে ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন কন্নৌজের সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের নিহন্তা গৌড়রাজ শশাঙ্ককে আক্রমণ করেন। শশাঙ্ক অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং তিনি রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ কামরূপ রাজ্য মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিতেন এবং তজ্জন্য কাম-রূপের রাজা কুমার ভাস্কর বর্ম্মার সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। হর্ষবর্দ্ধন ইহা অবগত ছিলেন এবং তিনি গৌড়পতিকে পরাস্ত করিবার জন্য ভাস্কর বর্ম্মার সহিত মিত্রতা এবং সন্ধি বন্ধন করিয়াছিলেন। হর্ষ পশ্চিম দিক্ হইতে এবং ভাস্কর পূর্ব্ব দিক্ হইতে যুগপৎ দুই পরাক্রান্ত রাজা দুই দিক্ হইতে শশাঙ্ককে আক্রমণ করায় তিনি পরাস্ত হইয়া দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং কোঙ্গদ মণ্ডলে [গঞ্জাম জেলায়] অপসৃত হইয়া তথায় রাজ্য করিতে থাকেন। শশাঙ্কের রাজধানী 'কর্ণসুবর্ণপুর' [রাঢ় দেশের মুর্শিদাবাদ

(১) কুমার—এটী কামরূপরাজের নাম,—রাজার পুত্র 'কুমার' নহে। বাণভট্ট ইহাকে "রাজকুমার" বলিয়াছেন।

জেলায় বলিয়া অনেকে মনে করেন] কামরূপরাজ অধিকার করিয়া তথা হইতে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব এবং কামরূপের পশ্চিম সীমান্তের অনেক ভূমি বাঙ্গালার কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থকে দান করায় ইহা অনুমিত হয় যে, সেকালের গৌড়রাজ্যের অধিকাংশই হর্ষবর্দ্ধনের সহযোগিতায় ভাস্কর বর্ম্মার হস্তগত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থকে নিজের পক্ষে আনিবার উদ্দেশ্যেই কামরূপরাজ রাজ্যের সীমান্তে ভূমিদান করিয়াছিলেন। কুমার ভাস্কর বর্ম্মদেব যে শ্রৌত স্মার্ত্ত সদাচারের অনুগত ছিলেন, তাহা হর্ষবর্দ্ধনের প্রিয় সখা এবং সভাসদ মহাকবি বাণভট্ট স্বকীয় 'হর্ষচরিত' নামক কাব্যোতিহাসে এবং প্রসিদ্ধ চৈনীক বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউএন সাঙ্গ নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। কামরূপ রাজের ব্রাহ্মণভক্তি দেখিয়াই চৈনীক ভিক্ষু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। ভগদত্ত বংশীয় নৃপতিগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকলগুলিই তাঁহাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণবর্ণের প্রতি আন্তরিক ভক্তি এবং প্রীতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। হিউএন সাঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বঙ্গদেশে যেরূপ বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাবের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, কামরূপের সেরূপ পরিচয় নাই পরন্তু তিনি তথায় বহু দেবমন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন।

হর্ষবর্দ্ধনের আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাওয়ার পর গৌড়বঙ্গে যেরূপ দীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতা ঘটিয়াছিল, কামরূপে সেরূপ হয় নাই। তথায় ভাস্কর বর্ম্মার বংশধরেরা সুশাসনের সহিত আর্য্য সদাচার সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন। পরে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষার্দ্ধে অথবা অন্তিম পাদে গৌড়ীয় প্রজাসমূহ মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা) দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দয়িত বিষ্ণুর পৌত্র এবং রণকুশল বপ্যটের পুত্র গোপাল দেবকে

পালরাজগণের হিন্দুধর্ম্মে-শ্রদ্ধা

নৃপতি নির্ব্বাচন করত পাল সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর সিংহাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গোপালের পুত্র মহারাজ ধর্ম্মপাল পূর্ব্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ (কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমাংশ) পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত কামরূপের উপর প্রভুত্ব বা প্রভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল রাজগণ ধর্ম্মে মহাযান মতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও বেদ এবং ব্রাহ্মণের উপর অচলা ভক্তি রাখিতেন এবং তাঁহারা এবং তাঁহাদের মহিষীরা নারায়ণ এবং মহাদেব প্রভৃতি হিন্দুগণের উপাস্য দেবদেবীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণদিগকে বাসভূমি প্রদান, সূর্য্যগ্রহণাদিতে কাম্য গঙ্গাস্নান এবং ব্রাহ্মণের মুখে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত-পাঠ ও শ্রবণ এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রচুর দক্ষিণার সহিত ভূমিদান করিতেন। পাল সম্রাড়্গণের মন্ত্রিবংশ নিষ্ঠাবান্ বৈদিকাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের বংশের উজ্জ্বল রত্ন গুরব মিশ্র (মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের মন্ত্রী) দিনাজপুর জেলার অন্তঃপাতী 'বাদাল' নামক গ্রামের নিকট যে বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন [নবম শতাব্দির শেষার্দ্ধ], তাহার পাষাণ নির্ম্মিত গরুড়স্তম্ভটী আজিও (অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) দণ্ডায়মান আছে। ঐ স্তম্ভের উপর উক্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রিবংশের ছয় পুরুষের নাম এবং কীর্ত্তির বিষয়ে খোদিত লিপি তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের এবং তাঁহাদের আশ্রয়দাতা পালরাজবংশের বৈদিক ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে [গৌড় লেখমালা, প্রথম স্তবক, ১৩১৯]। মদন পাল দেবের (১১৩০ খ্রীঃ অব্দে) মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূপ বিজয় করিয়া তথায় নরপতি হইয়াছিলেন। এই কামরূপ বিজয়ী বৈদ্য দেবকে কোনও কোন ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া মনে করি। ১৬১৮ শকাব্দে পারস্য

ভাষায় লিখিত সৈরমুতাখরীন (২) ইতিহাসের ও আইন আকবরীর মতে পাল রাজগণও জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহোদয় বলেন—"এখনও অনেক কায়স্থবংশ তাঁহাদের অধঃস্তন দায়াদ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।"

পাল বংশের পতনের পর দাক্ষিণাত্য 'ক্ষত্রিয়কুলশিরোদাম' সামন্ত সেনের প্রপৌত্র মহারাজ বিজয় সেন দেব গৌড়বঙ্গে স্বকীয় আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার পুত্র ও সুররাজ বংশের দৌহিত্র মহারাজ বল্লাল সেন দেব আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ জয় করিয়া নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন:—

সেন বংশাম্বুজঃ শূরো বিপ্রমানসহিষ্ণুকঃ।
মহামানী মহাকৃতিঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম বিদাংবরঃ।
স্থাপয়ামাস সাম্রাজ্যং চক্রবর্ত্ত্যভবন্ নৃপঃ॥
জিত্বা লোহিত্যরাজানং শৈলাধিপাংশ্চ কোচকান্।
মিথিলাবঙ্গকোলাংশ্চ তথা দিল্লীশ্বরো ভবৎ॥ পৃঃ ৪৪

—শশিভূষণ নন্দীর সংস্করণ

অর্থাৎ—"বল্লাল সেন লোহিত্য (কামরূপ) দেশের, খাসিয়া, জয়ন্তীয়া এবং কাছাড় প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশের এবং কোচক দেশের রাজগণকে পরাজয় করিয়া ছিলেন এবং দিল্লীশ্বর হইয়াছিলেন। বল্লাল সেনের মাতামহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আদিশূর'ও লৌহিত্য, কীচক, সপ্তগ্রাম, হিড়িম্বা, বঙ্গদেশ এবং কোচক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন:—

লৌহিত্যং কীচকং চৈব সপ্তগ্রামং তথৈবচ।
হিড়িম্বীং বঙ্গদেশং চ তথা কোচকমেবচ॥ পৃঃ ১৩

—উক্ত ধ্রুবানন্দ কারিকা

(২) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত (অধুনা লুপ্ত) "দেবনাগর" মাসিক পত্রের তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রস্তাব হইতে গৃহীত।

বল্লাল সেন দিল্লী(?) জয় করিতে সমর্থ হউন আর নাই হউন,* পাল এবং সেন রাজগণ যে কামরূপে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সংশয় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আসাম বুরঞ্জীতে পশ্চিম কামরূপের তিনজন যেণ বা সেন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের সহিত জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধবিহীন 'সেন কুমার' বলিয়া রাজ কুমার বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে।

প্রাচীন ও আধুনিক কামরূপে গৌড়ীয় সভ্যতা

কামরূপে বাঙ্গালীর প্রভাব অন্ততঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দ হইতে—[পাল এবং সেন রাজগণের রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই]—বিস্তৃত হইয়াছিল। পাল রাজবংশ যে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ ৺অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায়, রায়বাহাদুর শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন [গৌড় রাজমালা, অক্ষয় বাবুর University Lecture ইত্যাদি]। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সেন রাজগণকে 'বিদেশী' বলিয়াছেন; যেহেতু তাঁহারা আপনাদিগকে দাক্ষিণাত্য ক্ষত্রিয় বীরসেন রাজার বংশধর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তথাপি, বিজয় সেনের তাম্রশাসন এবং দেবপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বহু বহু পুরুষ পরম্পরাক্রমে রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বাস করিতে ছিলেন। যাহা হউক কামরূপের অধিবাসীদিগের বিবাহাদি সংস্কার আজিও বাঙ্গালী পশুপতি এবং হলায়ুধের দশকর্ম্ম পদ্ধতির অনুযায়ী চলিতেছে। বাঙ্গালী জীমূতবাহনের দায়ভাগ, বাঙ্গালী শূলপাণির স্মৃতি নিবন্ধ তাঁহাদের 'আইন' ও 'ব্যবহার' (Usages) নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। গৌড়ীয় সভ্যতার প্রভাব হইতে কামরূপকে কিছুতেই স্বতন্ত্র করিবার উপায় নাই।

---

* দয়ানন্দ সরস্বতীর "সত্যার্থ প্রকাশ" ৪২০—৪২৪ পৃষ্ঠা ও সৈরমুতাখরীন্ দ্রষ্টব্য।

আমাদের মতে—মিথিলা, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গাদির (উৎকলাদির) ন্যায় কামরূপের অধিবাসিগণেরও সভ্যতা, ধর্ম্ম, ভাষা এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রায় একইরূপ ছিল এবং অন্ততঃ তাহাদের অধিকাংশই জাতিতে আর্য্য ছিলেন। কামরূপের ভাষা (অসমীয়া), আর্য্য ভাষাই এবং বাঙ্গালা ভাষার সহিত সহোদরা ভগিনীর ন্যায় নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। "ললিত বিস্তর" নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত বুদ্ধ চরিতাখ্যান বিষয়ক গ্রন্থে [খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই পুস্তক চীন দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল] দেখা যায়—খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব যুগ হইতেই' 'বঙ্গলিপি" নামক এক পৃথক্ লিপির অস্তিত্ব আছে। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তে যত তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই এই "বঙ্গলিপির" সাহায্যেই লেখা হইয়াছিল। বর্ত্তমান দেবনাগরী লিপি, বঙ্গলিপির তুলনায় নিতান্ত আধুনিক। আর্য্যাবর্ত্তের প্রত্যেক লিপির জননী, 'গুপ্তলিপি' হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মূল হইতেছে খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মীলিপি। এই লিপিতে অশোকানুশাসন এবং উড়িষ্যার "হাতীগুম্ফা লেখা"দি লিখিত হইয়াছিল। মৈথিল ভাষার কথা এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই বড়াই করিয়াছেন। উড়িয়া ভাষার কোন রচনা যদি বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা যায়, তাহা হইলে উহা শুনিতে বাঙ্গালা ভাষাই শুনাইবে। উড়িয়ারা 'ণ'কে ড়' এবং পদগুলি স্বরান্ত উচ্চারণ করে বলিয়া উড়িয়া ভাষা কড় মড় গোছের শুনায়। বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের কবিতা অপেক্ষা উড়িয়া কবিতা বুঝিতে বাঙ্গালীর কষ্ট হইবে না। মৈথিল, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষা আমাদের বাংলা ভাষার এত নিকটস্থ যে ঊনবিংশ শতাব্দের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা উহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষার প্রকারভেদ (Dialectal variations)

বঙ্গলিপি ও বঙ্গভাষা সহ মৈথিলাদি ভাষার সম্বন্ধ

বলিয়াই গ্রহণ করিতে ছিলেন। মৈথিল বা ত্রিহুতি অক্ষর প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরের প্রকারভেদ মাত্র এবং এখনও অসমীয়া ভাষা, বাঙ্গালা লিপিতেই লেখা হইতেছে।

খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে (৯৬৬ খ্রীঃ অব্দে) কাম্বোজ বংশীয় এক নরপতি পুণ্ড্র বা বারেন্দ্র দেশের তৎকালীন পাল ভূপতি দ্বিতীয় গোপাল অথবা দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল দেবকে পরাস্ত করিয়া কোটীবর্ষবিষয়ে (দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে) রাজধানী স্থাপন করত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কোচ ও রাজবংশী মঙ্গোল গন্ধী কাম্বোজ নৃপতির সৈন্য সেনানীর বংশধর নহে

[গৌড় রাজমালা ৩৫ পৃষ্ঠা]। এই কম্বোজ বা কাম্বোজ দেশ বর্ত্তমান কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে উল্লেখ আছে —কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ আত্মীয়তার জন্য কৌরব পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজা আদিশূর এই কাম্বোজের নিকটবর্ত্তী দরদ দেশ (আধুনিক দার্দ্দিস্থান) হইতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, যথা—"আগেমদ্ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ" [ধ্রুবানন্দ কারিকা, ১২ পৃষ্ঠা]। আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়ন করার সত্যতা কেবল জনশ্রুতি এবং পরবর্ত্তী যুগের কুলশাস্ত্রের গল্পের উপর নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত বাণগড়ের কাম্বোজ বংশীয় ঐ রাজা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাম্বোজ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বলেন— "আধুনিক কোঁচ বা কোচ জাতির পূর্ব্বপুরুষ হইতেছে ঐ বাণগড় লিপি-বিবৃত জাতি।" কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের পদানুবর্ত্তী হইয়া এদেশের কোন কোন বিদ্বান 'কাম্বোজ' শব্দে তিব্বত দেশ বুঝিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে—"আধুনিক কোচ এবং রাজবংশী জাতির লোক, গৌড় বিজয়ী তিব্বতীয় মঙ্গোল-গন্ধি ঐ কাম্বোজ বংশীয় নৃপতির স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় সৈন্য এবং সেনানীগণের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং

ক্রমশঃ তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে সমগ্র উত্তর বঙ্গ এবং আসামের অধিকাংশ ভূভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাম্বোজীয়ারাই উত্তর বঙ্গে এবং কামরূপে মঙ্গোলীয় ভাষা এবং আচার প্রভৃতির প্রচারক।" আমাদের মতে—এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন বলবৎ প্রমাণ নাই এবং উক্ত মতবাদ (Theory) কেবল কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কতকগুলি শূন্যগর্ভ কল্পনার ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ায় নির্ব্বিবাদরূপে গ্রহণের অযোগ্য।

মৈথিল ব্রাহ্মণ ও মৈথিল ভাষার প্রভাব

কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের উদ্ভবের বহু পূর্ব্ব হইতে কোচবিহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবমন্দির, গোসানীমারীর শক্তিমন্দির এবং আরও কতকগুলি শৈব এবং শাক্ত মন্দিরের ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে জল্পেশ্বর শিবমন্দিরের দেউড়ী, পুরোহিত বা সেবাইত ব্রাহ্মণেরা মৈথিল শ্রেণীর। গোয়ালপাড়া এবং রংপুর অঞ্চলের কোন কোন প্রাচীন শৈব ও শক্তিমন্দিরে এখনও (অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) মৈথিল শ্রেণীর সেবাইত ব্রাহ্মণ আছেন। এই ব্রাহ্মণেরা এখনও কেবল আদিম স্থান ত্রিহুত বা মিথিলা দেশের সহিত—[বাঙ্গালার রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য ইত্যাদি নামে পরিচিত ব্রাহ্মণেরা যাহা করেন না]—বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন। এই মৈথিল দেউড়ী বা দেবল ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন কামরূপ ভূমিতে বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন। কামরূপ এবং মিথিলার মধ্যে পুণ্ড্রক ও ক্ষুদ্রকায় বারেন্দ্র বিভাগ বর্ত্তমান। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব যুগ হইতে 'মিথিলা', কামরূপ, বারেন্দ্র ও বঙ্গের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত ছিল। বাঙ্গালা, মিথিলা এবং প্রাচীন কামরূপে স্মরণাতীত কাল হইতে যে এক প্রকার লিপি, অক্ষর বা বর্ণমালা (বঙ্গলিপি বা ত্রিহুত লিপি) প্রচলিত এবং এই সকল অঞ্চলের ভাষাও যে প্রায় একইরূপ ছিল, তাহা পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন।

কামরূপ মণ্ডলে ধর্ম্ম, আচার আদি বৈচিত্র্যময় হইবার কারণ ও অসমীয়া ভাষা

কামরূপ মণ্ডলের আদিম এবং উপনিবেশী অধিবাসীগণের ভিতর আর্য্য এবং অনার্য্য অথবা সভ্য এবং অসভ্য নানাপ্রকার জাতির নানা প্রকার আচার-ব্যবহারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কামরূপের দক্ষিণাংশে (ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমান্তে) গারো পাহাড়ের নিকটস্থ প্রদেশে 'গারো' জাতির এবং উহার উত্তরাংশে মিশমি, আবর, ডাফলা হিমালয়ের পাদসন্নিহিত প্রদেশে এবং মিকির প্রভৃতির এবং অন্যান্য স্থানে কোচ, মেচ এবং কচারি নামক জাতির নিবাস অনেক কাল হইতেই আছে। ইহাদের অতিরিক্ত পূর্ব্বসীমান্তস্থিত 'পাটকই' পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া ব্রহ্মের উত্তরাংশের অধিবাসী 'শান' জাতির অনেক নরনারী আসিয়া এদেশের পূর্ব্বাংশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল এবং দেশ 'অসম' ছিল বলিয়া উহারা "আহোম" (আসাম দেশের লোকের মুখে শ এবং স, 'হ' হইয়া যায়) নামে পরিচিত হইয়া পড়ে। গত অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদে ব্রহ্মের রাজা এই দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করেন এবং ব্রহ্মরাজের সেনা এবং কর্ম্মচারিবৃন্দ এদেশের উচ্চ-নীচ সর্ব্ববিধ প্রজার উপর এরূপ অকথ্য উৎপীড়ন এবং অত্যাচার করিতে থাকে যে, সেই দুর্দ্দশা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলেই ব্রহ্মবাসীর নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিরীহ অসমীয়া প্রজাগণ নিষ্কৃতি লাভ করেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে মগ এবং ফিরিঙ্গীর অত্যাচার এবং পশ্চিম বঙ্গে মরাট্টি "বর্গীর হাঙ্গামা" অপেক্ষাও আসামে "মানের অত্যাচার" অধিকতর সর্ব্বনাশকর হইয়াছিল (৩)।

(৩) ব্রহ্মবাসিগণকে আসামের লোকে "মান" বলেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মোঙ্গলপন্থি ভাষাকে Tibeto-Burman, Malay-East Indian এবং

আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি অত্যুচ্চ সভ্যজাতির সহিত অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর স্তরের নানাবিধ পার্ব্বত্য এবং আদিম জাতির একত্র নিবাস এবং সামাজিক সম্মিলন নিবন্ধন এদেশে ধর্ম্ম, আচার, পরিচ্ছদ এবং ভাষা সকলই বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। সংস্কৃত এবং প্রকৃত ভাষার সহিত "তিব্বত-ব্রহ্মীয়" এবং "মালয় পূর্ব্বভারতীয়" জাতির বিবিধ ভাষার সংমিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান "আর্য্যগন্ধি" অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমন্নতি হইয়াছে এবং প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া অনুন্নত এবং অনার্য্যগন্ধি ভাষাগুলি ক্রমশঃ ডুবিয়া গিয়াছে।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি

দ্বাদশ অধ্যায়

গোয়ালপাড়া জেলায় স্মৃতির ব্যবস্থা

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ধুবড়ী বা গোয়ালপাড়া অঞ্চলের পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজে কামরূপীয় স্মৃতি-নিবন্ধাদির উপদিষ্ট ক্রিয়াকলাপের প্রভাব এবং প্রচলন প্রায় একরূপ। তবে, পদ্ধতিকারদিগের মতের প্রভেদে এখনও [অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ]—কিছু কিছু ভিন্নতা চলিতেছে। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় তাঁহার সংকলিত মলমাস তত্ত্বাদি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বগ্রন্থের স্থানে স্থানে যে "কামরূপ নিবন্ধীয় স্মৃতিসাগর" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই স্মৃতিসাগরের মতানুবর্ত্তী "ভাস্করকার"

Mon-Khmer ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। কেহ কেহ বলেন, কামরূপ মণ্ডলে পূর্ব্বে "বোদো" নামক একপ্রকার অনার্য্যমূলক ভাষার অস্তিত্ব ছিল।

শম্ভুনাথ মিশ্র, "কৌমুদীকার" পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, "গঙ্গাজলকার" দামোদর মিশ্র এবং "পদ্ধতিকার" পঞ্চানন প্রভৃতির মতেই গোয়ালপাড়া অঞ্চলের হিন্দুদিগের বৈবাহিক এবং লৌকিক আচার-গুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে যে প্রাচীন মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের কথা শুনা যায়, উহা "মৈথিল মত" নহে। অনেক দিন হইল সেখান হইতে কামরূপীয় স্মৃতিসাগর, এমন কি মহামহোপাধ্যায় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের অষ্টাদশ কৌমুদী গ্রন্থ—[দায়ভাগতত্ত্বকৌমুদী, বিবাহতত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি]—লোপ পাইয়াছে। যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ দামোদর মিশ্র স্মৃতিসাগরের সারাংশ গ্রহণ করিয়া ১৩৫৬ শকে সংক্ষেপে গঙ্গাজল নামক স্মৃতি গ্রন্থ সংকলন করেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজে তাঁহারই মত অনেকটা চলে। 'গঙ্গাজল' রচিত হইবার পরে শম্ভুনাথ মিশ্র কোচবিহারে (?) দ্বাদশ ভাস্কর রচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার উদ্দেশ্য—নব্য স্মার্ত্তমত খণ্ডন করিয়া কামরূপ অঞ্চলে পুনরায় প্রাচীন মত স্থাপন করা। শম্ভুনাথ মিশ্রের বর্ষভাস্কর গ্রন্থের প্রথম শ্লোকপাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। শ্রাদ্ধ-শান্তি, দুর্গোৎসব ও তিথি-ঘটিত ব্যবস্থায় নূতন স্মার্ত্তমত যদিও গোয়ালপাড়া অঞ্চলে অপ্রচলিত, তথাচ সর্ব্বত্রই যে মতদ্বৈধ আছে, তাহা নহে। কোন কোন ব্যবস্থাকে সর্ব্ববাদিসম্মত বলা যাইতে পারে। প্রত্যেকগুলির উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। সম্প্রতি গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজে বিবাহ-বিষয়ক সম্বন্ধ নির্ণয়াংশে—[কচিৎ অন্যান্য কোন কোন অংশেও]—রঘুনন্দনের মত গৃহীত হইতেছে। কামরূপীয় নিবন্ধগুলি ছাপা না হওয়ার কারণে, দিন দিন অধিকতররূপে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং ইদানীন্তন গোয়ালপাড়া

গঙ্গাজল ও দ্বাদশ ভাস্কর

নব্য স্মৃতি

অঞ্চলের ছাত্রগণের কেহ কেহ বঙ্গদেশে গমনপূর্ব্বক স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের নবীন স্মৃতিনিবন্ধ অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া উহাই অধ্যাপনা দ্বারা প্রচলন করায় এবং প্রাচীন অধ্যাপকগণের ক্রমশঃ তিরোধান ঘটায় সেখানে নবদ্বীপের স্মার্ত্তমতের প্রাধান্য ঘটিতেছে। প্রাচীন কামরূপীয় মত অপেক্ষা এই বঙ্গীয় স্মার্ত্তমতে সম্বন্ধ বাছাবাছি কিছু শিথিল হইয়াছে। কামরূপীয় নিবন্ধোক্ত মত ধরিয়া থাকিলে, বরের মহার্ঘ্যতার জন্য কন্যাদের বিবাহ হওয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ঘট হইত।

স্মৃতি নিবন্ধ ভেদের কারণ

প্রাচীন কামরূপে হিন্দুপ্রভাবের সময়ে এবং ক্ষেণ বা কোচরাজ-গণের প্রভুত্ব সময়ে দেশাচারানুমোদিত নব্যস্মৃতি নিবন্ধ—[বাঙ্গালার জীমূতবাহন এবং শ্রীনাথ শিরোমণি বা রঘুনন্দনের অনুকরণে]—রচিত হইতে থাকে। শূলপানি, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, শম্ভুনাথ মিশ্র প্রভৃতি এইরূপ নব্যস্মৃতি নিবন্ধের কর্ত্তা। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশাচারের অস্তিত্বই এইরূপ নিবন্ধ ভেদের কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,

দেশাচারও বেদের মত প্রতিপাল্য

বৈদিক মন্ত্রপাঠ সমন্বিত শাস্ত্রীয় বা ধর্ম্মবিবাহ সংস্কার শূদ্র বর্ণের নাই—শূদ্রাপেক্ষা হীনতর জাতির কথা তো বহু দূরে। দেশাচার ও জাতির আচার উহাদের অবলম্বন। বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দেশাচারও যে বেদের মত প্রতিপাল্য, তাহার প্রমাণ যথা :—গ্রাম বচনং চ কুর্য্যুঃ।১১। বিবাহ শ্মশানয়ো গ্রামং প্রাবিশদিতি বচনাৎ।১২। তস্মাত্তয়োর্গ্রাম প্রমাণ-মিতি শ্রুতেঃ।১৩।—[পারস্কর গৃহ্যসূত্র ৮ম কণ্ডিকা]। সকল দেশের

শিষ্টাচার সর্ব্বত্রই স্মৃতিমূলক

হিন্দুসমাজে সদাচার বা শিষ্টাচার স্মৃতিমূলক। শিষ্টাচার আছে, অথচ কোন সুস্পষ্ট স্মৃতির বিধান পাওয়া যায় না, এরূপ স্থলে যদি অনুমান করা যায় যে, কোনও না কোন স্মৃতির বিধান আছে বা ছিল তাহা হইলে তাহাকে

(শিষ্টাচারকে) অনুমেয়া স্মৃতির অনুমোদিত বলা যাইতে পারে। এই কারণে প্রত্যক্ষ স্মৃতির সহিত কোন শিষ্টাচারের বিরোধ দেখিলে তাহা অনুমেয়া স্মৃতি বলিয়া বাধিত হইবে, অর্থাৎ অগ্রাহ্য হইবে না :—

স্মৃতিমূলোহি সর্ব্বত্র শিষ্টাচারস্তদত্র চ।
অনুমেয়া স্মৃতিঃ স্মৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥

—বৃদ্ধ বশিষ্ট

"সমাজের কল্যাণসাধনে ঋষিদের ব্যবস্থা"র কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। তাঁহাদের মতে শ্রুতি [মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, কল্প, ধর্ম্ম এবং গৃহ্য-সূত্রগুলি] শ্রৌত সাহিত্যের প্রথম স্থান। স্মৃতিসংহিতা যত আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মনুর সম্মান অধিক *। মনু, অত্রি, বিষ্ণু প্রভৃতি কুড়িখানি প্রধান মৌলিক সংহিতার দ্বিতীয় স্থান। এই কুড়িখানি ব্যতীত আরও পঞ্চাশখানি স্মৃতিসংহিতা আছে। কলিযুগে পরাশরের স্থান মনুর অব্যবহিত নীচে। ভাষ্যকার এবং টীকাকারেরা স্মৃতি-সংহিতারই মত মহাভারতের বাক্য "স্মৃতি" বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। স্মৃতিসংহিতার নিম্নে আঠারখানি মহাপুরাণের স্থান। পুরাণেরই মত তন্ত্রগ্রন্থের সম্মান। পুরাণের নীচে আঠারখানি—[বা অধিক]—উপপুরাণের স্থান। সমস্ত মাননীয় শাস্ত্রবাক্যের একবাক্যতা করা অর্থাৎ আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধের সামঞ্জস্য করা মীমাংসক পণ্ডিতগণের প্রথম কর্ত্তব্য। একান্ত অক্ষম হইলে বেদ ও স্মৃতির বিরোধ স্থলে বেদের বাক্যই মাননীয়; তদ্রূপ স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রের বিরোধ স্থলে স্মৃতিবাক্য মাননীয়, ইত্যাদি।

সমস্ত মাননীয় হিন্দু-শাস্ত্রের স্থান ও সম্মান

* যে সকল স্থলে যুগবিপর্য্যয়ে মনুর বাক্য অচল হইয়াছে এবং অপর কোন ঋষির বাক্য মাননীয় হইয়াছে, সেই সকল স্থলে "বিচারপূর্ব্বক" উভয় মতই লিখিতে হয়।

মনুর মত কখনই কোন স্মৃতি অথবা পুরাণের বচন দ্বারা নিরসিত হইতে পারে না। ব্যাস সংহিতায় তাহার প্রমাণ, যথা :—

শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥১।৪
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

কামরূপ অঞ্চলে সামবেদীয় ব্রাহ্মণও আছেন এবং যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে সামবেদীয় প্রাচীন বাসিন্দা ব্রাহ্মণ নাই।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলের যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ

বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই অঞ্চলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছে এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার স্ব স্ব শ্রেণীর বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মত। এই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণের সহিত তত্রত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের আদান-প্রদান এখনও পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) হয় নাই। এই জেলার হাকামা, শালকোচা (১), গৌরীপুর, হাবড়াঘাট ও লক্ষ্মীপুর—এই পঞ্চ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণস্থানের সমষ্টিতে ঘটিত একটী সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যবৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ঝশকাল, হাঁসদহ, বিষখাওয়া, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, কৈমারী, বঙ্গাইগাঁও, বাসুগাঁও, দেওহাটী, ধর্ম্মপুর, অভয়াপুরী, বিজনী, বোয়ালমারি, কাকৈজানা, যোগীঘোপা, পাচনীয়া, মজাইরমুখ, দলগোমা, বুতুড়চড় এবং কাবাইটারী প্রভৃতি স্থানেও পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। হাকামা, শালকোচা, গৌরীপুর, হাবড়াঘাট প্রভৃতি স্থানের কতকগুলি ব্রাহ্মণের কামরূপী গুরু এবং অন্যান্যদের গুরু হইতেছেন দিনাজপুরের ৺ভগবানচন্দ্র গোসাঞীর

(১) শালকোচা—বিজনীর রাজা জয়নারায়ণের সময় এখানে ভীমসেন মিশ্র, রামেশ্বর মিশ্র ও আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম আসিয়া বাস করেন।

পৌত্র। সম্ভবতঃ এই দিনাজপুর প্রাচীনকালে কামরূপের অন্তর্গত ছিল না। বিজনী রাজবংশের গুরু, লক্ষ্মীপুরে বিবাহ করায় ঐ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজভুক্ত হইয়াছেন। বিজনীর খুটাঘাট পরগণার অন্তর্গত বটিয়ামারি ডিহি ও 'উত্তর শালমরা' প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ সমাজভুক্ত আছেন, এখনও তাঁহারা নলবাড়ী, বড়পেটা প্রভৃতি স্থানে বিবাহ করিতেছেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের এই সকল স্থানের ব্রাহ্মণেরা যজুর্ব্বেদীয়। ইহারা যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্যসূত্রাদি অনুসারে অবশ্যকরণীয় সংস্কারগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্রকার দিগের মধ্যে পারস্কর অতি প্রাচীন ঋষি এবং পাণিনী মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী। জৈমিনি, বৌধায়ন, হিরণ্যকেশী এবং আপস্তম্ব প্রভৃতি আরও কতিপয় যজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্রকার আছেন। তাঁহারাও বহু স্থলেই পারস্করের মতানুবর্ত্তী। বৈবাহিক কর্ম্মাঙ্গগুলি [অর্থাৎ নান্দিমুখশ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হস্তোদক প্রভৃতি] কিরূপে করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ গৃহ্যসূত্রাদিতে না থাকায়, সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য 'পদ্ধতি'গুলি রচিত হইয়াছে। যজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে সর্ব্বদেশপ্রচলিত পারস্কর-গৃহ্যসূত্রকে অবলম্বন করিয়া গৌড়-বাঙ্গলার অন্তিম হিন্দুরাজা মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের সভাপণ্ডিত এবং স্মৃতিশাস্ত্রে অতি প্রবীণ প্রাজ্ঞ ভূপতিপণ্ডিত পশুপতি যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের—[প্রসঙ্গতঃ দ্বিজমাত্রেরই]—জন্য 'দশকর্ম্ম পদ্ধতি' প্রণয়ন করিয়া হিন্দুসমাজের মহদুপকার করিয়া গিয়াছেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরাও পশুপতি পণ্ডিতের মতানুবর্ত্তী। পঞ্চানন-কৃত 'দশকর্ম্ম পদ্ধতি'ও গোয়ালপাড়া ও পশ্চিম-কামরূপ অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানের তদ্রূপ একখানি পদ্ধতি। বঙ্গদেশে কালেশি-কৃত ঋগ্‌বেদীয় পদ্ধতি, ভবদেব ভট্ট-কৃত সামবেদীয়

পারস্কর গৃহ্যসূত্র

পশুপতি পণ্ডিতের দশকর্ম্ম পদ্ধতি

সংস্কার পদ্ধতি, পশুপতি অথবা রামদত্ত-কৃত যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতির প্রচলন আছে।

গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাচীন 'কমতাপুর' বা আধুনিক কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধসমূহের মধ্যে

কোচবিহারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধ ও পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণ-সমাজ

স্মৃতিসাগরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তত্রত্য পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণসমাজে পূর্ব্বোক্ত 'কৌমুদী', 'গঙ্গাজল' এবং তাহার পরে 'ভাস্কর' স্মৃতির প্রচলন থাকিলেও বর্ত্তমানে (অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) কোন কোন স্থলে বাঙ্গালী শূলপানি ভট্টের 'বিবেক' স্মৃতি চলিতেছে। এখানে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহে সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ সেনরাজবংশীয় মহারাজাধিরাজ লক্ষণসেন দেবের সভাপণ্ডিত পশুপতির সংকলিত পদ্ধতির মতে অধিবাস এবং হস্তোদক হইতে প্রত্যেক কার্য্যই সম্পন্ন হয়। কোচবিহার রাজধানীর উপকণ্ঠস্থিত খাগড়াবাড়ীর ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ঐ পাঁচটী পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহাদিগের বিবাহের আদান-প্রদান আছে। খাগড়াবাড়ীর ব্রাহ্মণেরা প্রায় চারি শত বৎসর হইতে সেখানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে বাস করিতেছেন। তোর্ষা নদীর পূর্ব্ব পারে খাগড়াবাড়ী, গুড়িয়াহাটী, এবং পশ্চিম পারে অবস্থিত টাকাগাছ, কামিনীর ঘাট এবং ময়নাগুড়ি এই পাঁচটী গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণকে সাধারণতঃ "পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ" বলা হয়। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোচরাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোচবিহার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সীমার অন্তর্গত থাকায় ইহা-দিগকেও "কামরূপীয় বলা যাইতে পারে। আর কামরূপের ব্রাহ্মণেরাও "পাশ্চাত্য বৈদিক" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মূলতঃ পাশ্চাত্য বৈদিকেরা 'কন্নৌজী',—আমাদের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্ররাও সেই পরিচয়

দিয়া থাকেন। মৈথিল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কোচবিহারের পঞ্চগ্রামী পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত কামরূপ জেলার বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ কোচবিহারের মফঃস্বল নিবাসী ক্ষেণ, রাজবংশী এবং বুরিসজ্জন প্রভৃতি জাতির পৌরহিত্য করিবার উদ্দেশ্যে বাস করিতেছেন। মৈথিল ব্রাহ্মণ বাচস্পতি মিশ্র একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তনিবন্ধকার ছিলেন। যাহা হউক, আর্য্যাবর্ত্তে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল এবং উৎকল এই পাঁচ রকম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা :—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলাশ্চোৎকলাঃ।
এতে পঞ্চ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
—স্কন্দ পুরাণীয় বচন

খাগড়াবাড়ীর ব্রাহ্মণেরাই সম্ভবতঃ কোচবিহারে ভদ্র আচারের প্রবর্ত্তক।

কোচবিহারে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির সমাজ

এখানে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ জাতির কোন বিশেষ সমাজ বা প্রতিপত্তি নাই। কোচবিহার সহরে (town) নবাগত চাকুরীয়া এবং ওকলাতি ইত্যাদি ব্যবসায় ব্যপদেশে আগত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং রাঢ়ীয় ব্রহ্মণ আছেন। মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ প্রভৃতি মহকুমায় এবং সদরে নানাস্থান হইতে সরকারী বা বে সরকারী চাকুরী অথবা নানাপ্রকার ব্যবসায় উপলক্ষে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য প্রভৃতি জাতি বাস করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে তাঁহাদের কোন সমাজ নাই। কোচবিহার সহরে এক ঘর বারেন্দ্র কায়স্থ আছেন। তাঁহারা উত্তর বঙ্গের সমশ্রেণী কায়স্থের সহিত আদান-প্রদান করেন। এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ক্ষেণের মধ্যে "বক্সী" উপাধি আছে। এখানকার বক্সী উপাধিধারী কায়স্থরা কামরূপ হইতে আগত। তাঁহারা গত চারি পুরুষ হইতে কখনও মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ইত্যাদি জেলার দক্ষিণ

রাঢ়ীয় এবং কখন বা গোয়ালপাড়া জেলার কায়স্থদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন। এই জেলায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে গৌরীপুর, হাকামা, শালকোচা ঝাপসাবাড়ী, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, শিমলী-কুমলী, যোগীঘোপা এবং দক্ষিণ পারে দলগোমা, বালীজানা প্রভৃতি স্থানে প্রকৃত কায়স্থগণ বাস করিতেছেন। ইঁহাদের সমাজপতি হইতেছেন গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়। ইনি কামরূপীয় কায়স্থ। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত রামকৃষ্ণ বড়ুয়ার ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার ১৩২৯ বঙ্গাব্দে এবং তৎপরে শ্রীযুত রামকৃষ্ণ বড়ুয়ার এক কন্যার—এই তিনজনেরই বিবাহ কলিকাতায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্রবংশীয় কায়স্থের গৃহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে কোচবিহারের রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতা হওয়ায় ঐ বড়ুয়া বংশ ধন্য হইয়াছিলেন কিনা, পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে কায়স্থের বাসস্থান

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে আজিও কন্যার বাল্য-বিবাহের প্রচলন আছে। ঐ অঞ্চলে প্রথমে বর পক্ষের আগ্রহে 'কন্যাযুড়া' (বিবাহার্থ কন্যা প্রার্থনা) আরম্ভ হয়। [ইদানীং কিন্তু 'বরযুড়া'র প্রচলন ক্রমশঃ হইতেছে]। কন্যাকর্ত্তা কন্যাদানে স্বীকৃত হইলে বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ উভয় পক্ষের সুবিধা মত একদিন মৎস্য, দধি, সন্দেশ, চিনি এবং পান প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং সিন্দুর সহ কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইবার পর জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ কোনও

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 'কন্যা-জুরা' ও কোষ্ঠী দেখা

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা বর-কন্যা উভয়ের কোষ্ঠী দেখাইয়া বিবাহের শুভ-দিন-ক্ষণ ও লগ্ন অবধারিত করেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বজাতীয় মাতব্বরগণ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং পুরনারীগণের উলুধ্বনি হইতে থাকে। সেখানে উপস্থিত আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবাদি ব্যক্তিগণকে এবং কন্যাকর্ত্তার বাড়ীর লোক-দিগকে উক্ত দধি-সন্দেশাদি বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আসিয়া থাকিলে গ্রামের অনেকেই কিছু কিছু ভাগ পাইয়া থাকেন। যাহা হউক, আসাম অঞ্চলের সর্ব্বত্র উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজে 'রাজযোড়া' ব্যতীত মিত্রষড়ষ্টক, সমসপ্তক, নবপঞ্চম, মিত্রদ্বিদাদশ, তৃতীয় একাদশ, দশচতুর্থক ও একাধিপত্য মিলন প্রভৃতি ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের লিখিত শুভাশুভ মিল দেখিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করার সময়ে ব্রাহ্মণ জাতির অভিভাবক বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির বিবাহ-সম্বন্ধে পুরোহিতই সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, কামরূপের

কামরূপে কোষ্ঠী দেখা ও যর-বর চাওয়া

উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু-সমাজে দেখা যায় যে, বর-কন্যার কোষ্ঠী বিচার দ্বারা 'যোড়া' (রাশি গণ প্রভৃতি) মিলিলে পাত্রপক্ষ, কন্যার হস্তরেখার লক্ষণাদি অবগত হইবার জন্য তাহার পিত্রালয়ে শাস্ত্রজ্ঞ জনৈক দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দেন। সেখানে হাত চাওয়া ক্রিয়া হয়। ইহার বিষয় আমরা নবম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে তৎপরে কন্যাপক্ষ হইতে মূল কোষ্ঠী লওয়া হইত। এই কোষ্ঠী লওয়া ক্রিয়াটী তেলর ভার এর অনুরূপ ছিল। ব্যয়-বাহুল্য হেতু বর্ত্তমানে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) এই প্রথাটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে "তেলর ভারের" দিন বরের বাড়ীতে কন্যার কোষ্ঠী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, "হাত চাওয়া" ক্রিয়ার পর কন্যাকর্ত্তা অথবা

কোন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি বরের বাটীতে গিয়া বর ও তাঁহার ঘরের অবস্থা দর্শন করেন। ইহাকে ঘর-বর চাওয়া বলে। বরপক্ষ ঘর-বর-পরিদর্শক ব্যক্তিকে 'সরাই' করিয়া মূল্যবান বস্ত্রাদি সহ বহু সম্মান করেন। ঘর-বর পছন্দ হইলে কন্যাপক্ষ বিবাহ দিব বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দ্বারা বিবাহের দিন স্থির করেন।

গোয়ালপাড়া জেলায় বর-কন্যার শুভ-বিবাহের দিন স্থির করিবার পূর্ব্বে কোন এক শুভ-দিনে "চিড়া খোলা" বা "চড়া খোলা" নামক স্ত্রী আচার অনুষ্ঠিত হয়। 'খোলা'র অর্থ হইতেছে—মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ। এই পাত্রটী মাটীর সরা অপেক্ষা চার পাঁচ গুণ বড়। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে হীরা জাতির লোকেরা খোলা প্রস্তুত করে। ইহারা কুম্ভকার নহে। হীরারা হাঁড়ি, কলসি হাতে করিয়া তৈয়ার করে (২)—চক্রের ব্যবহার করে না। ইহারা জল আচরণীয় নহে। ইহাদের চালচলন নিম্ন-শ্রেণীর মত। যাহা হউক, উক্ত খোলা সাধারণতঃ চিঁড়া ভাজার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ভাত, লুচি, তরকারী আদিও অনায়াসে প্রস্তুত করা চলে। সিন্দূর ফোঁটা দেওয়া তিন খানি নূতন 'আখা'র উপর চড়াইয়া দিয়া বর-কন্যার জন্য চিঁড়া ভাজাকে "চিড়া খোলা দেওয়া" বলা হয়। 'আখা' শব্দের অর্থ 'উনানের ঝিঁক' বা 'মৃত্তিকা নির্ম্মিত উচ্চ ইষ্টক বিশেষ'। বর-কন্যার জন্য চিড়া ভাজা কালে সধবা স্ত্রীলোকেরা মাঙ্গলিক গীত গায়েন ও উলুধ্বনি করিতে থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গে "উলু-লু" শব্দ করাকে "জোকার দেওয়া" বলে। কোচবিহারেও "জোকার দেওয়া" কথার প্রচলন আছে। ঐ "চিড়া খোলা"র দিনে অথবা অন্য কোন শুভ-দিনে 'গন্ধ তৈল করা" নামক আর একটী স্ত্রী-

চিড়া খোলা দেওয়া

(২) নগাঁও জেলার কোন কোন মৌজায় চাঁড়াল জাতীয় লোকেরা হাঁড়ী, কলসি আদি তৈয়ার করে।

আচার পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। মুথা, মেথি, অগুরু এবং চন্দনাদি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যসংযোগে তৈল পাক করার নাম 'গন্ধ তৈল করা'। সুপক্ক তৈল অত্যুষ্ণাবস্থায় নামাইয়া বর-কন্যার নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে দুইটী কাঁচা পান পাতা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহার নামের পান অধিকতর 'ছন ছন' শব্দ করিবে ভাবি-দাম্পত্য জীবনে কখনও ঝগড়া-ঝাঁটি হইলে তাঁহারই জয় হইবে। ইহা গোয়ালপাড়া অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর নারীসমাজে প্রচলিত প্রবাদ বাক্য। সধবা স্ত্রীলোকেরা পানের ছন্ ছন্ শব্দকালে মাঙ্গলিক গীত গায়েন এবং হুলুধ্বনি দিয়া আমোদ-আহ্লাদ করেন। ইহার পরে ঐ তৈল প্রথমে গৃহদেবতার গাত্রে তৎপরে গ্রাম্য দেবতার গাত্রে কিছু কিছু ছড়াইয়া অবশিষ্ট অধিবাসে এবং বিবাহের নয় আট দিন পর্য্যন্ত বর-কন্যার ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়।

গন্ধ তৈল করা

আমরা ১৫ ও ১৮ পৃষ্ঠায় "গাত্র-হরিদ্রা"র কথা বলিয়াছি। অধিবাস এবং গায়ে হলুদ হওয়া বা আইবড় ভাত দেওয়া হইয়াছে এরূপ কন্যাকে "কৃতকৌতুক মঙ্গলা" বলে। গোয়াল পাড়া মহকুমার ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজে বিবাহের পূর্ব্বদিন অধিবাসকালে একখানি নূতন কুলাতে মাসকলাই, কাঁচা হরিদ্রা, সাতটী কড়ি, কয়েকগাছি খড় (উলু ঘাসের শুক্না ডাঁটা) ও একটী আম্রশাখা সংরক্ষিত থাকে। অধিবাসের পর বর বা কন্যার দ্বারা ঐ কুলার উপরেই পাথরের নোড়া দিয়া ঐ মাসকলাই ও হরিদ্রা ভাঙ্গাইয়া এয়োস্ত্রীগণ বর বা কন্যাকে উহা স্পর্শ করান। বিবাহের দিন বৈকালে আভ্যুদয়িকের পর বর এবং কন্যা উভয়ের বাটীর সধবা স্ত্রীলোক উহাকে উত্তমরূপে বাটিয়া বর অথবা কন্যার গায়ে গন্ধতৈল সহ

গাত্রে হরিদ্রা ও গন্ধ তৈল মাখাইয়া স্নান

মাখাইয়া স্নান করান। কুলায় রাখা কড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য 'সোহাগ তোলা' কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। লক্ষ্মীপুরে রাজবংশী ভূম্যধিকারী দিগের বাটীতে অধিবাসের দিন বৈকালে 'বৈরাতি' (এয়োস্ত্রী)রা প্রাঙ্গণস্থ কলাগাছ তলায় বর অথবা কন্যার 'গাত্র হরিদ্রা' দিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'গায়ে হলুদের' উদ্দেশ্য (খুব সম্ভব) বর বা কন্যার গায়ের রংটা একটু ফরসা করিয়া দেওয়া। এ দেশে উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় রঙ্ খুব পছন্দ—"চাম্পেয় গৌরী" বা চাঁপা ফুলের রঙের খুব প্রশংসা। কালো দেহে তেল হলুদ মাখাইলে কতকটা স্বর্ণবর্ণের (yellow) মত দেখায়। পূর্ব্ববঙ্গে কোন এক শুভ-দিনে বিবাহের পূর্ব্বে বিশেষ ঘটা করিয়া "হলুদ কোটা" করা হয়। গোয়াল-পাড়া মহকুমায় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজভুক্ত বর কন্যার বাটা হরিদ্রা মাখিয়া স্নান করা ব্যতীত গাত্রহরিদ্রার অন্য কোন অনুষ্ঠান নাই। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে—[উড়িষ্যায়ও]—নিত্য তেল-হলুদ মাখার ব্যবহার আছে। যাহা হউক, সংস্কারার্থী বা সংস্কারার্থিনী বালক-বালিকাদের অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক সংস্কারে গায়ে হলুদ দেওয়া হয়।

অধিবাস—ইহা বিবাহের পূর্ব্বে অবশ্য করণীয় একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিশেষ। এই পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় অসমীয়া হিন্দুদিগের অধিবাসের কথা আমরা বলিয়াছি। গোয়াল-পাড়া জেলায় অধিবাসের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার পর বরপক্ষীয় কয়েকজন ব্যক্তি অধিবাসের ভার ও বাদ্যকর সহ কন্যার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। এই ভারগুলির মধ্যে একখানি মৎস্য ও গন্ধ তৈলের, একখানি কলার এবং অপর একখানি চাউলের ভার। এতদ্ব্যতীত সাধ্যমত অলঙ্কার, শঙ্খ, সিন্দুর, গন্ধতৈল, পান, সুপারি, দধি, চিনি, একখানি উড়ানী (চাদর), আয়না, চিরুণী,

অধিবাসের ভার

একটী বাক্স, একখানি অধিবাসের সাড়ী ও একখানি রঙিন গামছা—[অবস্থা স্বচ্ছল হইলে বোম্বাই, পার্শি অথবা বেনারসী—এই তিন রকম শাড়ীর মধ্যে যে কোন একখানি ভাল সাড়ী]—পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কন্যার বাড়ীতে এই দ্রব্যগুলি সহ প্রেরিত ঐ ভারকে "অধিবাসের ভার" বলে। অধিবাসকালে কন্যাকে গন্ধতৈল মাখান হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বরপক্ষের বাটী হইতে স্ত্রীলোক গিয়া কন্যাকে ঐ শঙ্খ ও সিন্দুর (৩) পরাইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে ভদ্রলোকের বাটী হইতে কন্যার পিত্রালয় স্ত্রীলোক পাঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ কারণ, কন্যার আত্মীয়া স্ত্রীলোকেরা কন্যাকে উহা পরাইয়া দেন। ইহার পরে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অধিবাস হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ঋগ্‌বেদীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বদিনে অধিবাসের দ্রব্যাদি যথাবিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে।

অধিবাসের অর্থ

'গঙ্গাজল' নামক স্মৃতি নিবন্ধে 'অধিবাস' শব্দ আছে, কিন্তু উহার অর্থ নাই। "সংস্কারোগন্ধমাল্যাদ্যৈস্তৎস্যাদধিবাসনম্" - অমরকোষের এই শ্লোকানুসারে গন্ধ এবং মাল্য প্রভৃতি মাঙ্গলিক পদার্থ দ্বারা সংস্কার বিশেষকে 'অধিবাসন' বা 'অধিবাস' বলে। এ সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণিতেও পাওয়া যায়—"গন্ধমাল্যাদিনা যস্তু সংস্কারঃ সোঽধিবাসনম্"। কোলব্রুক সাহেব অধিবাসনের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—Adjusting with perfumes, with fragrant wreaths, resins etc. যাহা হউক, 'বাস' শব্দের অর্থ সুগন্ধ। 'অধিবাস' শব্দে সাধারণতঃ "দেহকে সুগন্ধযুক্ত করা" বুঝায়।

(৩) গোয়ালপাড়া অঞ্চলের কুমারীরাও কপালে সিন্দুর পরিধান করেন। ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুকুমারীদের বিবাহের পূর্ব্বে এই প্রথাটী প্রতিপালিত হয় না।

অধিবাসকালে ঘটস্থাপনা করিয়া উহাতে সিন্দুরদান করা হয়। সামবেদীয় ভবদেবের পদ্ধতিতে "ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণম্। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে" এই মন্ত্রটী আছে; কিন্তু গুণবিষ্ণু, "সিন্ধোঃ" অর্থে "উদকস্য" অর্থাৎ "জলের" করিয়াছেন। সিন্দুরের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। অধিবাসের বস্ত্রখানি পরিধান করাইয়া অধিবাস-ক্রিয়া সম্পাদিত করিতে হয়। কাল রং শুভপ্রদ নহে বলিয়া ঐ কাপড়ের পাড় লাল অথবা অন্য রংয়ের হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য সাড়ী ও গহনাগুলি বিবাহের পরদিন কন্যা পরিধান করে। সম্প্রদানকালে পিতৃদত্ত অলঙ্কার পরাইয়া সম্প্রদান করা হয়। বিবাহের পর অধিবাসের সাড়ীখানি নাপিত পাইয়া থাকে।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের অনুগত ভদ্রসমাজে পঞ্চানন-কৃত 'দশকর্ম্ম পদ্ধতি' গ্রন্থের বিবাহ-বিধি অনুসারে অধিবাস করান হয় এবং নিম্ন শ্লোকের লিখিত দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা ঐ কার্য্য করান হয়:—

রজতং শিলকঞ্চৈব তৈলং গন্ধং ক্রমেণ চ।
কজ্জলং শান্তিকরণং ধূপো দীপস্তথা পরে॥
অঞ্জনং সিন্দূরং পুষ্পং ফলং খড়্গমুদাহৃতম।
দর্পণং দধি নির্ম্মচ্ছং স্থিরীকরণ রক্ষণম॥

রজত, শিলা, গন্ধতৈল প্রভৃতি দ্রব্য অধিবাসকালে মস্তকে, কপালে ও হস্তে যথাসম্ভব স্পর্শ করাইতে হয়। **বাঙ্গালা দেশে** বরণডালাতে "মহী" (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, কজ্জল, গোরোচনা, শ্বেতসর্ষপ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ, দর্পণ, চামর, শঙ্খ, স্বস্তিক এবং সিন্দুর সুন্দরভাবে সাজান থাকে। একটী 'শ্রী' বা 'ছিরি'ও গড়া হয়। এই অধিবাসের দ্রব্যগুলি ঋক্, সাম অথবা যজুর্ব্বেদীয় সকলের পক্ষেই সমান।

গোয়ালপাড়া জেলার প্রথামতই কোচবিহারের পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বিবাহে বর-কন্যার 'অধিবাস' করা হয়।

কোচবিহার এবং উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম-বঙ্গে অধিবাস

পশুপতি পদ্ধতিতে এই অধিবাসের কোনও উল্লেখ নাই। পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গের ভদ্র-সমাজে বরের বাটী হইতে কন্যার বাটীতে অধিবাসের দ্রব্যাদি রীতিমতভাবে পাঠান হয়। দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গে মহী, গন্ধ, শিলা, দূর্ব্বা প্রভৃতি বরণডালার প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ এবং শেষে বরণডালা দ্বারা "অনয়া মহ্যা"—(অনেন গন্ধেন ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রত্যেক দ্রব্যের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক)—"অমুকং বা অমুকীং অধিবাসয়ামি" [অর্থাৎ, এই মৃত্তিকা দ্বারা অমুক বা অমুকীর অধিবাস করি] এই মন্ত্রে অধিবাস-ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় এবং আতপ চাউল ও কলাইডাল বাটিয়া প্রস্তুত 'শ্রী' বা 'ছিরি' নামক স্বস্তিকাকার মাঙ্গলিক একটী বিশেষ বস্তুর দ্বারাও অধিবাস করা হয়। অধিবাসের "ভারের" পরিবর্ত্তে তথায় বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে বরের অভিভাবকের সঙ্গতির অনুরূপ বড় গোছের গায়ে হলুদের তত্ত্ব নামক উপহার-সম্ভার প্রেরিত হইয়া থাকে।

অধিবাসের পর 'কলাইভাঙ্গা' এবং শেষ রাত্রিতে 'চড়াপানি তোলা' ও 'পাছলা কাটা' নামক তিনটী আচার যথাক্রমে বিবাহের

কলাই ভাঙ্গা, চড়াপানি তোলা, পাছলা কাটা ও সোহাগ-ভাত খাওয়া

দিন প্রত্যুষে অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের হিন্দুসমাজেও কলাইভাঙ্গার প্রচলন আছে। বর-কন্যার স্নানার্থ বাটীর সধবারা শীতল জল কুম্ভ ভরিয়া রাখিয়া দেন, তাহাকে 'চড়াপানি তোলা' বলে। 'চড়াপানি' কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলের 'জলসাধা' বা 'জলসহা' প্রথার অনুরূপ। বিবাহের দিন ঐ সধবাদিগকে যে "সোহাগ ভাত" খাওয়ান হয়, তাহার জন্য বিবাহের পূর্ব্ব

দিন একটী কদলীকাণ্ড বর কন্যার দ্বারা সাতপাক সূতা জড়াইয়া লইবার পর কোন একটী সুলক্ষণা এবং সৌভাগ্যবতী সধবা নারী এক নিঃশ্বাসে ঐ কলাগাছ কাটেন। ইহাকেই 'পাছলা কাটা' বলে। 'পাছলার' অর্থ—গাছের ভিতরের মজ্জা বা 'মাইজ'। কলাগাছের মধ্যস্থ মা'জটী পরে বর্ণিত সোহাগ ভাতের ব্যঞ্জনের অন্যতমরূপে ব্যবহৃত হয়। 'সোহাগ' শব্দটী সংস্কৃত 'সৌভাগ্য' শব্দের প্রাকৃত বা অপভ্রংশ। যে পুরুষকে তাঁহার স্ত্রী খুব ভালবাসেন, তাঁহাকে "সুভগ" এবং যে স্ত্রীকে তাঁহার স্বামী অতিশয় ভালবাসেন তাঁহাকে 'সুভগা' বলে। সুভগ এবং সুভগার ভাবকে "সৌভাগ্যম্" বলে। 'সুভগা' বাঙ্গালা ভাষায় 'সুয়ো' বা 'সো' এবং সুভগার বিপরীত 'দুর্ভগা'—'দুয়ো' বা 'দো' হইয়াছে। "সোহাগ ভাত" আচারের মৌলিক উদ্দেশ্য এই যে, সৌভাগ্যবতী (সুয়ো বা সোহাগিনী) নারীগণ থোড়ের ঐ ব্যঞ্জন (৪) খাইলে বড় 'সুভগ' এবং কন্যা 'সুভগা' হইবেন। য়ুরোপীয় নরতত্ত্ব শাস্ত্রের শাস্ত্রীরা এই প্রকার প্রথাকে Homeopathic Magic বলেন।

বিবাহ দিনে পূর্ব্বাহ্নে গোয়ালপাড়া অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু-সমাজে ঘট স্থাপনা করিয়া উভয় পক্ষের প্রথমে গণেশ পূজা, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, চেদিরাজ উপরিচর বসুর (৫) পূজা এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে বসুধারা দেওয়া হয়। ইহার পর বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ) এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। কামরূপ অঞ্চলেও

ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসু-ধারা দান ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ

---

(৪) ঐ ব্যঞ্জন, মৎস্য এবং অতিরিক্ত তৈলসংযোগে ঐ দেশের লোকের রুচিতে নাকি বড়ই সুস্বাদ। যাঁহারা ঐ অত্যুত্তম ব্যঞ্জন খাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই উহার প্রশংসা করিয়াছেন।

(৫) উপরিচর বসু—ইনি আকাশগামী রথে চড়িয়া শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারিতেন বলিয়া ইঁহার এই নাম হইয়াছিল।

বৈবাহিক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অঙ্গভাবে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা হয়। এক্ষণে ষোড়শ মাতৃকা পূজার কথা বলা যাউক। ষোড়শ মাতৃকার নাম যথা:—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, বারাহী (৬) এবং কৌবেরী (৭)। প্রথমে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া উক্ত ঘটের সম্মুখভাগে আলিপনা দ্বারা ষোড়ষটী মণ্ডল লেখা হয়, এবং প্রত্যেক মণ্ডলে এক একটী বদরী ফল (কুল) অথবা অভাবে পাতা রাখিয়া দেওয়া হয়। সেগুলির উপর দধি, দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, সিন্দূর ও বস্ত্রাদি রাখিয়া প্রত্যেক মাতৃকার পূজা করার নাম 'ষোড়শ মাতৃকা পূজা'। কেবল বিবাহে নহে, বালক বালিকাদের প্রত্যেক মাঙ্গল্য কার্য্যে মাতৃকাদের পূজা করিতে হয়। [মহাভারতের বন পর্ব্বে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম-বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মাতৃগণ অতিশয় হিংস্র দেবতা। প্রত্যেক শুভ-কার্য্যের প্রথমে তাঁহাদের পূজা অর্চ্চনা না করিলে তাঁহারা অমঙ্গল করিতে পারেন]। ঘরের উত্তর দিকের 'কুড্যে' (দেওয়ালে অথবা বেড়ায়) সংলগ্ন গোময় লিপ্ত স্থানে কুশপত্রত্রয় নিম্নাগ্র করিয়া তন্নিম্নে তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদল পদ্মে ধান্য ছড়াইয়া দিয়া ঐ গোময় লিপ্ত স্থানে দধি, দূর্ব্বা এবং সিন্দূর দিয়া পাঁচবার অথবা সাতবার ঘৃতধারা দেওয়া হয়। ইহাকেই "বসুধারা দান" বলে। চন্দ্র বংশীয় চেদিকুলের অতি প্রতাপী নরপতি উপরিচর বসু জ্ঞানে, বিদ্যায় এবং ধর্ম্মাচরণে আদর্শ রাজা ছিলেন। একদা দেবগণ এবং ঋষিগণের মধ্যে "যজ্ঞে পশুবধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য অথবা শস্য দ্বারাই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে পারে" এই প্রশ্ন লইয়া বিবাদ বাধিয়াছিল। দেবগণ

(৬) এবং (৭)—ইঁহারা যে মাতৃকাগণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের উপাখ্যানে তাহার উল্লেখ আছে।

কর্ত্তৃক মধ্যস্থ আহূত হইয়া মহারাজ উপরিচর বসু পক্ষপাত বশতঃ দেবগণের অনুকূলে [পশুবধের পক্ষে] মত দেওয়ার জন্য ঋষিগণের অভিসম্পাতে আকাশ হইতে পতিত হইয়া অনন্তকালের নিমিত্ত পাতালে বাস করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার জীবিকা এবং প্রীতির জন্যই "বসুধারা" রূপ ঘৃতধারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মগধ সম্রাট্ জরাসন্ধ এবং "বসু' ঔপাধিক কায়স্থরা চেদিরাজ উপরিচর বসুর বংশজাত বলিয়া পরিচিত। যাহা হউক, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অপর নাম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকে অভ্যুদয়ের হেতু বিবেচনা করা হয় এবং তজ্জন্য ইহাকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বলে। উন্নতি বা কল্যাণ-কামনায় করা হয় বলিয়া তদ্ধিতের নিয়মানুসারে 'অভ্যুদয়' শব্দ হইতে 'আভ্যুদয়িক' শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্বকীয় "উদ্বাহতত্ত্বে" লিখিয়াছেন—"নান্দী-সমৃদ্ধিরিতি কথ্যতে" ইতি ব্রহ্মপুরাণান্নান্দীমুখে, পুত্রাদিসমৃদ্ধিনামাদিরূপে বিবাহে, বিশেষণস্তু বিবাহাদেব পুত্রাদি-সমৃদ্ধিলাভ-জ্ঞাপনায়।" নান্দী [সমৃদ্ধি, কল্যাণ বা উন্নতি] যাহার মুখ বা উদ্দেশ্য, তাহাকে 'নান্দীমুখ' বলে।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বিবাহের দিন বৈকালে আভ্যুদয়িকের পর গন্ধতৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে স্নান করান হয়। বাঙ্গালা দেশের হিন্দুসমাজে গাত্র-হরিদ্রা নামক প্রথা একটী অপরিহার্য্য বৈবাহিক অনুষ্ঠান; কেননা—ইহা দেশাচার।

গন্ধ তৈল ও গাত্র হরিদ্রা

গোয়ালপাড়া মহকুমার ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের অনুগত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজে বর-কন্যার বাটা হরিদ্রা মাখিয়া স্নান করা ব্যতীত "গাত্র হরিদ্রা" নামক বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নাই।

সোহাগতোলা, সধবাদের/ সোহাগ ভাত খাওয়া

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের দিন বৈকালে নাপিতের দ্বারা বর-কন্যাকে ক্ষৌর করান হইলে তাঁহা-

দিগকে স্নান করান হয় এবং তৎপরে "সোহাগ তোলা" নামক স্ত্রীআচার অনুষ্ঠিত হয়। বর ও কন্যার বাড়ীর অথবা প্রতিবেশিনী সধবারা নদীতে—[কাছে নদী না থাকিলে পুষ্করিণীতে] স্ত্রী আচারের বিবিধ আড়ম্বরের সহিত "সোহাগ জল" উঠাইয়া আনেন। ইহার উদ্দেশ্য, ভাবী পতি এবং পত্নীর মধ্যে প্রেমের দৃঢ়তা স্থাপন। এয়োরা এবং বর-কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয় জনৈক নারী উপবাসিনী থাকিয়া বর-কন্যার মস্তকের উপর চন্দ্রাতপের ন্যায় কাপড় ধরিয়া নানা প্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য ছড়াইয়া দেন। সোহাগ তোলার সময় গীতবাদ্য ও ঘন ঘন উলুধ্বনি দেওয়া চলিতে থাকে। 'সোহাগ তোলার' পর বরের বাটীতে বরের এবং কন্যার বাটীতে কন্যার মণিবন্ধে লাল সুতা দিয়া দূর্ব্বাগুচ্ছ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর বর অথবা কন্যার মাতা কিংবা পাঁচ জন অথবা সাত জন সধবা এবং সুভগা মহিলা নূতন হাঁড়ীতে ও খোলায় অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া অখণ্ড কদলী পত্রে ঢালিয়া সাতিশয় আমোদ-আহ্লাদ সহকারে ভোজন করেন। ঐরূপ ভোজনকে "সোহাগ ভাত" খাওয়া বলে। সূতা দিয়া দূর্ব্বাগুচ্ছ বাঁধিয়া দেওয়া প্রসঙ্গে এখানে

পশ্চিম বাঙ্গালার মঙ্গল সূত্র

উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম বাঙ্গালায় কলিকাতার নিকটস্থ অনেক স্থানেই অধিবাসের সময়ে বরণ-ডালায় অধিবাস-দ্রব্যের অন্তর্গত দ্রব্যগুলির সঙ্গে তৈল-হরিদ্রা মাখান নূতন কাটা সূতায় দূর্ব্বার গুচ্ছ বাঁধা থাকে। অধিবাসের পরক্ষণেই পুরোহিত নিজে ঐ দূর্ব্বার গুচ্ছ সমন্বিত এবং তৈল হরিদ্রা-সিক্ত সূত্র বর অথবা কন্যার—[বরের ডান হাতের এবং কন্যার বাম হাতের]—মণিবন্ধে বা কব্জিতে বাঁধিয়া দেন। ইহাকে মঙ্গল সূত্র বা "মঙ্গল কঙ্কণ" বলে। বিবাহ-উৎসবের সমাপ্তি হইলে, সধবা নারীরা এক শুভ মুহূর্ত্তে বর-কন্যা উভয়ের হাতের সূতা খুলিয়া "কঙ্কণ মোচন" করেন। প্রাচীন কবি ভবভূতি তাঁহার "মহাবীরচরিতম্" নাটকে রাম-সীতার বিবাহের পর "কঙ্কণমোচন" করার উল্লেখ

করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে বিবরণটী এইরূপ :—রাম-সীতার বিবাহের পর, উৎসবানন্দের সময়ে, সহসা নিখিল-ক্ষত্রিয়-শত্রু অতিমাত্র রুষ্ট পরশুরাম হরধনুর্ভঙ্গকারক শ্রীরামচন্দ্রকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহা আস্ফালন এবং অত্যধিক আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া জনককে বলিলেন,—"দেব্যঃ কঙ্কণমোচনায় মিলিতা রাজন্ বরঃ প্রেষ্যতাম্"; অর্থাৎ—"হে রাজন্, রাণীরা বরের হস্তসূত্র খুলিয়া দিবার আয়োজন করিতেছেন, বরকে পাঠাইয়া দিউন।" তখন জনক এবং তাঁহার পুরোহিত শতানন্দ, রামকে বলিলেন—"বৎস রামভদ্র, তোমার শ্বাশুড়ীরা তোমাকে ডাকিতেছেন, অতএব তুমি কঞ্চুকীর সহিত যাও"—[মহাবীর চরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক]।

উক্ত সোহাগ ভাত খাওয়ার পর বাটীর মহিলারা বরকে সুসজ্জিত করেন। এই সজ্জার বিবরণ যথা :—মস্তকে উষ্ণীষ, ললাটে স্বর্ণ বটের আটা ও সোহাগার খৈ দ্বারা ফোঁটা, কণ্ঠে—পুষ্পমাল্য, মণিবন্ধে—রক্ষা বন্ধন (দূর্ব্বার আঁটী) গাত্রে—উত্তরীয় এবং পরিধানে রঞ্জিত বস্ত্র। তৎপরে শুভক্ষণে বর, কন্যার বাড়ী যাত্রা করেন। উক্ত সোহাগার খৈ দ্বারা ফোঁটা দেওয়ার প্রথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এখানেও Homoeopathic Magic এর প্রয়োগ হইয়াছে। সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতু জুড়িবার জন্য টঙ্কণ (Borax) নামক ক্ষার জাতীয় পদার্থের সাহায্য আবশ্যক হয়। দুইটী ধাতুর অংশ জুড়িতে সাহায্য করে—[মিলন করে] —বলিয়া বাঙ্গালায় উহাকে সোহাগা ["সৌভাগ্য" শব্দের অপভ্রংশ] বলে। বর এবং কন্যার মিলন (Flux)এর মত সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বরের কপালে উহার ফোঁটা দেওয়ার প্রচলন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার "উদ্বাহ তত্ত্বে" মৎস্য পুরাণের নামোল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে "সৌভাগ্য তিলকের" বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

বর সাজ ও বরের কন্যা বাড়ী যাত্রা

"সৌভাগ্য তিলকমাহ মৎস্যপুরাণম্—
গোরোচনং স গোমূত্রং শুষ্ক গোশকৃতং তথা।
দধি-চন্দন-সম্মিশ্রং ললাটে তিলকং ন্যসেৎ।
সৌভাগ্যারোগ্যকৃদ্ যস্মাৎ সদা চ ললিতাপ্রিয়ম্॥"

অর্থাৎ—গোরোচনা, গোমূত্র, শুক্‌না গোবর, দধি এবং চন্দন মিশ্রিত করিয়া ললাটে তিলক দিবে। ইহা সৌভাগ্যজনক, আরোগ্যকারী এবং সর্ব্বদা ললিতার (দুর্গার) প্রিয়।" যাহা হউক, পশ্চিম বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে বর জাঁতি হাতে মিতবর সহ একই যানে কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহ করিতে যান। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বরের জাঁতি ধারণ কিংবা মিতবর সহ গমনের প্রথা নাই। পূর্ব্ববঙ্গ, মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহার অঞ্চলে বরের হাতে জাঁতি থাকে না,—ধাতুময় দর্পণ থাকে। নাপিত বরকে ঐ দর্পণ দিয়া থাকে। কুমার শ্রীযুত বিপ্রনারায়ণ তত্ত্বনিধি বি-এ মহাশয় বলেন—"কোচবিহার অঞ্চলে রাজবংশী জাতীয় বর যখন বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ী যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মস্তকে—পাগড়ী, হস্তে—দর্পণ, ছুরি, এক জোড়া সুপারি, আম্রপল্লব, ধানের শীষ ও কয়েক গাছি দুর্ব্বা থাকে। হস্তের দ্রব্যগুলি দর্পণের বাঁট সহ বাঁধা থাকে।"

আমরা ২০৩ পৃষ্ঠায় ও ২০৭ পৃষ্ঠায় Homeopathic Magicএর কথা বলিয়াছি। এই বিষয়টী জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ জন্মিতে পারে।

Homeopathic Magic কাহাকে বলে?

কোনও দ্রব্যের নিয়মিতভাবে অধিক দিন ব্যবহারে মানুষের দেহে পীড়ার যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, যেমন Arsenic বা সেঁকো বিষের ফলে উদরাময় অথবা রক্তভেদ; opium বা আফিংএর ফলে দারুণ কোষ্ঠবদ্ধ (obstinate constipation); Chincona বা Quinineএর ফলে পালাজ্বর; Ipecacuahanaর ফলে বমন; Oblum Recine বা এরণ্ড তৈলের ফলে জলবৎ ভেদ—ইত্যাদি, ঐ দ্রব্যগুলি

ঐ ঐ Homœpathic মতের ঔষধ। ইহার যুক্তি এই—"সমঃ সমং শময়তি"। কোন মানুষের উদারাময় বা রক্তভেদ পীড়া হইলে Arsenic, দারুণ কোষ্ঠবদ্ধ হইলে আফিং, পালাজ্বর হইলে Chincona বা quinine, বমন রোগে Ipecac (Ipecacuahana) এবং জলবৎ ভেদে Oleum Recini [এরণ্ড তৈল,] ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলে ভাল হইবে। "বিষের ঔষধ বিষ" বা *Similia Similibus Curantur* or, "like things are cured by the like" ইহাই Homeopathyর মূল নীতি। আমাদের দেশেও (১) চড়ুই পক্ষীর এবং ছাগের স্ত্রীশক্তমের শক্তি দেখিয়া ধাতুক্ষীণ [impotence] রোগে চড়ুই পাখীর মাংস, ছাগের মাংস এবং অণ্ডকোষ রোগীকে খাওয়ান হয়; (২) যেহেতু কোকিল পাখীর কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং মিষ্ট, সুতরাং কোকিলের মাংস খাইলে লোকে সুগায়ক হয়; (৩) অনাবৃষ্টি হইলে শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলাকে জলের নীচে কিছুদিন ডুবাইয়া রাখিলে, বৃষ্টিতে দেশ ডুবিয়া যাইবে; (৪) নববিবাহিতা অথবা নূতন পুষ্পবতী নারী কাহারও খোকাকে অথবা একটা নোড়াকে কোলে করিয়া থাকিলে শীঘ্রই তাহার নিজের কোল আলো করিবে; (৫) যেহেতু শিলা [Stone] এবং ধ্রুব নক্ষত্র [Pole Star] অচল, [ধ্রুব শব্দের অর্থই স্থির, অচল] সেই হেতু নব-বিবাহিতা পত্নী শিলার উপর দাঁড়াইলে এবং ধ্রুবকে দেখিলে তিনি পতিকুলে অচলা থাকিবেন; (৬) ইতু পূজা বা মিতু [মিত্র] পূজায় শরায় নানাবিধ রবি শস্যের বীজ বপন করিলে [মিত্র বা সূর্য্যের নামান্তর রবি] দেশে প্রচুর রবিশস্য উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। পৃথিবীর সভ্যাসভ্য প্রত্যেক দেশের নর-নারীর মনে এইরূপ ভাব থাকায় এই জাতীয় নানাবিধ অসংখ্য আচারের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজতত্ত্বজ্ঞ [Anthropologist] পণ্ডিতেরা ইহাকেই Homeo-Magic বলেন।

ক্ষেণ, কোচ ও রাজবংশী

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গন্ধতৈল, গাত্রহরিদ্রা এবং সোহাগ তোলা ইত্যাদি আচার, ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থাদি উপনিবিষ্ট উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। আজকাল রাজবংশীরা আপনাদিগকে 'ক্ষত্রিয়' এবং ক্ষেণেরা 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ প্রথাগুলির কতক কতক অনুকরণ করিতেছেন। গোয়ালপাড়া, রঙ্গপুর ও কোচবিহার অঞ্চলের রাজবংশী, ক্ষেণ, কোচ এবং মেচ আদি প্রকৃত আদিম অধিবাসী-দিগের মধ্যে উল্লিখিত রীতিগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালেও বিদ্যমান ছিল না। দেশাচার ও জাত্যাচারই উহাদের অবলম্বন ছিল, এবং এই পুস্তকের ১৮৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে। রঙ্গপুর এবং কোচবিহার রাজ্যের নিবাসী অথবা প্রবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি উচ্চ-জাতির পৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়স্ক যে কোনও সামাজিক সজ্জন জানেন— "রাজবংশীরা এক্ষণে জল আচরণীয় জাতীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা তাঁহাদের জল কদাচ ব্যবহার করিতেন না।" তবে শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ক্ষেণজাতি জল আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত আছে।

রাজবংশী ও ক্ষেণের ব্রাহ্মণ-কায়স্থের প্রথার অনুকরণ চেষ্টা

রাজবংশীরা, কোচরাজ বংশের দায়াদ। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা "রাজবংশী" জাতি বলিয়া পরিচিত, কালিকা পুরাণে এবং দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে তাঁহারা যদুবংশীয় সহস্রার্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের কতিপয় পুত্রের বংশধর বলিয়া পরিচিত। পরশুরামের সহিত যুদ্ধে উক্ত সহস্রার্জ্জুনের দ্বাদশ পুত্র কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়া কামরূপ দেশের আদিম অধিবাসী কোচ

রাজবংশী জাতি কোচ-রাজবংশের দায়াদ

মেচ এবং কাছারি প্রভৃতি জাতির আশ্রয়ে বসতি করিতে থাকেন এবং তাহাদের কন্যা গ্রহণ করত বংশরক্ষা করেন। এই দ্বাদশ পরিবারের মধ্যে একটী পরিবারে কালক্রমে 'হাড়িয়া মণ্ডল' নামক এক বিশেষ সৌভাগ্যবান্ পুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার পত্নীদ্বয়ের গর্ভে মহাদেবের কৃপায় শিশু এবং বিশু নামক দুই কুলপাবন পুত্ররত্নের জন্ম হয়। তাঁহাদের মধ্যে শিশু বা শিষ্য সিংহ জলপাইগুড়ি বা বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত বংশের এবং বিশু বা বিশ্ব সিংহ কোচবিহার [এবং কামরূপের আরও কতকগুলি রাজ্যের] রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত হন। মহাদেবের কৃপায় জাত হওয়ায় মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশধরগণ শিববংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র এবং শিববংশীয় রাজগণের বংশাবলীতে উক্ত ঐতিহ্য সংরক্ষিত আছে। কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহ এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ এবং সেনাপতি শুক্লধ্বজ—[বা চিলারায়—অসমীয়া উচ্চারণ শিলারায়] প্রধানতঃ এই স্বদেশী সৈন্যদলের সাহায্যেই মুস্লিম শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ভারতের পূর্ব্বোত্তর অংশে একটী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোচবিহার রাজবংশের পুত্র-কন্যাদিগের বিবাহ নিয়মিতরূপে রাজবংশী পরিবারের সহিত হইয়া আসিতেছে,—ক্বচিৎ দুই এক স্থলে অন্য জাতির সহিতও হইয়াছে। রাজবংশী জাতীর মধ্যে বহু 'পরিবার' কার্যী এবং 'ইশর'—[কোচরাজ বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য প্রাপ্ত]—উপাধি খুব গৌরবের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গীয় গুণাভিরাম রায় বড়ুয়া বাহাদুর তাঁহার "আসাম বুরঞ্জীতে লিখিয়াছেন—"কোঁচ-বিহারর রাজা কোঁচবংশর হোবার নিমিত্তে ভাটী অঞ্চলর কোঁচে রাজ-বংশী বুলি কয়।"

যোগিনীতন্ত্রের ঐতিহ্যানুসারে মহারাজ বিশ্বসিংহ স্বয়ং মহাদেবের পুত্র

বলিয়া গৃহীত হওয়ায় তাঁহার বংশধরেরা শিববংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণ (বৃহদারণ্যক) উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, পর্জ্জন্য, যম এবং মৃত্যু নামক দেবগণের সহিত রুদ্র এবং ঈশান দেবও "ক্ষত্রিয়" বলিয়াঅভিহিত হওয়ায়, সূর্য্য-চন্দ্রাদি বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের মত শিববংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব ও সনাতন শ্রৌত প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে; সুতরাং মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশধরগণের যিনি যে স্থানে থাকুন, তাঁহাদেরও ক্ষত্রিয়ত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। মনুষ্যগণের মধ্যে গুণ এবং কর্ম্ম বিভাগ বশতঃ যে চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট কথায় লিখিত আছে এবং বর্ণ ভেদের এই মূল নীতি-ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই অনুসৃত হইয়াছে। রাজ্যশাসন, শত্রুদমন, প্রজাপালন, যোগ্য পাত্রে দান এবং উদার ধর্ম্মভাব ক্ষত্রিয় বর্ণের লক্ষণ; সুতরাং শ্রুতি এবং তন্ত্রের আদেশবাণী ব্যতীত, শাস্ত্রসিদ্ধ লক্ষণ দ্বারা বিচার করিলেও, মুঘল-পাঠান-আহমাদি প্রবল রাজশক্তির পরাজেতা এবং ভারতখণ্ডের পূর্ব্বোত্তর সীমান্তে বিশাল এক স্বতন্ত্রহিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ নাই।

বিশ্বসিংহের বংশধরগণ ক্ষত্রিয়

বিশ্বসিংহ মূলতঃ যে জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আচারের কিছু কিছু বিবরণ তদীয় বংশধরের আনুকুল্যে লিখিত "দরঙ্গ রাজবংশাবলী" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইল। উহাতে আছে, তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের প্রীত্যর্থে হাঁস, পায়রা, মহিষ, শূকর ও ছাগ এবং মদ-ভাতের নৈবেদ্য দিয়া ছিলেন:—

বিশ্বসিংহের কুলাচার ও তাঁহার অন্তিম আদেশ

হংস পার মদ ভাত মহিষ শূকর
কুকুরা ছাগল উপহার নিরন্তর।

পাতিলা নাচন তথা মাদল বজাই।
সবারো মাজত তুলিলন্ত দেওধাই ॥ ৩২৭

মহারাজ বিশ্বসিংহের ঐ কুলাচার প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কিঞ্চিৎ বলা সঙ্গত মনে করিতেছি। (১) তন্ত্রের মতে—স্থলচর, জলচর এবং খেচর জীব মাত্রেই বলির যোগ্য। কালিকা পুরাণে মানুষও বাদ পড়ে নাই। মহিষ এখনও সর্ব্বত্র দুর্গাপূজা, কালীপূজায় বলি দেওয়া হয়। বরাহ বন্য হইলে বন্য কুক্কুটের ন্যায় হিন্দুর ভক্ষ্য। (২) মনুর মতে —হাঁস এবং পায়রা গৃহপালিত মোরগ-মুরগীর ন্যায় অভক্ষ্য এবং উহাদের ভোজন উপপাতকজনক হইলেও কামরূপের ব্রাহ্মণেরাও হাঁস এবং পায়রা খাইয়া থাকেন। (৩) মদ তান্ত্রিক পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ। তন্ত্রের মতে পৃথিবীর মানুষ মাত্রেই দীক্ষা লাভের অধিকারী। মহাপুরুষীয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অপেক্ষা তান্ত্রিকধর্ম্ম কম উদার নহে। (৪) কোচবিহারে এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যায়—মৈথিল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা খাসী, পায়রা এবং হাঁসের ডিম্বের ডাইল এবং ব্যঞ্জন দিয়া শিবকে ভাত খাওয়াইতেছেন। মহাভারতে দেখা যায়—শিবের কাছে মানুষ বলিও দেওয়া হইত।* (৫) পাশুপত এবং বামাচার মতানুসারে সকল রকম খাদ্য—[আমিষ বা নিরামিষ]—পবিত্র। (৬) হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বে (৮৭।৮৮।৮৯ অধ্যায়ে) যদুবংশীয় নর-নারীর বন ভোজনের (picnic) বর্ণনার ঘটাটা পাঠক একবার দেখিবেন। মদ এবং মাংসের এবং নাচা-নাচির এরূপ 'এলাহি কারখানা' অন্যত্র দুর্লভ। সেখানেও বরাহ, মহিষ, কুক্কুট কিছুরই অভাব নাই। (৮) অশ্বমেধ যজ্ঞে অগণ্য পশুবধ, এবং তাহাদের মাংসের পর্ব্বত এবং মদের—[পুকুর নহে]—সাগর তৈয়ারী করিতে হইত।† যাহা হউক, উক্ত রাজা বিশ্বসিংহ

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, জরাসন্ধ রাজার অত্যাচার বর্ণনা।

† মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব, ৮৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুকালে পাত্র, মিত্র ও পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার বংশের কেহ যেন রূপ ও গুণসম্পন্না সুন্দরী কোচ, মেছ কিংবা কাছাড়ি জাতির কন্যা ব্যতীত অন্য জাতির কন্যাকে বিবাহ না করে :—

মোর বাক্য শুনা সাবধান নকরিবাঁ কেবে অন্য কাণ
মোর বংশে কন্যা নানিব অন্য জাতির।
ভাল ভাল রূপ গুণ চাই যথাত সুন্দর কন্যা পাই
আনিবাহাঁ কন্যা কোঁচ মেচ কাছারীর ॥ ২৭৭

—দরঙ্গরাজ বংশাবলী

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—কোচবিহারের রাজারা আপনাদিগকে শিববংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

ক্ষত্রিয় রাজাদের স্ত্রীর জাতি বিচারের আবশ্যকতা নাই

পুরাণে দেখা যায়—ক্ষত্রিয় রাজাদের স্ত্রীর জাতি বিচারের আবশ্যকতা নাই। মনুর বচনে আছে—"স্ত্রীরত্নং দুস্কুলাদপি।" চন্দ্র বংশের আদি রাজা পুরুরবা স্বর্গের বেশ্যা উর্ব্বশীকে এবং এই বংশের দুষ্যন্ত স্বর্গবেশ্যা মেনকার কন্যা শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শকুন্তলার পুত্র ভরতের উল্লেখ করিয়া দৈববাণী (Inspired message) দুষ্যন্তকে বলিয়াছিলেন :—

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্ত মাবমংস্থা শকুন্তলাম্ ॥ ১২।১৯

—বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ

এই শ্লোকটী অতি প্রাচীন এবং ইহা মহাভারতে এবং প্রত্যেক মহাপুরাণে আছে। যাহা হউক, চন্দ্র এবং সূর্য্যবংশীয় অনেক রাজা নাগকন্যা এবং অর্জ্জুন বিধবা নাগকন্যা উলুপীকে; ভীম রাক্ষসী হিড়িম্বাকে; শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহজাত পুত্রের নাম "শাম্ব"। শান্তনু দাসকন্যা এবং কন্যাভাবাপগতা সত্যবতীকে

বিবাহ করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্য সেই বিবাহের ফল। সূর্য্যবংশীয় মেবারের রাজা মহাবীর হামীর বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং রাণা কায়স্থসিংহ সেই বিবাহজাত পুত্র। তাঁহার দ্বারাই উদয়পুরের রাণাদের বংশ রক্ষা হইয়াছে। এই হামীর ১৩০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্মরণাতীতকাল হইতে শিববংশীয় রাজগণের সহিত ঘনিষ্টভাবে বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ "রাজবংশী জাতি"র ক্ষত্রিয়ত্বও সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে। "তাঁহারা কোন্ রাজার বংশ হইতে উৎপন্ন?" এই প্রশ্নের উত্তরে যদি "কোচবিহার রাজবংশে উৎপন্ন" বলিতে কাহারও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে কালিকাপুরাণ এবং কোচবিহার রাজবংশের শাখাবিশেষ "দরঙ্গ রাজবংশাবলী" প্রভৃতির ঐতিহ্য আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে পরশুরামের যুদ্ধে হতাবশিষ্ট হৈহয়রাজ "কার্ত্তবীর্য্য সহস্রার্জ্জুনের" দ্বাদশ পুত্রের বংশধর বলিয়াও গণ্য করা পারে।

রাজবংশীয় জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব অনুমানের ভিত্তি

বিগত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইতে রাজবংশী জাতির কোনও কোনও সুশিক্ষিত সজ্জন কালিকাপুরাণের কথিত "পরশুরামের যুদ্ধে হতাবশিষ্ট কতকগুলি ক্ষত্রিয় কামরূপে আসিয়া ম্লেচ্ছ জাতির বেশ, ভাষা এবং আচার গ্রহণ করত জল্পীশ [জলপাইগুড়ি জেলার বিখ্যাত জল্পেশ্বর] মহাদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন," অথবা "দরঙ্গরাজবংশাবলী"র বিবৃতি অনুসারে "সহস্রার্জ্জুনের দ্বাদশ পুত্র পরশুরামের ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক 'চিকণাবারী'তে লুকাইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ

রাজবংশীদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণের একমাত্র পথ

"সহস্র অর্জ্জুনের পুত্র যিতো বার জন।
* * * * ॥ ৪৮
তান বীর্য্যে পুত্রগণ ভৈলা অসংখ্যাত ॥

অনুক্রমে বাড়িলেক তাহার সন্ততি ॥”

তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল” এই দুই ঐতিহ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে মনুসংহিতার [দশম অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকের] লিখিত বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত পুণ্ড্র ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিতেছেন এবং সেই মতের অনুকূলে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাতিও লইয়াছেন। এই মত গ্রহণ করিবার প্রবল বাধা এই যে, পুণ্ড্রদেশ যে কামরূপ এবং তদ্দেশবাসী পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা যে আধুনিক রাজবংশী জাতির পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। আর, মনুসংহিতা প্রণয়নের পূর্ব্বযুগে কোনও অতীত কালে যাঁহারা ‘বৃষল’ বা বৈদিক ধর্ম্মের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছেন, সহস্র সহস্র বৎসর পরে তাঁহাদিগের সহিত আধুনিক রাজবংশী জাতির যোগসূত্র বাহির করাও অসম্ভব। হৈহয় বংশের সহিত যুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহাদিগকে ‘যদু বংশীয়’ অথবা কোচবিহারের রাজবংশের সহিত সংশ্রব স্বীকার করিলে তাঁহাদিগকে ‘শিববংশীয়’ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করা যাইতে পারে ; নতুবা তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের অন্য যুক্তিযুক্ত উপায় দেখা যায় না। কোন কোনও পণ্ডিত লেখককে বলিয়াছেন—“রায় সাহেব শ্রীযুত পঞ্চানন সরকার [বর্ম্মা] মহাশয় প্রমুখ যে সকল সুশিক্ষিত রাজবংশী, কালিকা পুরাণের ঐতিহ্য ত্যাগ করিয়া মনূক্ত বৃষলভাবাপন্ন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলিয়া রাজবংশী জাতির যে নূতন পরিচয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—তাহা অচল।”

ক্ষেণ জাতি

ক্ষেণ জাতিও প্রাচীন কামরূপ প্রদেশের একটী স্থানীয় জল আচরণীয় জাতি—পশ্চিম বাঙ্গালার তিলি এবং মোদক বা ময়রা জাতির অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। ক্ষেণ জাতির প্রধান জীবিকা কৃষি হইলেও সরিষার তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, মোদক (মোয়া) প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয় তাহাদের আনুষঙ্গিক জীবিকা আছে। বিংশ শতাব্দীর

প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ক্ষেণরা তৈল ব্যবসায়ী ছিলেন। বর্ত্তমানে মুসলমানেরা সেখানে এই ব্যবসায়টী করিতেছেন।” ক্ষেণ জাতীয় ব্যক্তির আকৃতি ও গঠন লক্ষ্য করিলে তাঁহাদিগকে প্রাচীন ‘আর্য্যদিগের বংশ সম্ভূত’ বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয় বলেন—“লেখক বা কায়স্থ জাতির সহিত ক্ষেণদিগের মূলতঃ কোন সম্বন্ধ নাই।” বিগত ১৯৩০ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত শশিভূষণ সেন মহাশয় দিনাজপুরে লেখকের সহিত ক্ষেণ জাতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :—

“তুরুক তেলেঙ্গা, কোচ ভেলেঙ্গা
গ্যান্‌গাইর গীর্ গীর গাঠি।
খ্যাণ কৈবর্ত্তের কথায় ভিটায় না থাকে মাটী॥”

জলপাইগুড়ির শ্রীযুত বাসুদেব ক্ষেণ [ইনি একজন গ্রাম্য কবি] মহাশয়ও লেখককে বলিয়াছিলেন :—

কোচ ভেলেঙ্গা, লাউ ছেলেঙ্গা
ক্ষেণের বীর বীর গাঠি।
তুর্কের সঙ্গে পদ বহিলে হাতে লাগে লাঠি॥ *

ইহার দ্বারাও ক্ষেণদিগের খল স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, কোচবিহার অঞ্চলে রাজবংশী ও ক্ষেণদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে এখনও (অর্থাৎ—১৩৩৬ বঙ্গাব্দে) স্ত্রী বর্ত্তমানে কিংবা অবর্ত্তমানে ‘পাছুয়া’ (পুনর্ভূ) গ্রহণ করিতে পারেন। এই শব্দটীর সম্ভবতঃ এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে, যথা—পাছুয়া = পাত + ছুয়া — ছুয়াপাত (এঁটো-

---

* শব্দার্থ = তেলেঙ্গা—অনাচারণীয় জাতি বিশেষ; এখানে চতুর। ভেলেঙ্গা—সরল। গ্যানগাই—দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় এই জাতির বাস। গির্‌গির্ গাঠি—(ভাবার্থ) কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। পদ— রাস্তা। বহিলে—চলিলে]

পাতা)। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে পাছুয়ার স্বামীকে ঢোকা ভাতার বলে। ঢোকা শব্দের অর্থ ঠ্যাক বা সাহায্য। যাহা হউক, কোচবিহার অঞ্চলে রাজবংশী ও ক্ষেণদিগের মধ্যে কেহ পাছুয়া গ্রহণ করিলে সমাজে কোন গোলযোগ হয় না কিংবা পাছুয়ার গর্ভজাত সন্তানরা সমাজে হীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। দেওয়ান ৺কালিকাদাস দত্তের সময় কোচবিহারের রাজদরবার নজীরের দ্বারা 'পাছুয়া'-সম্বন্ধজাত সন্তানদিগের পিতৃ-সম্পত্তির দায়াধিকার রহিত করিয়া দিয়াছেন।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলের পর্ব্বতজোয়ার ও মেছপাড়া ষ্টেটের রাজবংশী ভূম্যধিকারীদিগের বিবাহ যজুর্ব্বেদ-বিধি অনুসারে ও ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। পর্ব্বতজোয়ার ষ্টেটের পূর্ব্বপুরুষের নাম হাতিবর চৌধুরী। কোচবিহারের মহারাজা ৺শিবেন্দ্র নারায়ণ

মেছপাড়ার জমিদার ও সিদলির ভূঁঞা বংশ

ইঁহার বংশধর ৺রাজেন্দ্র নারায়ণের কন্যা বৃন্দেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর রচিত "বেহারোদন্ত"নামক একখানি ছন্দোবদ্ধযুক্ত পুস্তক আছে। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত ২৫নং ল্যান্সডাউন রোড নিবাসী উক্ত পর্ব্বতজোয়ার ষ্টেটের রাজবংশী ভূম্যধিকারী শ্রীযুত জ্যোতিন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী বিগত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ তারিখে হুগলির ভূতপূর্ব্ব "ডিষ্ট্রীক্ট এণ্ড সেসন জজ" উপবীতি কায়স্থ মিষ্টার খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতাস্থিত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজের ধুরন্ধরেরা এজন্য কোন আন্দলনের সৃষ্টি করেন নাই। যাহা হউক, ভট্টকবি অমরচাঁদের হস্তলিখিত 'সোরথ পঞ্চম' নামক পুস্তক হইতে অবগত হওয়া যায়—"মেছপাড়া ষ্টেটের পূর্ব্বপুরুষ থানসিংহ মোঘল সম্রাট আরঙ্গজেবের আমলে অম্বরাধিপতি বিষণ সিংহ সহ ধুবড়ীতে মিলিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে সহায়তা করায় পুরস্কারস্বরূপ দক্ষিণকূলে জায়গীর

লাভ করিয়াছিলেন। কোচ-রাজবংশের সহিত সিদলীর ভুঁঞা বংশের ও মেছপাড়া ষ্টেটের ভূম্যধিকারী বংশের বৈবাহিক আদান-প্রদান বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মেচপাড়া ষ্টেটের কয়েক জন ভূম্যধিকারীর বিবাহের কথা ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। সিদলীর ঐ বংশের পূর্ব্বপুরুষ চিকরা মেছ এক্ষণে "চিকনাথ নারায়ণ" নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহার বংশধর রাজা (?) সূর্য্যনারায়ণ বিজনীর শিববংশীয় রাজা বলিত-নারায়ণের কন্যা চন্দ্রেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানান্তে জানা গিয়াছে—"ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হন।" সিদলীর ভুঁঞা বংশের মহীনারায়ণের বংশধর ইন্দ্রনারায়ণের কন্যার সহ বিজনীর আনন্দনারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্যার গর্ভে কীর্ত্তিনারায়ণ ও রাজা ৺কুমুদনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নাম রাজা গৌরীনারায়ণ। ইঁহার পৌত্র রাজা শ্রীযুত অভয়নারায়ণ দেবের বিবাহের কথা এই পুস্তকের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হস্তোদক দান—বরের হস্তে 'উদকদান' (জল ঢালা)। কেহ কেহ হস্তোদক দান'কে বাগ্‌দান কারণ, আশীর্ব্বাদ করা বা পাকা দেখা [অসমীয়া হিন্দুদিগের আংটি পিন্ধোয়া]ও বলেন। বিবাহ-দিবসে সন্ধ্যার সময় কিংবা তাহার কিছু পরে বর, কন্যার বাড়ী পহুঁছিলে গোয়াল-পাড়া অঞ্চলে হস্তোদক আচার অনুষ্ঠিত হয়। কামরূপে আচার হিসাবে কখন কখন শূদ্রদিগের মধ্যে এই প্রথাটী চলে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে হস্তোদক প্রথা বা বাক্‌দান নাই। বৈদিক গৃহস্যূত্রাদিতে [বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদীয়

ভাবে যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে এবং তদনুগত ভদ্রসমাজে ইহা প্রচলিত- হইয়াছে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও "বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলা। উদক-স্পর্শিতা যাচ পাণি-গৃহীতিকা। ইত্যেতা কাশ্যপে প্রোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ" এই বচন দ্বারা হস্তোদক দানের আভাষ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাগ্‌দানের পর সেই বাগ্‌দত্ত পাত্রের সহিত ঘটনাক্রমে কন্যার বিবাহ না হইলে 'অন্যপূর্ব্বা' হইবার আশঙ্কা আছে এবং তজ্জন্য বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্ব দিনে কিংবা বিবাহ-দিনের প্রাতঃকালে বাগ্‌দান ক্রিয়াটী প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়া তাহার পর গাত্রহরিদ্রা এবং নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

এরূপ শুনা যায় যে, প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় বৈদিকদিগের সমাজে অতি অল্প বয়স্ক [এমন কি স্তনন্ধয় শিশু] বর-কন্যার অভিভাকেরা এই 'বাগ্‌দান' কার্য্য করিতেন। অনেক সময়ে মেয়ে মায়ের পেটে থাকিতে থাকিতেই আন্দাজী এই কার্য্য হইত এবং তজ্জন্য বাগ্‌দত্তা স্বামী মরিলে [অর্থাৎ বাগ্‌দত্তা কন্যা 'বিধবা' হইলে] তাহার বিবাহ লইয়া সমাজে একটা হুলস্থুল পড়িত। ইহাকেই বলে "মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা!" যাহার বিবাহ হয় নাই (১) তাহার 'ধব' বা 'স্বামী' কোথা হইতে হইবে? তাই প্রাচীন ঋষিরা কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য হইবার পরও—[অর্থাৎ প্রকৃত স্বামী-সহবাস হইবার আগে] বরের মৃত্যু হইলে, ঠিক কন্যার মতই তাহার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

পশুপতি-কৃত পদ্ধতি অনুসারে কন্যাদাতাকে ভাবী জামাতার গৃহে গিয়া এই কার্য্য করিতে হয়। এই 'হস্তোদক' বিবাহ-দিবসে প্রাতঃ-কালে কিংবা বিবাহ-দিবসের কয়েকদিন আগেও আচরিত হইতে পারে।

---

(১) চতুর্থী কর্ম্মান্তর স্বামী-সহবাস না হইলে যজুর্ব্বেদীয় দ্বিজ কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন হয় না।

যদি বিবাহ-দিনের পূর্ব্বে এই "হস্তোদক প্রদান"-কার্য্যটির অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই কার্য্যের জন্য ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুমত একটী শুভদিন এবং শুভলগ্ন স্থির করা হইয়া থাকে এবং সেই দিনে কন্যাদাতা পুরোহিত, পুত্র, মিত্র এবং আত্মীয়-স্বজনাদি সমভিব্যাহারে বরের বাটীতে গমন করেন, এবং তথায় যথাবিহিত লগ্ন উপস্থিত হইলে পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যথারীতি "পুণ্যাহ-বাচন" করাইয়া কন্যাদানের প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করেন। এই প্রতিজ্ঞাবাক্যটি এই :—

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সুতা ত্বদ্ গোত্রগামিনী।
হস্তোদকমিদং গৃহ্ণ দাতব্যোঽয়ং বিধানতঃ॥"

অর্থাৎ—"আমি ত্রিসত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার কন্যা তোমাকে যথাবিধি দান করিব [আমার কন্যা গোত্রান্তরিতা হইয়া তোমার গোত্র প্রাপ্ত হইবে] এই প্রতিজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ এই হস্তোদক গ্রহণ কর।"

কন্যাদাতা বাগ্‌দানের উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণের সহিত তিল, যব, ফুল, কুশ এবং হরিতকীর সহিত এক গণ্ডূষ জল ভাবী বরের অঞ্জলিতে দিবেন এবং তিনি 'স্বস্তি' [সু+অস্তি=শুভ হইতেছে] বলিয়া কন্যাদাতার বাগ্‌দান স্বীকার করিবেন। কন্যার পিতা [অথবা অভিভাবক] এইরূপ ভাবে ভাবী বরের হস্তে জল ঢালিয়া কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা করিবার পর কন্যার ভ্রাতা নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিয়া পিতার কৃত বাগ্‌দানের অনুমোদন করিবেন, যথা ;—

"তস্মিন্‌কালেঽগ্নিসান্নিধ্যে স্নাতঃ স্নাতেঽহ্যরোগিণি।
অব্যঙ্গেঽপতিতেঽক্লীবে পিতা তুভ্যং প্রদাস্যতি॥"

অর্থাৎ—"হে সজ্জন, আমার পিতা সুস্নাত হইয়া যথাসময়ে, অগ্নিদে.ব

সম্মুখে, অরোগ, সম্পূর্ণাঙ্গ, অপতিত, অক্লীব এবং সুস্নাত তোমাকে আমার ভগিনীকে প্রদান করিবেন।”

[এই শ্লোকের অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাগ্‌দানের সময় কন্যাপক্ষ বিশ্বাস করিয়া লইতেছেন যে, ভাবী বর মহাশয়ের দেহের কোন খুঁৎ বা ত্রুটি নাই, তাঁহার কোন দুশ্চিকিৎস্য বা বংশানুক্রমিক রোগ নাই, কোন পাপের জন্য সমাজে পতিত হন নাই, অথবা তিনি পুরুষত্বহীন নহেন; (২) অর্থাৎ—বাগ্‌দানের পর এবং বিবাহ-সংস্কারের পূর্ব্বে যদি বরের পূর্ব্বোক্ত দোষ বা ত্রুটিগুলির মধ্যে কোনও একটা বা তাহার অধিক ত্রুটি বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বাগদানটী ঝুটা বা বাতিল হইয়া যাইবে এবং কন্যাপক্ষ নিশ্চিন্ত মনে যে কোন সুযোগ্য পাত্রে কন্যাকে সমর্পণ করিতে লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ অধিকারী হইবেন]।

হস্তোদক দানের পূর্ব্বে কন্যাদাতা যথারীতি এবং যথাসাধ্য বরকে বস্ত্র, উত্তরীয় বস্ত্র, [দ্বিজ হইলে] যজ্ঞসূত্র, শতসূত্র (৩) এবং পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদির দ্বারা সৎকার করেন। হস্তোদক-কার্য্য যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবার পরে বর ও কন্যাদাতার সহিত সমাগত কন্যার ভ্রাতাকে [এক বা অধিক যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে] বস্ত্র, উত্তরীয়, বস্ত্র ও গন্ধ মাল্যাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন। আধুনিক সময়ে এই হস্তোদক-প্রদান অথবা বাগ্‌দান ব্যাপারটী বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত না হইয়া বিবাহের নির্দ্ধারিত দিনে বিবাহ-

(২) “যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ” অর্থাৎ—বর যুবা, জনপ্রিয়, বুদ্ধিমান্ হইবেন এবং তিনি যে পুরুষত্বহীন নহেন, তাহার জন্য সযত্নে পরীক্ষিত হইবেন।—মেধাতিথি ধৃত স্মৃতিবাক্য।

(৩) শতসূত্র=যজ্ঞসূত্রের মতই সূত্রের গুচ্ছ, কিন্তু উহাতে ১০৮ খেই সূতা থাকে এবং উহা হলুদ, কুঙ্কুমাদি দ্বারা রঙ্ করিয়া মধ্যে মধ্যে রেশম দিয়া গ্রন্থি বাঁধিয়া সাজান এবং হরিতকী ও সোহাগার টুকরা বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

লগ্নের কিছু পূর্ব্বে প্রায় প্রদোষকালেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। বাগ্দানের পর কোনও কারণে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে কন্যার পক্ষে "পুনর্ভূ" দোষ ঘটার একটা যে আশঙ্কা থাকে, সম্ভবতঃ সেই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যেই একেবারে বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেই এই কার্য্যটী করিয়া "নিয়ম রক্ষা" করার প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে।

বিবাহের দিন প্রদোষে এই "হস্তোদক প্রদান কার্য্য" অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ দিন সায়ংকালে শোভাযাত্রার সহিত বরপক্ষ কন্যার বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলে, কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ অন্য কোন ভদ্র ব্যক্তি কতিপয় আত্মীয়-স্বজনাদি সহ বরপক্ষের প্রত্যুদ্গমন এবং স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার বাটীর সম্মুখভাগে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত কদলীবৃক্ষ মণ্ডিত স্থানে [কন্যাপক্ষ সঙ্গতিশালী হইলে এখানেও অতিথি-সৎকারের উদ্দেশ্যে একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপ বাঁধা হয়] আনিয়া তাহার মধ্যে আদর করিয়া উপবেশন করাইয়া পূর্ব্ববর্ণিত "হস্তোদক প্রদান" কার্য্যটী রীতিমত সম্পন্ন করেন। এই সময়ে মাঙ্গলিক পুণ্যাহ-বাচনের পর কন্যাদাতা এবং বর উভয়ে পুরোভাগে স্থাপিত শালগ্রামশিলা এবং মঙ্গলঘটের নিকট গণেশাদি পঞ্চদেবতা [গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, দুর্গা এবং শিব], আত্মদেবতা [তান্ত্রিকমতের গুরুনির্দ্দিষ্ট ইষ্টদেবতা], গৃহ এবং কুলদেবতা ও যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সংক্ষিপ্তভাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং কন্যাদাতা পূর্ব্বোক্তরূপে বরকে সৎকার-দ্রব্যাদি প্রদান এবং ত্রিসত্য করিয়া ["সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ইত্যাদি—শ্লোক পাঠ করিয়া] কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা বা বাগ্দান এবং 'হস্তোদক'প্রদান করেন এবং তাহার পর কন্যার ভ্রাতা পিতার কৃত বাগ্দানের অনুমোদন করিলে বরও যথারীতি উপযুক্তরূপে শ্যালকদিগের আদর-সম্মান-কার্য্য সমাপ্ত করেন।

অতঃপর কন্যাদাতা বরের চরণে দধি এবং কদলী মিশ্রিত জল কিছু

ঢালিয়া দেন এবং তাঁহার ললাটে চন্দন, অঞ্জন, ঘৃত এবং সিন্দূরের তিলক দেন। তাহার পর তিনি বরের উত্তরীয় বস্ত্রের একপ্রান্ত ধরিয়া [এবং গ্রীষ্মকাল হইলে ব্যজনীর দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে] অতি আদরের সহিত সজ্জিত বিবাহ-মণ্ডপে আনায়ন করেন। সেই সময়ে কন্যাপক্ষের এয়োস্ত্রীগণ এবং কুমারীরা বরণডালা [পূর্ব্ববঙ্গে বলে চা'ইলন বাতি] এবং অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া বৈবাহিক উৎসবের গীত গায়িতে গায়িতে এবং "উলু-লু" ধ্বনি করিতে করিতে বরের সঙ্গে সঙ্গে আসেন।

গোয়ালপাড়া, কোচবিহার এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও একটী প্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যে রাত্রিতে বিবাহের শুভলগ্ন নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তাহার অব্যবহিতপূর্ব্ব দিবাভাগে কন্যাপক্ষ হইতে কন্যাদাতার কোন বিশিষ্ট আত্মীয় বা বন্ধু তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ কিছু পান, সুপারি এবং চিনি-সন্দেশাদি মিষ্ট ভোজনদ্রব্য সঙ্গে লইয়া বরের বাটীতে উপস্থিত হন এবং উপহারের বস্তুগুলি সমর্পণ করিয়া বরকে বিবাহার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির [অথবা দ্বিজ তিন বর্ণেরই] পক্ষে যে বিবাহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ বলা হইয়াছে, সেই 'ব্রাহ্ম' বিবাহের লক্ষণ [মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মতে] এইরূপ, যথা মনুসংহিতা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে :—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

অর্থাৎ—"সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যা-বরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা-সদাচারসম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে যে কন্যাদান, তাদৃশ দান-সম্পাদ্য বিবাহকে "ব্রাহ্মবিবাহ" বলা যায়।"—৺ভরত শিরোমণির অনুবাদ।**

** [স্মৃতি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺ভরত শিরোমণি মহাশয়ের উক্ত অনুবাদে "স্বয়ং আহূয়" বা "নিজে আবাহন করিয়া" অংশ টুকু বাদ পড়িয়াছে এবং কুল্লুক ভট্টের অতি সংক্ষিপ্ত টীকারই মর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষায় প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মনু-ভাষ্যকার ঋষিকল্প মেধাতিথির ভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে "স্বয়ং= প্রাগযাচিতঃ স্বপুরুষপ্রেষণৈঃ আহূয়=অন্তিকদেশমানায্য বরং যদ্দানং স ব্রাহ্মো বিবাহঃ" অর্থাৎ "স্বয়ং=পূর্ব্বে কন্যার জন্য প্রার্থী হন নাই এরূপ বরকে নিজের লোক পাঠাইয়া নিমন্ত্রণপূর্ব্বক বাড়ীতে আনিয়া যে কন্যাদান তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ" আছে। এই শ্লোকের আর একটী বঙ্গানুবাদ ঢাকার সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা"র ১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যার ১২শ পৃষ্ঠায় "প্রাচীন ভারতে যৌন সম্বন্ধ" নামক প্রস্তাবে পাওয়া যায়। ঐ অনুবাদটী অধিকতর মূলানুগত বোধ হওয়ায়, এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—"বেদ বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং সচ্চরিত্র অপ্রার্থক বরকে কন্যার অভিভাবক সসম্মান আহ্বান করত বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে, সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিত।" স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার উদ্বাহ তত্ত্বের "ব্রাহ্মাদি বিবাহ" পরিচ্ছেদে প্রাচীন আর্য্যসমাজে প্রচলিত আট প্রকার বিবাহের মনু মহারাজার বর্ণিত সুসম্পূর্ণ লক্ষণাত্মক শ্লোকগুলির পরিবর্ত্তে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সংক্ষিপ্ত লক্ষণাত্মক শ্লোক কয়েকটী তুলিয়াছেন, যথা:—

"ব্রাহ্মো বিবাহ—আহূয় দীয়তে শক্ত্যালঙ্কৃতা।"

—যাজ্ঞবল্ক্য, আচার অধ্যায়

অর্থাৎ—"যে ক্ষেত্রে [বরকে] আহ্বান করিয়া আনিয়া যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যাকে দান করা হয়, সেরূপ কন্যাদানকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। এস্থলে, শুধু কন্যাকর্ত্তার পক্ষ হইতে কর্ত্তব্য বিচার করিয়া [অর্থাৎ আসুর বিবাহের মত পণ না লইয়া, আর্ষ বিবাহের মত গোরু এক বা দুই যোড়া না লইয়া ইত্যাদি] লক্ষণ স্থির করা হইয়াছে, কিন্তু বরের কি কি লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা লিখিত হয় নাই, যেহেতু অন্য স্থলে তাহা কথিত হইয়াছে। নিজের অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করত যথাশাস্ত্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর তবে দ্বিজ-যুবক দ্বিতীয় বা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে [বিবাহ করিতে] অধিকারী হন। ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণে প্রথমেই বরের গুণ বলা হইয়াছে যে তিনি "শ্রুতিশীলবান্" [শ্রুতি=বেদ, শীল=শাস্ত্র বিহিত সদাচার, এই দুইটী তাঁহার থাকা আবশ্যক] হইবেন; এই জন্যই, বেদাধিকারী দ্বিজ তিন বর্ণ [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য] ব্যতীত এই ব্রাহ্ম বিবাহে শূদ্রের অধিকার নাই।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত উল্লিখিত "বর-নিমন্ত্রণ" প্রথাটী যেন সেই প্রাচীন কালের "স্বয়ং আহূয় কন্যায়াঃ দানম্" [নিজে আহ্বান করিয়া আনিয়া কন্যার দান] প্রথার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

লেখকের বক্তব্য—আমরা ২২০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি—"স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও বাচাদত্তা মনোদত্তা ইত্যাদি বচনদ্বারা হস্তোদক দানের আভাস দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।" এই বচনটী তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে "পুনর্ভূ-বিচার" প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কাশ্যপ-বাক্য। স্মার্ত্তের উদ্ধৃত পাঁচ ছত্র অনুষ্টুভ শ্লোকের মধ্যে প্রথম "সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়া কুলাধমাঃ" এবং চতুর্থ "অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূ প্রভবা চ যা"—এই দুইটী ছত্র ভুলক্রমে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্মার্ত্তের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া আমরা এখানে ভ্রম সংশোধন করিলাম। যাহা হউক, হস্তোদক দানের সহিত স্মার্ত্তের নিবন্ধের কোনও সম্বন্ধ নাই। কাশ্যপ ঋষির "বাচাদত্তা" পুনর্ভূ—যে কন্যার বাগ্‌দান বা পত্র করা কিংবা পাকা দেখা হইয়াছে; উহাতে জল দেওয়ার কোনও কথা নাই। গোয়াল পাড়ার পদ্ধতি "হস্তোদক" দেওয়ার প্রথার প্রসঙ্গে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ বা অন্য ভদ্রলোকদিগের "বাগ্‌দান" প্রথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আলোচনা করা হইল।

ষোড়শ অধ্যায়

হস্তোদকের পর বিবাহ-কার্য্য আরব্ধ হয়। বিবাহ-স্থানের [ছাদনাতলা বা ছান্নাতলার] শাস্ত্রীয় নাম ছায়ামণ্ডপ এবং উহা এই

নাড়োয়ার তল বা ছায়নার তল

নামেই গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণেরও নিকট পরিচিত। ছাঁদনাতলা বা ছান্নাতলা ইহার বিকৃত অপভ্রংশ মাত্র। গোয়ালপাড়া জেলায় বিবাহের

স্থানকে চলিত কথায় "মাড়োয়ার তল"— [স্থানে স্থানে "ছায়নার তল"ও] বলে। এই ছায়না শব্দের অর্থ সামিয়ানা [যাহার দ্বারা ছায়া করা যায়] বা মণ্ডপ এবং "তল" অর্থে নিম্ন বুঝায়। 'মণ্ডপ' প্রাকৃতে 'মাড়োঁআ' হয়। ছায়নার তলের কোচবিহারী নামও "মাড়োয়ার তল"। পূর্ব্বে ঘরে বিবাহ হইত না মণ্ডপেই হইত। কেবল বিবাহে নহে, চূড়াকরণ, উপনয়ন, কেশান্ত এবং সীমন্তোন্নয়ন (১) এই চারিটি সংস্কারও বাহিরের মণ্ডপে করিতে হয়, যথা:—পঞ্চসু বহিঃশালায়াং বিবাহে চূড়াকরণ উপনয়নে কেশান্তে সীমন্তোন্নয়ন ইতি ॥২॥—[প্রথম কাণ্ডে চতুর্থ কণ্ডিকা, পারস্কর গৃহসূত্র দ্রষ্টব্য]। ইহার ভাষ্য—"পঞ্চসু সংস্কারকর্ম্মসু বহিঃশালায়াং গৃহাদ্ বহিঃ শালা, বহিঃ শালা মণ্ডপ ইতি যাবৎ। তস্যাং কর্ম্ম ভবতি। যথা বিবাহে পরিণয়নে, চূড়াকরণে ক্ষৌরকর্ম্মণি, উপনয়নে মেখলাবন্ধে, কেশান্তে গোদানকর্ম্মণি, সীমন্তোন্নয়নে গর্ভসংস্কারে এতেষু পঞ্চসু বহিঃশালায়ামনুষ্ঠানম্। অন্যত্র গৃহাভ্যন্তরে মখশালায়ামেব।" ইতি হরিহরঃ। বাঙ্গালা অনুবাদ—"সংস্কার কর্ম্মগুলির মধ্যে পাঁচটি সংস্কার বহিঃশালায়, অর্থাৎ ঘরের বাহিরে মণ্ডপের ভিতর করিতে হয়। সেই পাঁচটি সংস্কার এই যথা—বিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, কেশান্ত বা গোদান এবং সীমন্তোন্নয়ন। এই পাঁচটী 'সংস্কারই বাহিরের মণ্ডপে করিতে হয় এবং বাকী সংস্কারগুলি [নূতন মতে পাঁচটী এবং প্রাচীন মতে একাদশটী] বাড়ীর ভিতরে যজ্ঞশালা বা অগ্নিহোত্রগৃহে করিতে হয়।" ভাষ্যকার হরিহরাচার্য্য বলিয়াছেন—"বহিঃ শালায়াং গৃহাদ্ বহিঃ শালা, বহিঃ শালা, গুণ ইতি যাবৎ।" ঘরের বাহিরে যে শালা, তাহাই বহিঃ

(১) সীমন্তোন্নয়ন = সীমন্ + অন্ত + উন্নয়ন। সীমন্ত = মাথার চুলের সিঁথি এবং উন্নয়ন = তুলিয়া দেওয়া [উৎ + নয়ন = উপর দিকে লওয়া]।

শালা, যাহাকে মণ্ডপ বলে। চূড়াকরণ সংস্কারের কথা অল্প বিস্তর সকলেই জানেন, নবজাত শিশুর প্রথম মস্তক মুণ্ডন বা ক্ষৌরকর্ম্মের সংস্কার। "কেশান্ত"—বালকের উপনয়নের পর এবং বিবাহের পূর্ব্বে করিতে হয়। উহাকে "গোদান সংস্কার"ও বলে। সীমন্তোন্নয়ন এখন অনেক স্থলেই "সাধ খাওয়া" নামক স্ত্রী আচারে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে, কোন নারীর সন্তান সম্ভাবনার পূর্ব্বে মাথার চুলের মাঝে "সিঁথি কাটা" হইত না,—শুধু চুলগুলি একত্র করিয়া খোঁপা বাঁধা হইত। গর্ভ হইবার পর ষষ্ঠ মাসে [কিংবা কুলাচার মত] স্বামী সজারুর কাঁটা এবং বেনামূলের চিরুণী দিয়া বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গর্ভিণী-স্ত্রীর চুলে প্রথম "সিঁথি কাটিয়া" দিতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

আজকাল গৃহ্যসূত্রোক্ত সংস্কারগুলির মধ্যে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান ও বৈদিক মন্ত্র পাঠের সহিত গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন এবং চূড়াকরণ—এই আটটি সংস্কার বাঙ্গলাদেশে অন্যান্য জাতির ভদ্রলোকদিগের কথা দূরে থাকুক ব্রাহ্মণগণের সমাজে সুসম্পন্ন করা উঠিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালার শহরের সন্নিকট স্থানে ব্রাহ্মণবালকের উপনয়ন সংস্কারের প্রাক্কালে এবং অন্যান্য জাতির ধনবান্ এবং নিষ্ঠাবান্ পরিবারে বালক বা যুবকের বিবাহের সময়েই নাম মাত্র বা নিয়ম রক্ষার মত কোনও প্রকারে—[ঐগুলি একত্র একবারেই]—সারিয়া লওয়া হয়। যুবকের "গোদান সংস্কারের" নামও দশবিধ সংস্কারের তালিকা হইতেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের যতদূর দেখা শুনা আছে, তাহাতে কোচবিহারের পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণগণের এবং গোয়াল পাড়ার ব্রাহ্মণ-সমাজে দশবিধ সংস্কারগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে না হউক, অনেকটা যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। অন্যান্য যে সকল স্থানে এই সংস্কারগুলি—[বিশেষতঃ বালকের অন্নপ্রাশন সংস্কার]—খুব ধুমধাম বা ঘটা করিয়া করান হয়; সে সকল ক্ষেত্রে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বসুধারা দান, অধিবাস এবং পূর্ব্ব বা উত্তর বঙ্গে হলুদ কোটা পর্য্যন্ত] অর্থাৎ কর্মাঙ্গগুলিই করা হয়; বাজি এবং বাজনা, নাচ-গান এমন কি যাত্রা থিয়েটার, ব্রাহ্মণ কুটুম্বের ভূরি ভোজন ইত্যাদি আড়ম্বর এবং ঐশ্বর্যের মহিমা দেখানও যথেষ্ট হয়, কেবল আসল কাজ বা সংস্করটাই হয় না। গর্ভাধানের

সময়ও [স্ত্রীসহবাস কালে] যে স্বামীকে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়নের সময়েও স্বামীকে সংস্কারের মূল স্বরূপ বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিতে হয় এবং জাতকর্ম্ম হইতে গোদান পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কার বৈদিকমন্ত্র পাঠের সহিত পিতাকে করিতে হয় ;:অথচ এগুলি যথাশাস্ত্র অত্যল্প স্থানেই হইয়া থাকে। পুরোহিতের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা অন্যান্য সংস্কার কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করান সম্ভবপর হইলেও, কোনও নিষ্ঠাবান্ দ্বিজই পুরোহিত নিয়োগ করিয়া পত্নীর গর্ভাধান সংস্কার সম্পন্ন করাইতে পারেন না,— বিবাহের চরম অনুষ্ঠান চতুর্থী কর্ম্ম ও [প্রথম পতি-পত্নী সংযোগ বা Consummation of marriage] করাইতে পারেন না। অন্নপ্রাশন সংস্কারেও গৃহ্যোক্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে পিতাকে হোম করিয়া 'হস্তকার' মন্ত্র পড়িয়া পুত্রের মুখে ভোজ্যান্ন তুলিয়া দিতে হয় ; অথচ, বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানেই বালকের মামাকে আনাইয়া ছেলের মুখে ভাত দিতে হয়, বাবাকে নাকি ঐ কাজটা করিতে নাই ! অন্নপ্রাশনের সময়ে চরুপাক করিয়া মন্ত্র পাঠ সহকারে হোম করার পর কিরূপে কুমারকে চতুর্বিধ এবং ষড়্ রসযুক্ত অন্ন শিশুর মুখে তুলিয়া দিতে হয়, যেরূপ খাদ্য দিলে ভবিষ্যৎকালে শিশুর তদ্রূপ গুণের বৃদ্ধি হইবে, সেই কামনানুসারে নানারূপ পক্ষীর মাংস এবং মৎস্যাদি খাওয়াইতে হয়, এই সকল আসল কার্য্য কিছুই করা হয় না। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারেরও সেইরূপ লোপ হইয়া তাহার স্থানে গর্ভিনীর দোহদ [গর্ভকালে নারীর মনে যে যে খাদ্য খাইবার লালসা হয়—তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় 'দোহদ' এবং প্রচলিত বাঙ্গালায় 'সাধ' বলে] বা লালসা নিবৃত্তির জন্য নানাপ্রকার সুখাদ্য সহযোগে 'সাধ খাওয়ানর ব্যবস্থার জন্মিয়াছে এবং সেই সময় গর্ভের শোধন করার কামনায় মন্ত্রপূত 'পঞ্চামৃত' খাওয়াইবারও ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার কোন কোন অংশে এখনও "সাধ ভক্ষণ"কে সীমন্তোন্নয়ন বলে। প্রকৃত কথা এই যে দ্বিজ সাধারণের মধ্যে বেদ এবং বৈদিক গৃহ্যসূত্রাদির পঠন-পঠন অপ্রচলিত হওয়ায় এবং শাস্ত্রসম্মত সংস্কারের উপকারিতার সম্বন্ধে লোকের আস্থা না থাকায় সংস্কারগুলি ক্রমশঃ অঙ্গহীন এবং লুপ্ত প্রায় হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, 'ছায়না' শব্দটী কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের "ছায়াতলা"র অনুরূপ। 'মাড়োয়া' মণ্ডপ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র এবং এই মণ্ডপেই শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। উহার মধ্যে শালগ্রামচক্র, অন্যান্য দেবতা ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহার চারিদিকে কদলী বৃক্ষ

পুতিয়া রাখা এবং অবস্থানুযায়ী পত্র, পুষ্প, কাগজ, ঝাড় ও অন্যান্য সৌখিন দ্রব্য দ্বারাও ইহাকে সুশোভিত করা হয়। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের মেয়েদের গানে আছে, "বৈস বৈসরে বর, সেই মাড়োয়ার তলে" ইত্যাদি। এই জেলায় কেবল বিবাহের জন্য 'ছায়না' যে হয়, তাহা নহে। অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্মের জন্য [এমনকি লোকজন খাওয়াইবার জন্যও] অরণ্যজাত তৃণাদি দ্বারা অস্থায়ী নূতন তৈয়ারী চালাঘরকেও 'ছায়না' বলে।

সিন্দূর দানের প্রথা

সপ্তদশ অধ্যায়

আজকাল ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত, অথবা চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচতর জাতি পর্য্যন্তও, অর্থাৎ 'হিন্দু' মাত্রেরই বিবাহে বধূর সীমন্তে সিন্দূর দেওয়ার প্রথা দেশের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি সিঁথিতে সিন্দূরের রেখাকে নারীর সৌভাগ্যের বা সধবা অবস্থার পাকা প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। অথচ আর্য্য জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে সিন্দূরের এই সম্মান কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দ্বিজ তিন বর্ণের বিবাহই আর্য্যশাস্ত্র মতে সংস্কারাত্মক বিবাহ,—হিন্দু আইনের গ্রন্থে ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Sacramental Marriage বলা হয়। শূদ্র বরের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার না থাকায়, তাঁহার বিবাহকে শাস্ত্রানুসারে ঠিক বা আসল সংস্কার (বা Sacrament) বলিতে পারা না গেলেও পুরোহিত মহাশয়গণের কৃপার ফলে শূদ্রদিগের বিবাহ কোনও কোন ক্ষেত্রে সংস্কারাত্মক বিবাহের মতই চলিতেছে। আর্য্য ত্রৈবর্ণিক দ্বিজগণের গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত যাবতীয়

সংস্কারই স্ব স্ব শাখানুগত বৈদিক গৃহ্যসূত্রের ব্যবস্থানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু বেদশাস্ত্রের সম্যক্ পঠন-পাঠনার অভাববশতঃ সাধারণ যজমান এবং পুরোহিতের পক্ষে গৃহ্যসূত্রগুলি ক্রমশঃ দুরধিগম্য হওয়ায়, প্রায় সহস্র বৎসর অথবা তাহারও কিছু পূর্ব্বকাল হইতে কতকগুলি সুশিক্ষিত এবং অধ্যবসায়ী পণ্ডিত এক এক বেদানুগত গৃহ্যসূত্রের ব্যবস্থাগুলি সঙ্কলন করত এক এক 'সংস্কার পদ্ধতি'র প্রচার করিয়াছেন এবং সেই সকল পদ্ধতি গ্রন্থগুলির সাহায্যেই এখনও পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কার কার্য্য নির্বাহিত হইতেছে।

বিবাহ-সংস্কার উপলক্ষে বধূর সীমন্তে সিন্দুর দানের ব্যবস্থা কিন্তু বৈদিক কোন গৃহ্যসূত্রেই নাই। আরও, বিবাহিতা বধূর প্রথম গর্ভের কিছুদিন অতিবাহিত না হইলে, অর্থাৎ "সীমন্তোন্নয়ন" নামক গর্ভসংস্কার হওয়ার পূর্ব্বে, প্রাচীনকালে বধূর মাথার কেশ মধ্যে সীমন্ত বা সিঁথিই আদৌ থাকিত না; সুতরাং বিবাহের সময় "বধূর সিঁথিতে সিন্দূর" দেওয়ার প্রথা থাকিতেও পারে না। তবে সিঁথিতে না হউক বধূর কপালের উপরে ও কেশমূলের নিকটে খানিকটা সিন্দূর অবশ্যই লেপিয়া দেওয়া যাইতে পারিত :—কিন্তু বৈদিক বা স্মার্ত্ত কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই এরূপ ব্যবস্থাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভট্ট ভবদেব [খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দ] এবং যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতিকার পশুপতি পণ্ডিত [খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ] উভয়েই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট রাঢ়ের [বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত] সিদ্ধল গ্রামের নিবাসী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ পদ্ধতিপুস্তকে "শিষ্টসমাচারাৎ" [ভদ্র সমাজে প্রচলিত প্রথানুসারে] বর কর্ত্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দূরদানের উপদেশ দিয়াছেন। এই দুইজন দিগ্বিজয়ী বাঙ্গালী পণ্ডিত ও তাঁহাদের সমকালে ভদ্রসমাজে সুপ্রচলিত এই সিন্দুর দানের প্রথাটীর

অনুকূলে বৈদিক, স্মার্ত্ত অথবা পৌরাণিক কোনও শাস্ত্র ব্যবস্থা খুঁজিয়া পান নাই; সুতরাং অগত্যা "শিষ্টসমাচারাৎ" লিখিয়া প্রচলিত প্রথাটীকে গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল আধুনিক পণ্ডিত সদর্পে বলেন—"সিন্দূর দানের বৈদিক ব্যবস্থা আছে," প্রমাণাভাবে তাঁহাদের উক্তি গ্রহণের যোগ্য নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এবং উঠিতেছে,—"এই প্রথা যদি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা হইলে উহা কোথা হইতে আসিল?" তাহার উত্তরে, আমরা যথাসাধ্য নিবেদন করিতেছি :—

বাঙ্গালার রাঢ় প্রদেশের আদিম অধিবাসিবর্গের মধ্যে কুর্ম্মি, ভূমিজ, সাঁওতাল এবং বাগদি নামক জাতিরাই প্রধান এবং তাহাদিগকে ভদ্রলোকে একত্রে রাঢ় চোয়াড় বলিতেন এবং এখনও বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে সাঁওতাল জাতির বিবাহে বর কর্ত্তৃক বধূর ললাটে [সীমন্তে নহে] সিন্দূর দানই প্রধান অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয় এবং তাহার পর বধূ-বর এক পাত্রে ভোজন করিলেই কন্যা পিতৃকুল হইতে পৃথক্ হইয়া চিরতরে স্বামিকূলের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। ডাক্তার ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার বিখ্যাত "হিন্দু-বিবাহ এবং স্ত্রীধন" নামক ঠাকুর আইন বক্তৃতায় (Lecture VI.) বলিয়াছেন :—"Among the Santals,......the essential part of the nuptial ceremony consists in the *Sindurdan*, or the painting of the bride's brow with Vermilion, and the social meal which the bridegroom and the bride eat together; after which the bride ceases to belong to her father's class, and becomes a member of of her husband's family."

এই সিন্দুর দান প্রথারও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথা রাঢ় দেশের পশ্চিম

প্রান্তে অবস্থিত সিংহভূম জেলার এবং তন্নিকটবর্ত্তী আরও কোনও কোনও অংশে কুর্মি জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রথার পরিচয় দিতে গিয়া উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন :—
"The Kurmis in some places as in Sinhabhum, observe the singular but highly significant practice of making the married pair mark each other with blood drawn from their little fingers, as a sign that they have become one flesh. This, according to Dalton (Descriptive Ethnology of Bengal, pp 220,319) is probably the origin of the universal practice in India, of marking the bride with Sindur or red lead." অর্থাৎ সিংহভূম এবং আরও কোনও কোনও স্থানে কুর্মি জাতির মধ্যে বর ও বধূর উভয়ের হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর রক্ত লইয়া উভয়ে উভয়কে চিহ্নিত করিয়া দেওয়ার এক অদ্ভুত অথচ অতি মূল্যবান্ আচার প্রচলিত আছে ; এরূপ রক্তের চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, উভয়ে মিলিয়া একই রক্ত-মাংসে পরিণত হইয়াছে, তাহারই পরিচয় প্রদান করা। বিখ্যাত জাতিতত্ত্ববিদ্ ডল্টন সাহেবের মতে, এই মূল হইতেই সম্ভবতঃ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত বধূর ললাটে সিন্দূর-চিহ্ন দেওয়ার প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতের অনার্য্য বা অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে রাক্ষস এবং পৈশাচ রীতির বিবাহ বা কন্যাহরণের প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকার সময়ে হরণকারী যুবক নিজের আঙ্গুল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই অপহৃতা বা ধর্ষিতা যুবতীর ললাটে একটা ছাপ বা ফোঁটা দিয়া তাহার উপর নিজের স্বত্ব বা অধিকার স্থাপন সপ্রমাণ করিত, এরূপ আচারের অনেক প্রমাণ নরতত্ত্ব বা জাতি-

তত্ত্বের পণ্ডিতেরা পাইয়াছেন এবং সেই রক্তের চিহ্নের বর্ত্তমান প্রতীকস্বরূপ সিন্দুরের ফোঁটা ব্যবহৃত হইতেছে, তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন

আসামের ব্রাহ্মণেরা বা পুরোহিতেরা কোনও পূজা বা সংস্কার কার্য্যের উপলক্ষে ঘটস্থাপনের সময়ে যে মন্ত্রটী পড়িয়া ঘটের গায়ে সিন্দূর দিয়া থাকেন, তাহা আমরা এই পুস্তকের ১৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। যে ঘটস্থাপনার কার্য্যে সিন্দূর দেওয়া হয়, উহা পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক পদ্ধতি ক্রমে করা হয়,—বৈদিক পদ্ধতি ক্রমে নহে। তবে, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক অনেক কার্য্যেই আসল বা নকল অনেক বৈদিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এমনকি, গোবরের ঘুঁটের ছাই লইয়া তিলক করিবার, পূজার দূর্ব্বাঘাস তুলিবার, গঙ্গাগর্ভ বা অন্যত্র হইতে মৃত্তিকা তুলিবার, এইরূপ নানা অনুষ্ঠানে এক একটী ঋঙ্মন্ত্র পড়া হইয়া থাকে। উল্লিখিত সিন্দুর দানের মন্ত্রটীও সেই জাতীয় হইবে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ হরিবংশের টীকাতে কৃষ্ণলীলার শকট ভঞ্জন, পূতনা বধ, যমলার্জ্জনভঙ্গ, বৃন্দাবনের বৃকভয়নিবারণ, ধেনুকবধ, প্রলম্ববধ এবং ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ প্রভৃতি প্রত্যেক লীলার প্রামাণিকতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে এক একটী করিয়া ঋঙ্মন্ত্র তুলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সেই হেতু, প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং সূত্রগ্রন্থের অনুগত কোন প্রয়োগ বা পদ্ধতির পুস্তকে না পাইলে বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ আসল কিংবা নকল, তাহা স্থির করা যায় না। আমরা তো বৈদিক সাহিত্যে অকৃতশ্রম সামান্য ব্যক্তি, এরূপ পণ্ডিত আমাদের দেশে অত্যল্পই আছেন, যাঁহারা সত্যই মহাসাগর সদৃশ বৈদিক সাহিত্যের পারগামী হইয়াছেন। আমাদের সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানের সাহায্যে বিবাহে বধূর সীমন্ত বা ললাটে সিন্দূরদানের কোনও বৈদিক বা স্মার্ত্ত শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা পাই নাই।

যদি কোন পাঠক-পাঠিকা এসম্বন্ধে কোন প্রকৃত সংবাদ দিতে পারেন, আমরা শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদের ঋণ স্বীকার করিব। প্রকৃত প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কেবলমাত্র মুখের কথায় এরূপ বিষয়ের সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব।

এ পর্য্যন্ত যত দূর অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিবাহের সময়ে বরকর্ত্তৃক বধূর সীমন্তে অথবা ললাটে সিন্দূর দানের প্রথাটী আর্য্য বা সভ্য হিন্দুরা তাঁহাদের অসভ্য বা অনার্য্য প্রতিবেশিবর্গের নিকট হইতে গ্রহণ বা অনুকরণ করিয়াছেন। কেবল হিন্দুরা নহে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যেও সধবা নারীর সিঁথিতে সিন্দূর পরার প্রথা কিছু দিন পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল; এখনও কোনও কোন স্থানে উহার চিহ্ন বিদ্যমান্ থাকিতে পারে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের পূর্ব্বে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ কোনও কারণে পরে 'কলমা' পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বহুকালের প্রাচীন যে সকল সংস্কার বা আচার চলিয়া আসিতেছিল, মুসলমান হইয়াও তাঁহারা সেগুলিকে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। সধবা নারীর সিন্দুর পরার অভ্যাসটী তাই অনেক শত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবেই চলিতেছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

[১]

প্রাচীন আর্য্যসমাজে অতিথি সৎকারের কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল। সাধারণ অতিথি অপেক্ষা বিশেষ সম্মানভাজন কতকগুলি অতিথির জন্য কিছু কিছু বিশেষ নিয়ম ছিল। বৎসরের মধ্যে একবার রাজা, আচার্য্য, শ্বশুর,

বরের অর্চ্চনা এবং বরণ

ঋত্বিক্ (পুরোহিত), সখা এবং মাতুল বা মাতামহ ইহাদের মধ্যে কেহ গৃহস্থের বাটীতে আসিলে গৃহস্বামী বিশেষ সম্মাননার সহিত তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। বিবাহের বরও ঐরূপ বিশেষ অতিথির মধ্যে একজন। তিনি কন্যাদাতার বাটীতে আসিবামাত্র কন্যাদাতা তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত উৎকৃষ্ট আসনে বসাইয়া পা ধুইবার জল, সুগন্ধি মাঙ্গলিক জল, দধি, মধু এবং ঘৃত সংযুক্ত পুষ্টিকর রুচিজনক অথচ স্নিগ্ধ পানীয় এবং পরে মাংসসংযুক্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন দ্রব্যের দ্বারা সৎকার করিতেন। সেই প্রাচীনকালে বসিবার জন্য কুশাসনকে বিষ্টর [হিন্দিতে 'বিস্তারা']; পা ধুইবার সুখস্পর্শ জলকে পাদার্থ উদক [পাদার্থ মুদকং—"পাদ প্রক্ষালনার্থং তাম্রাদি পাত্রস্থং জলংসুখোষ্ণম্" *] পা রাখিবার দ্বিতীয় আসনকে [দ্বিতীয় এক 'বিষ্টর' কে] পাদ্য [পাদ্যং "পদ্ভ্যাং আক্রমণীয়ং দ্বিতীয়ং বিষ্টরং"]; সুগন্ধি মাঙ্গলিক জলকে অর্ঘ [অর্ঘং—গন্ধ-পুষ্পাক্ষতকুশ-তিল-শুভ্রসর্ষপ-দধি-দূর্ব্বান্বিতং স্বুবর্ণাদি পাত্রস্থমুদকং]; কমণ্ডলু, ঘটি বা গাড়ুতে রাখা আচমন করিবার বা মুখ ধুইবার জলকে আচমনীয়; দধি, মধু এবং ঘৃতসংযোগে প্রস্তুত মিষ্ট এবং স্নিগ্ধ পানীয়কে মধুপর্ক বলিত। এই মধুপর্ক ঢাকনি সংযুক্ত একটী কাংস্য পাত্রে রাখা হইত। 'বিষ্টর' আদি সাতটী দ্রব্য গৃহ্যসূত্রোক্ত অতিথি সৎকারের উপচার। পশুপতির পদ্ধতি গ্রন্থে "আদ্য ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কারের" ব্যবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে,

* তামার পাত্রে, গাড়ু, ঘটী ইত্যাদিতে রাখা আরাম জন্মে [শীতকালে গরম করা গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা] এরূপ পা-ধুইবার জল।

† সোনা, রূপা, তামার ইত্যাদি ধাতু পাত্রস্থ চন্দন, ফুল, আতপ চাউল (নখ দিয়া খোঁটা–ভাঙ্গা নয় (অক্ষত), কুশ, তিল, শ্বেত সর্ষপ, দধি এবং দূর্ব্বা মিশ্রিত জল। আজকাল রূপা অথবা তামার 'কোশাই' 'অর্ঘপাত্র' রূপে ব্যবহৃত হয়।

তাঁহার সমসাময়িক সমাজে কন্যার শিশু বিবাহ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গৃহ্যসূত্রোক্ত বরার্চ্চনার ব্যবস্থাগুলির বিভাগ

এই হেতুই তিনি গৃহ্যসূত্রোক্ত বরার্চ্চনার ব্যবস্থাগুলি ভাগ করিয়া প্রথমে "অথ বরণম্" —বলিয়া বরকে আসনে বসাইয়া কন্যাকর্ত্তার দ্বারা অর্ঘ, আচমনীয়, চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দিয়া তাহার অর্চ্চনা করাইয়া দূর্ব্বা এবং আতপ তণ্ডুল সহিত বরের দক্ষিণ জানু ধরিয়া (১) মাস, পক্ষ এবং তিথি ইত্যাদির উল্লেখের পর উভয় পক্ষের তিন পুরুষের নাম, গোত্র এবং প্রবরের উল্লেখ করত "অমুকী কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া বরণ (নিয়োগ) * করিতেছি"—এই কথা বলাইয়া এবং বর "যে আজ্ঞা" বলিলে পুনশ্চ কন্যাদাতা "আপনি যথাবিধি বরের কার্য্য করুন" বলিয়া অনুরোধ করিলে, বর "যেমন জানি তেমনই করিব" বলিবেন—ইত্যাদি ব্যবস্থা এবং তাহার পর স্ত্রীআচার-সঙ্গত মুখ-চন্দ্রিকা ইত্যাদি করাইয়া আবার ছায়ামণ্ডপে বরকে আনিয়া "অথ সম্প্রদানম্"—এই শীর্ষক দিয়া বিষ্টর, পাদার্থ উদক, অর্ঘ, আচমনীয় এবং মধুপর্ক ইত্যাদি দ্রব্যসমূহের দ্বারা অর্চ্চনার কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহার পর ছায়ামণ্ডপে চারি হাত সমচতুরস্র স্থণ্ডিল বা বেদীর উপর অগ্নিস্থাপন, অগ্নির পূজা, কন্যার বস্ত্র এবং উত্তরীয় পরিধান, শুভদৃষ্টি, ইত্যাদি কার্য্যের পর, পুনরায় উভয় পক্ষের

---

(১) কন্যাদাতা বরের হাঁটু ধরিয়া বরণের সংকল্পবাক্য বলেন বলিয়া আমাদের দেশের মেয়েরা বলেন—"অমুকের পায়ে ধ'রে মেয়ে দিয়েছে, জানে না?"—ইত্যাদি। "কেন হাঁটু ধরে—আর কোনও জায়গায় ধরে না" শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর নাই। আমাদের মনে হয়—দাতার বিনয় প্রকাশের জন্য হাঁটু ধরা হয়।

* বরণ=শাস্ত্রমতে 'বরণ' করিতে হইলে বা কোন দ্রব্য দান করিতে হইলে বরণ কর্ত্তাকে বা দাতাকে, গৃহীতার দক্ষিণ জানু ধরিয়া বরণের বা দানের সংকল্পবাক্য বলিতে হয়।

তিন পুরুষের নাম, গোত্র এবং প্রবর উচ্চারণের পর "সালঙ্কারা সবস্ত্রা ও সাচ্ছাদনা কন্যা" সম্প্রদান এবং বরের "স্বস্তি' [সু+অস্তি—শুভ হউক] বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক দানগ্রহণ স্বীকারের ব্যবস্থা বর্ণিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত লোকাচারের প্রভাবে পশুপতি-পদ্ধতির আদেশ গুলির কার্য্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তিতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

[২]

অতি পূর্ব্বকালে, অর্থাৎ আর্য্য সভ্যতার প্রথম যুগে, অনধিক দুই বৎসর বয়সের একটী গোরুকে মারিয়া তাহার মাংস পাক করিয়া মধুপর্কের সহিত অতিথি সেবার জন্য দিতে হইত। এমন কি, মাংসহীন মধুপর্কের ব্যবস্থা শাস্ত্রে ছিল না। শ্রুতি, প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র, মহাভারত এবং আয়ুর্ব্বেদ হইতে জানিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরাও গোমাংস খাইতেন এবং অতিরিক্ত গোমাংস-ভক্ষণের ফলে আর্য্যাবর্ত্তে অতিসার রোগের প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। জগতের প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋগ্‌বেদের গোসূক্তে গোবধের বিরুদ্ধে উপদেশের অস্তিত্ব দেখিয়া অনুমিত হয় যে, প্রাচীন কালেই গোবধ-প্রথার বিরুদ্ধে লোক-মত প্রচারিত হইয়াছিল। চরক ঋষির সংহিতায় অতিসার (Inflammatory diarrhœa with fever) রোগের নিদান বর্ণনায় বৈবস্বত মনুর পুত্র পৃষধ্র নামক রাজার যজ্ঞে অন্যান্য যজ্ঞীয় পশুর অভাবে অজস্রগোবধ করার ফলে ভারতখণ্ডে ঐ সাংঘাতিক রোগের প্রথম আবির্ভাব হওয়ার ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগেই বৈদিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্ব্বাক্ প্রভৃতি অবৈদিক বা লৌকায়তিক সম্প্রদায় সমূহের উদ্ভব হওয়ার ইতিহাস বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণু প্রভৃতি অতি প্রাচীন মহাপুরাণে পাওয়া যায়। আমরা হিন্দুসমাজের উপর ইহাদের প্রভাবের কথা পরে বলিব। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভ্রমবশতঃ চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীকে জৈন সম্প্রদায়ের এবং শাক্য শুদ্ধোদনের পুত্র

অন্তিম বুদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতমকে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করায় এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্বেতকায় গুরুগণের সেই সকল কথা শিরোধার্য্য করত পুনঃপুনঃ সেইগুলিরই প্রচার করিয়া দেশের অজ্ঞতা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আর তজ্জন্যই বেদান্ত সূত্রাদি দর্শনশাস্ত্রে এবং রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে জৈন ও বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলেই নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে নিরুদ্বেগে এবং নিঃসংশয়ে সেই সেই অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

[৩]

যাহা হউক, প্রাচীনকালে যজ্ঞে, শ্রাদ্ধে এবং অতিথি সেবায় গোবধ করা হইত। পরে কালধর্ম্মে উহা অপ্রচলিত বা নিষিদ্ধ হইবার এবং "মম চামুষ্য পাপ্মাহতঃ ওঁ উৎসৃজত তৃণান্যত্তু (পিবতু উদকম)" অর্থাৎ—"আমার এবং গৃহস্বামীর পাপ বিনষ্ট হউক; আহা, উহাকে ছাড়িয়া দাও, সে ঘাস, জল খাউক"—[ঋগ্‌বেদীয় গোসূক্ত] এই বাক্যটী বলিয়া গোরুটীকে ছাড়িয়া দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই নিষেধ বাক্যটী এই:—

গোবধ নিবারণ এবং পারস্করের আদেশ

ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং

স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।

প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায়

মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট॥ ৮।১০১।১৫

—ঋগ্‌বেদ

সায়ন ভাষ্যানুগত মর্ম্মানুবাদ=এই গাভী রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী এবং অমৃতরূপ দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির জন্মস্থান; যাঁহাদের জ্ঞান আছে, সেই প্রজ্ঞাবান্ সজ্জনদিগকে আমি

এই কথা বলিতেছি—এই নিষ্পাপা অদিতিকে (তেজস্বিনীকে) তোমরা কেহ বধ করিও না।

গৃহ্যসূত্রকার পারস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—অপর পক্ষে যদি গোরুটীকে বধ করাই অতিথি মহাশয়ের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তিনি ছাড়িয়া দিবার বাক্যের "পাপ্মাহতঃ" অংশের পরিবর্ত্তে "পাপ্মানং হনোমি" এই বাক্য বলিবেন। [প্রথম কাণ্ডের তৃতীয় কণ্ডিকার ২৭শ সূত্র]। আর অতিথির এই বাক্য উচ্চারণের পর, অতিথিসৎকারপরায়ণ গৃহস্থ, পশুটীকে বধ করিয়া তাহার মাংস মধুপর্কের সহিত অতিথিকে নিবেদন করিতেন—এই প্রথা ছিল।

[৪]

অবৈদিক বা লৌকায়তিক জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাববশতঃ আর্য্যসমাজে মাংস ভোজনের প্রথা বিরল হওয়ায় এবং বিশেষতঃ গোবধ

গৌর বা গৌড় বচনের সৃষ্টি

একেবারে নিষিদ্ধ হওয়ায়, মধুপর্কের সহিত মাংস দেওয়ার প্রথা উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য একটী গোরুকে আনিয়া মণ্ডপের নিকট বাঁধিয়া রাখা হইত এবং গৃহস্বামী অথবা নাপিত মুখে "গৌঃ গৌঃ গৌঃ" অর্থাৎ—"গোরু আছে" এই কথাটী তিনবার উচ্চারণ করিবার এবং লোক দেখাইবার জন্য—[যেন অতিথির অনুমতি পাইলেই গোরুটীকে কাটিয়া দেন]—এইভাবে একখানি খড়্গ হাতে ধরিয়া দাঁড়াইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। গৃহস্বামী [এখানে কন্যাদাতা] "গৌঃ গৌঃ গৌঃ" [সন্ধির নিয়মানুসারে গৌর্গৌর্গৌঃ] মুখে বলিয়া এবং খড়্গ একখানি হাতে ধরিয়া দাঁড়াইলেই অতিথি [এখানে জামাতা] শিষ্টাচারবশতঃ ঋগ্বেদের (৮।১০১।১৫) উল্লিখিত গোসূক্ত পাঠ করিয়া বলিতেন—"গোরুটীকে ছাড়িয়া দিউন, সে ঘাস, জল খাইয়া বাঁচুক, আমি প্রার্থনা

করিতেছি—আমার এবং উঁহার [গৃহস্বামীর] উভয়ের পাপ বিনষ্ট হউক।" যাহাহউক, সংস্কৃত সন্ধির নিয়মানুসারে "গৌঃ" শব্দটী দ্রুতভাবে তিনবার উচ্চারণ করিলেই "গৌর্ গৌর্ গৌঃ" এইভাবে মানুষের কানে শুনা গিয়া থাকে ; তাই, বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীরা "গৌর্ গৌর্ গৌঃ"কে "গৌর গৌর" করিয়া অত্যাশ্চর্য্য গৌড় বচনের সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈদিক সমাজের প্রথা-পদ্ধতির এইরূপ হাস্যকর পরিবর্ত্তন যে কত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা গণনা করা দুরূহ।

[৫]

সমাংস মধুপর্কের এই অনুকল্প-বিধান [অর্থাৎ গোরুটীকে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহস্বামীর মুখে "গৌ র্গৌ র্গৌঃ" তিনবার উচ্চারণ করার এবং খড়্গ হস্তে দাঁড়াইবার ব্যবস্থা] সামবেদীয় ভট্টভবদেবের এবং যজুর্ব্বেদীয় পশুপতির পদ্ধতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে। ভবদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের এবং পশুপতি দ্বাদশ শতাব্দের ব্যবস্থাদাতা ছিলেন। এই সাত আট শত বৎসরের পরে, আমরা এখন গো-বধের নাম শুনিলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি এবং বিবাহে বরের অর্চ্চনায় মধুপর্কের ব্যবস্থায় কন্যাদাতার "গৌ র্গৌ র্গৌঃ" বলায় এবং খড়্গ হস্তে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নাপিতের অতি হাস্যকর এবং অর্থশূন্য কতকগুলি ছড়া কাটানোর প্রথা দাঁড়াইয়াছে এবং সেই ছড়াগুলিকেই গৌরবচন বা গৌড়বচন বলার নিয়ম হইয়াছে। আরও হাস্যকর ব্যবস্থা এই যে, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোনও স্থানে—[বিশেষতঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে] কন্যাসম্প্রদান-কার্য্যের পর, বিজ্ঞ পুরোহিত মহাশয় সেই গোরু ছাড়িবার "ওঁ উৎসৃজত তৃণান্যত্তু পিবতূদকম্"—"আহা উহাকে ছাড়িয়া দাও,

গৌ র্গৌ র্গৌঃ বলার এবং খড়্গ হস্তে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে নাপিতের ছড়া কাটানোর প্রথা

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে হাস্যকর ব্যবস্থা

বেচারী ঘাস, জল খাইয়া বাঁচুক” মন্ত্রটী পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তঃ সম্প্রদত্তা কন্যার হাতের কুশের বাঁধন খুলিয়া দেন !!! সীতা, সুভদ্রা, সাবিত্রী এবং শকুন্তলা প্রভৃতি তেজস্বিনী আর্য্যনারীগণের বর্ত্তমান দুহিতারা বাঙ্গালীর নিকট নিরীহ গোরুতেই পরিণত হইয়াছেন, ইহা দেখিলে হাস্যের পরিবর্ত্তে শোকাশ্রু বিগলিত হইবার কথা।

[৬]

বরার্চ্চনা বিষয়ে পশুপতির ব্যবস্থা প্রদানের উদ্দেশ্য

ভূপতিপণ্ডিত পশুপতি যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর গৃহ্যসূত্রকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া দশবিধ সংস্কারের পদ্ধতি প্রণয়ন করিলেও তাঁহার সমসাময়িক আচার-ব্যবহারের সহিত সমন্বয় রাখিবার উদ্দেশ্যে গৃহ্যসূত্রের পরংপরা ক্রম-গুলির কিছু কিছু ইতর বিশেষ করিয়াছেন। বরের অর্চ্চনার ব্যবস্থায় গৃহ্যসূত্রকার প্রথমেই একখানি আসন আনাইয়া তাহার উপর ভদ্রভাবে বসিবার জন্য অনুরোধ এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এবং সেই অনুমতি পাইবার পর ‘বিষ্টর’, পাদ্য, পাদার্থ উদক, আচমনীয়, মধুপর্ক ইত্যাদি সমুদয় বস্তু প্রস্তুত রাখিয়া একে একে ঐ দ্রব্যগুলির দ্বারা ক্রমান্বয়ে অর্চ্চনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া পরে “গৌঃ গৌঃ গৌঃ” ইত্যাদি বাক্যোচ্চারণাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা অর্চ্চনা শেষ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

[৭]

গৌরবচন পাঠ, কন্যা আনয়ন ও কন্যার সপ্ত প্রদক্ষিণ

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণদিগের সমাজে বিবাহ-মণ্ডপ-মধ্যে বেদীস্থিত ঐ বিগ্রহ ও ঘট পূজাদির পর কন্যাদাতা পাদ্য (গামলা), অর্ঘ, কোষা, আচমনীয় (ঘটী বা গাড়ু), পুনরাচমনীয় [কলস বা লোটা] এবং মধুপর্ক [কাঁসার বাটী বা থালা] প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার ও

মূল্যবান্ দ্রব্যাদি দ্বারা বরকে অর্চ্চনা এবং বরণ করিলে পর নাপিত গৌর বা গৌড় বচন পাঠ করে, অর্থাৎ—কতকগুলি ছড়া কাটে। তৎপরে শাস্ত্রীয়বিধানে বৈবাহিক বহ্নি স্থাপিত হইলে বর-কন্যার মস্তকে মুকুট [সোলার টোপর] পরান হয়। ইহার পর সুসজ্জিতা সালঙ্কৃতা কন্যাকে পিঁড়িতে বসাইয়া চারিজন লোকে উঠাইয়া আনিয়া বরের চতুর্দ্দিকে সপ্তপ্রদক্ষিণ করেন। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের সঙ্গে সঙ্গে কন্যা বরকে ফুল দিয়া করযোড়ে প্রণাম করে। তৎকালে কুমারী ও সধবা স্ত্রীলোকেরাও উলুধ্বনি সহকারে বরণডালা সহ উভয়ের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করেন। ঐসময় বরকর্ত্তৃক পঞ্চাননের (?) বিবাহ-পদ্ধতি-লিখিত "চন্দ্রস্ত্বা চন্দ্রেন ক্রীণামি শুক্রং শুক্রেণ মৃত মমৃতেন সম্মেতে গৌরস্মেতে চন্দ্রামি" মন্ত্র পাঠের পর কন্যাদাতা বর-কন্যাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া বসান। তৎপরে বর নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী পাঠ করিলে বর-কন্যার পরস্পর মুখাবলোকন ও দৃষ্টি-বিনিময় হয়। ইহাকে শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিকা বলে :—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদ্রেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥ ৪৭ ॥

—ঋগ্‌বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত

মন্ত্রার্থ—"বিশ্বদেবতাগণ আমাদের দুইটী হৃদয় এক করুন, জল আমাদের হৃদয় এক করুন, বায়ু আমাদের বুদ্ধিকে পরস্পরের অনুকুল করুন, বিধাতা এবং সরস্বতী দেবী আমাদের দুইটী হৃদয় এক করুন।" হলায়ুধ ভাষ্যমতে ঐ মন্ত্রদ্বারা স্পর্শ করিতে হয়, কিন্তু অবলোকন ব্যতীত স্পর্শ করা গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের প্রচলিত প্রথা নহে।" উক্ত "চন্দ্রস্ত্বা চন্দ্রেন"—

ইত্যাদি মন্ত্রটী ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব (২), পারস্কর গৃহ্যসূত্র, হরিহর অথবা পশুপতির পদ্ধতিতে নাই। ঐ দেশীয় পঞ্চানন অথবা কোন পদ্ধতিকার উহার উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং উহা অন্য গ্রন্থে না থাকিলেও প্রামাণ্যই বলিতে হইবে। পাঠের ব্যবহারও চিরন্তন।

[৮]

আমরা ২২৫ পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গক্রমে অবৈদিক বা লোকায়তিক জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাবের কথা বলিয়াছি। এক্ষণে এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাউক। অবৈদিক সম্প্রদায় প্রধানতঃ তিনটী ছিল; যথা—বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্ব্বাক। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের আচার্য্যেরা বেদের কর্ম্মকাণ্ড মানিতেন না, বেদকে অপৌরুষেয় (ভগবানের কৃত) বলিয়াও স্বীকার করিতেন না এবং জগতের মূলকারণস্বরূপ পরব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না বটে, কিন্তু কর্ম্ম, কর্ম্মফল এবং পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সদাচার, সামাজিক সুনীতি এবং শম-দম-তিতিক্ষা-যম-নিয়মাদির সাহায্যে ধ্যান ও সমাধির দ্বারা মুক্তি বা মোক্ষলাভ প্রভৃতি ঐহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতির যাবতীয় উপায় এবং নিয়মকে মানিয়া চলিতেন। বৌদ্ধ এবং জৈনেরা বৈদিক চারি বর্ণের এবং চারি আশ্রমের নিয়মগুলিও যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতেন এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের [খাদ্য পানীয়াদির বিচার, নারীসঙ্গের বৈবাহিক নিয়মাদির] উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বৌদ্ধ গৃহী

আর্য্য সমাজে জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাব

---

(২) ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব=এই পদ্ধতির প্রণেতা হলায়ুধ পণ্ডিত, রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। তিনি সাময়িক যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের (রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর) মধ্যে বৈদিক আচার প্রতিপালনের বৈলক্ষণ্য অথবা অবহেলা দেখিয়া আচারের সুপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্যসূত্রানুগত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নাম দিয়া সংস্কার-পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

এবং সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে মাংস ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, কেবল আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে স্বয়ং পশু-পক্ষী-মৎস্যাদির প্রাণবধ করিতেন না—এই মাত্র নিয়ম ছিল, এবং অদ্যাপি বৌদ্ধসম্প্রদায় [যেমন আরাকান, ব্রহ্ম, শ্যাম ও সিংহলাদি স্থানে] সেই নীতি-নিয়ম মানিয়া চলিতেছেন। জৈন সম্প্রদায়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনও প্রাণীর প্রাণবধ চিরকালই নিষিদ্ধ রহিয়াছে এবং জৈন যতি বা সন্ন্যাসীরা এসম্বন্ধে অতিশয় কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক কালে গৌড়-বঙ্গের সর্ব্বত্র যে বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যোয়াঙ চাঙের ভ্রমণ-বিবরণে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায়। পশ্চিম বাঙ্গালার মানভূম জেলায় এখনও বহু প্রাচীন জৈনমন্দির ও জৈনতীর্থঙ্করগণের প্রস্তর মূর্ত্তি অনাদরে ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং "সরাবক" জাতি ও সরাবকী বাঙ্গালা ভাষা আজিও বাঁকুড়া এবং মানভূম জেলার স্থানে স্থানে প্রাচীন জৈন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। "সরাবক" জাতির লোকে প্রধানতঃ তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং তাহারা যে এক প্রকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করে, তাহাকেই সরাবকী বাঙ্গালা ভাষা বলে। 'শ্রাবক' শব্দ হইতে সরাবক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। জৈন গৃহস্থেরা একেবারে কঠোর নিরামিষ ভোজী। চার্ব্বাক্ সম্প্রদায়ের ভিতর কোন ধরা বাঁধা নিয়মের বা নীতির অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের মতে মানুষ মরিলেই সমস্ত সমাপ্ত হয়। তাঁহারা স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, কর্ম্মফল, পরলোক অথবা পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব কিছুই মানিতেন না। যতদূর সাধ্য সুখভোগে জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহাদের মূল নীতি ছিল; সুতরাং চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ এবং মিথ্যাভাষণাদির দ্বারাও

সাময়িক সুখভোগ করায় তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। কারণ—তাঁহাদের মতে একবার মরিলেই সব আপদ চুকিয়া যায়।

চার্ব্বাক-সম্প্রদায় বহুকাল লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন বিষয় উপলক্ষে কেবল মাত্র নিজের সুবিধার জন্য চার্ব্বক-মত চালাইয়া থাকেন। চার্ব্বকেরা বেদবিশ্বাসী ব্রাহ্মণদিগকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী হইতে বুঝা যায়:—

ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচং স্মৃতম্॥২৮

—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ

অর্থাৎ—"ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর ইঁহারাই—তিন বেদের কর্ত্তা। জর্ফরী, তুর্ফরী প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের অদ্ভুত বাক্যেই ইহা পরিপূর্ণ। ইহা হইতেই জানা যায়, বেদ কত দূর সত্য!"

কন্যাসম্প্রদান

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিবাহ করিবার জন্য বরণ এবং উভয় পক্ষের তিন পুরুষের নাম গোত্র উচ্চারণ করত কন্যাসম্প্রদান করার ব্যবস্থা গৃহ্যসূত্রে নাই—একেবারে বর-কন্যার বস্ত্রপরিধান, শুভ-দৃষ্টি, বৈবাহিক মন্ত্র এবং হোমাদির উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাচীনকালে সম্প্রদান একরূপ শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য হইত,—এখনকার মত উহার এত মাহাত্ম্য ছিল না। যখন আদিম কালের সমাজে পুত্র-কন্যা মাতা পিতার গোরু, ছাগল ইত্যাদি

প্রাচীনকালে সম্প্রদান একটা শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য হইত

পশুর মত একটা "সম্পত্তি বিশেষ" ছিল এবং মাতা-পিতা একত্র হইয়া দান-বিক্রয়াদির দ্বারা সন্তানকে হস্তান্তরিত করিতেন—[এমন কি মারিয়া ফেলিতেও পারিতেন]—সেই সময়ে পিতা, কন্যাকে বরের হস্তে প্রদান করিলে তবে কন্যার শরীরের উপর [হস্তান্তরিত পশুর শরীরের উপর দান গ্রহীতার যেমন হইত] বরের স্বত্ব-স্বামিত্ব জন্মিত। এইজন্য মনু মহারাজ সম্প্রদানকে "স্বামিত্বের কারণ" বলিয়াছেন। পরে, সমাজের উন্নত অবস্থায়, পুত্র-কন্যার ঐরূপ পশুবৎ অবস্থা দূরীভূত হইয়াছিল। মহাভারতে সুভদ্রা দেবীর বিবাহের উপলক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"প্রদানমেব কন্যায়াঃ পশুবৎ কোঽনুমন্যতে"—অর্থাৎ, "কোন্ ভদ্রলোক পশুর হস্তান্তর করার মত কন্যাকে 'দান' করিবার প্রথার অনুমোদন করিতে পারেন?" প্রকৃতপক্ষে, কন্যার পিতা,

পিতা, বরকে দাম্পত্য-স্বত্ব দান করিতে পারেন না

বরকে দাম্পত্য-স্বত্ব দান করিতে পারেনও না। কন্যা তাঁহাকে "বাবা" বলিত, এই স্বত্বটুকু পিতার থাকে,—কন্যার উপর 'দাম্পত্য স্বত্ব' তাঁহার থাকে না; আর যে স্বত্ব তাঁহার নাই, সে স্বত্ব অপরকে তিনি কেমন করিয়া দিতে পারেন? দাতার স্বকীয় স্বত্বের ধ্বংসসাধন করিয়া সেই দ্রব্যে গ্রহীতার স্বত্ব স্থাপনের নাম দান। মাতা পিতা কন্যাকে লালন-পালন করিয়া থাকেন, তাই বিবাহকালে তাঁহাদের সম্মতিসূচক সম্প্রদান শিষ্টাচাররূপেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনেক পরে, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর যৌবন-বিবাহের পরিবর্ত্তে যখন

ব্রাহ্মণেতর জাতির সম্প্রদানই বিবাহ

বাল্য বা শিশু-বিবাহের প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল, তখন নাবালগ বা অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কন্যার বিবাহে 'সম্প্রদান' ব্যাপারই বিবাহের প্রধান অঙ্গ—[এবং দ্বিজ তিনবর্ণ ব্যতীত শূদ্র এবং তাহারও নিম্নতর সমাজে উহাই একমাত্র অঙ্গ]—হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ আমাদের দেশে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য

এবং সেইরূপ অন্যান্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের কৃপায় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের লোপাপত্তি হওয়ায় একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই প্রকৃত বিবাহ সংস্কারের নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা থাকিল; আর কায়স্থ এবং অন্যান্য শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যাবতীয় জাতির সমাজে সংস্কারাত্মক বিবাহ উঠিয়া গিয়া শুধু সম্প্রদানই 'বিবাহ' বলিয়া পরিগণিত হইলে লাগিল।

যাহা হউক, পূর্ব্ব কথিত মুখচন্দ্রিকার [শুভ-দৃষ্টির] পর কন্যা-সম্প্রদান হয়। সম্প্রদানকালে নারায়ণ, মঙ্গলঘট, কোশাকুশী ও পুষ্প-পাত্র থাকে। পশুপতি পণ্ডিত তাঁহার পদ্ধতিতে লিখিয়াছেন—"অথ কন্যাদাতা পূর্ব্বাভিমুখোপবিষ্টস্য বরস্য অগ্রতঃ পশ্চিমাভিমুখ উপবিশতি। কন্যাঞ্চ পশ্চিমাভিমুখীং ক্রোড়স্থানে উপবেশ্য কন্যাবরৌ সম্মুখীনৌ কারয়তি—ইত্যাদি", অর্থাৎ—"অনন্তর কন্যাদাতা পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট বরের সম্মুখে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিবেন এবং কন্যাকেও পশ্চিম দিকে [বরের দিকে] মুখ করিয়া নিজের কোলের কাছে বসাইয়া বর-কন্যা পরস্পরের শুভ-দৃষ্টি করাইবেন—ইত্যাদি; এইরূপে, বর-কন্যা পরস্পর শুভ-দৃষ্টি করিবার পর, ঐভাবে বসিয়াই কন্যাদাতা কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে গৃহ্য-পরিশিষ্টের নাম করিয়া "প্রত্যঙ্‌মুখা বরয়ন্তি প্রতিগৃহ্ণন্তি প্রাঙমুখাঃ"—অর্থাৎ কন্যাদাতা পশ্চিমমুখে এবং কন্যাগৃহীতা পূর্ব্বমুখে বসিবেন"—ইহাই ব্যবস্থা দিয়াছেন। অথচ পূর্ব্বকাল হইতে শিষ্টাচার ছিল,—"দাতা পূর্ব্বমুখে এবং গ্রহীতা উত্তরমুখে বসিবেন।" "আধুনিক ব্যবহারে বসিবার নিয়ম এরূপ উল্টা হইল কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কাশীখণ্ড প্রভৃতি পুস্তকে শিব-বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—এইরূপ ঐতিহ্য আছে। হিমালয়ের বাটীতে কন্যাদানের প্রাক্‌কালে, পূর্ব্বাচরিত শিষ্টাচারানুসারে কন্যাদাতা

কন্যা-সম্প্রদানকালে বর-কন্যা এবং কন্যাদাতার উপবেশন-বিধি

হিমালয়ের আসন পূর্ব্বমুখ করিয়া, কন্যাগৃহীতা শিবের আসন উত্তরমুখ করিয়াই পাতা ছিল, কিন্তু—

ভবানীর ভাবে হর টলিতে টলিতে।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ত্বরিতে॥
বিধি তাহে বিধি দিলা হইল নিয়ম।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥

—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

সুতরাং পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ এবং কোন কোন শাস্ত্রকার লিখিলেন:—

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্‌মুখো দাতা গৃহীতা চ উদঙ্‌মুখঃ।
এষ এব বিধিঃ প্রোক্তো বিবাহেতু ব্যতিক্রমঃ॥"

এবং এই ব্যতিক্রমের ফলে কন্যাদাতা হিমালয় উত্তরমুখে বসিয়া কন্যাদান করিলেন এবং মহাদেব পূর্ব্বদিকে বসিয়া সেই দান গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারেরই ঐতিহ্য নিম্নলিখিত শ্লোকে:—

"উপবিষ্টস্ত্রিনেত্রস্তু শাক্রীং দিশমুপাসতে।
সপ্তর্ষিকাষ্ঠাং শৈলেন্দ্রস্তূপবিষ্টো বিলোকয়ন্॥"

এবং ইহার পাঠান্তর শ্লোকে:—

"উপবিষ্টস্ত্রিনেত্রস্তু প্রাচীং দিশমুদৈক্ষত।
সপ্তর্ষিসেবিতামাশাং শৈলেন্দ্রোঽপ্যবলোকয়ৎ॥"

[অর্থাৎ—"ত্রিলোচন শিব বিবাহকালে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসিলেন এবং গিরিরাজ হিমালয়ও উত্তরমুখে উপবেশন করিলেন]

বাঁধা পড়িয়াছে। ঐ দুইটী শ্লোকের অর্থ একই। উহাদের অন্বয় এইরূপ:—ত্রিনেত্রঃ (শিবঃ) তু (কিন্তু) উপবিষ্টঃ (সন্) শাক্রীং/প্রাচীং উপাসতে/উদৈক্ষত (অবলোকিতবান্)। শৈলেন্দ্রঃ (হিমালয়ঃ) তু/অপি (অপিচ)

সপ্তর্ষিকাষ্টাং / সপ্তষিসেবিতাং আশাং (উত্তরদিক্) বিলোকয়ন্ (পশ্যন্) / অবলোকয়ৎ (দদর্শ) উপবিষ্টঃ ॥

উক্ত "উপবিষ্ট স্ত্রিনেত্রস্ত ইত্যাদি" শ্লোকের অনুকূলে—

"নিরগ্নিকঃ সম্প্রদাতা কন্যাং দদ্যাদুদঙ্মুখঃ"

অর্থাৎ—"নিরগ্নিক কন্যাদাতা উত্তর মুখে বসিয়া কন্যাদান করিবে" এই বিধান রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণ মাত্রেই নিরগ্নিক—ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের তো কথাই নাই। তথাপি পশুপতি পণ্ডিত, ভবদেব ভট্ট এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদি পদ্ধতিকার উক্ত ব্যতিক্রমের উপর আবার এক দ্বিতীয় ব্যতিক্রম চালাইয়া কন্যাদাতাকে উত্তর দিকের পরিবর্ত্তে পশ্চিম দিকে [অর্থাৎ, ঠিক বরের সম্মুখে বরের দিকে মুখ করিয়া] মুখ করিয়া বসাইয়াছেন। ভট্ট ভবদেব লিখিয়াছেন:—

"প্রাঙ্মুখাভিরূপায় বরায় শুচি সন্নিধৌ।
দদ্যাৎ প্রত্যঙ্মুখঃ কন্যাং ক্ষণে লক্ষণসংযুতে ॥"

অর্থাৎ—"পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট অভিরূপ (সুন্দর) বরকে শুচির (অগ্নির) নিকটে শুভলক্ষণসংযুক্তকালে বা লগ্নে পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট কন্যাদাতা কন্যাদান করিবেন।" তথাপি লোকাচারে দেখা যায়—গোয়ালপাড়া জেলার ব্রাহ্মণ এবং তদনুগত উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু সমাজে ভবদেব, পশুপতি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবহার প্রচলন নাই; তাহার পরিবর্ত্তে উল্লিখিত শিব-বিবাহের ব্যতিক্রম অথবা নিরগ্নিক দাতার মাননীয় ব্যবস্থার—অর্থাৎ, পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরকে উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট কন্যাদাতা কন্যা-সম্প্রদান করেন, কিন্তু কন্যাকে বরের ঠিক সম্মুখভাগে পশ্চিমমুখেই বসাইয়া থাকেন।

পারস্করাচার্য্যের গৃহ্যসূত্রে এই "মুখোমুখী" বা "বসাবসি" লইয়া কোন কলহ নাই। কন্যা-সম্প্রদান ব্যাপারটাই যখন গৃহ্যসূত্রে নাই,

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে "কন্যা সম্প্রদান" নাই

তখন দাতা কোন্ মুখে এবং গৃহীতা কোন্ মুখে বসিবেন, এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন এবং তাহার

সমাধানও তাহাতে নাই। আমাদের অবনতির যুগে যখন প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম এবং সদাচার লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই এই সব নগণ্য 'বসাবসির' মারামারি আচারের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সব খুঁটিনাটি সারশস্যহীন কেবল "উপ-আচারের" তুষগুলিই সমাজে সদাচারের স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই আমরা গ্রন্থের এতটা স্থান নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা হউক, কন্যাদাতা মন্ত্রপাঠ এবং কুশাদিমিশ্র জল বর-কন্যার হাতে ঢালিয়া কন্যাদান করিবার পর বর "স্বস্তি" অর্থাৎ "শুভ হউক' এই বাক্যে সেই দান গ্রহণ স্বীকার করেন এবং তাহার পর কন্যাদাতা দানের দক্ষিণা স্বর্ণ কিংবা গাই-বলদ এক জোড়া এবং বিছানা, বাসন-কোসন এবং নানাবিধ বিলাস এবং ব্যবহারের দ্রব্যাদি যৌতক দেন। আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব এবং বন্ধুবান্ধবেরাও নববিবাহিত দম্পতিকে ইচ্ছামত যৌতক বা প্রীতি-উপহার [আজকালকার ভাষায় Marriage presents] প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে বরযাত্রীরা এবং কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজন করেন। যাহা হউক, পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে কন্যা-সম্প্রদানটাই খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানকার শূদ্রদিগের—[দক্ষিণ রাঢ়ীয় শূদ্রাচারী কায়স্থ মহাশয়দেরও]—বিবাহে হোম বা কুশণ্ডিকা অথবা সপ্তপদী গমন নাই; সুতরাং এক সম্প্রদানেই বিবাহকার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়; এবং বিবাহের রাত্রিতে খড়ের আগুনে খই পোড়ানর যে একটী কাণ্ড হয়, তাহা প্রহসন (farce) মাত্র। অথচ বৈদিক বিবাহ-সংস্কারে সম্প্রদান-কার্য্য কেবল 'শিষ্টাচার' মাত্র ছিল! এক্ষণে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উপরিউক্ত "বিবাহের রাত্রে খড়ের আগুনে খই পোড়ান" সম্বন্ধে বলা যাউক।

কন্যাদান, যৌতকদান ও নিমন্ত্রিতগণের ভোজন

পশ্চিম বাঙ্গালার শূদ্রদের বিবাহে এক সম্প্রদানেই বিবাহ-কর্ম্ম সমাপ্ত

বিবাহ রাত্রে খড়ের আগুনে খৈ পোড়ান

গৌড় জনপদে [পশ্চিম বাঙ্গালায়] ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির 'বৈবাহিক হোম' [কুশণ্ডিকা] এবং সপ্তপদী গমন প্রভৃতি কার্য্য নাই—কন্যা-সম্প্রদানের দ্বারাই 'বিবাহ' সিদ্ধ হইয়া যায়। তবে কোনও কোনও স্থলে পুরোহিত মহাশয় "লাজহোমের" একটা লোক দেখান নকল করেন। কতকগুলি খড় জ্বালিয়া বর এবং কন্যাকে দিয়া তিন অঞ্জলি খই সেই আগুনে ছড়াইয়া দেওয়ান এবং নিজে বিড় বিড় করিয়া মনগড়া দুই চারি পংক্তি শ্লোক আবৃত্তি করেন। এই "খই পোড়ানর প্রহসন" সম্প্রদানের পরেই সম্পাদিত হয়। কোন কোন স্থলে, কুলাচারস্বরূপ বাসি বিবাহ নাম দিয়া কতকগুলি স্ত্রীআচার [বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইলে] কন্যাকর্ত্তার বাটীতে অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালায় ভদ্র কায়স্থগণের মধ্যে এখনও দ্বিজাচার আছে

পূর্ব্ব এবং উত্তর বাঙ্গালায় ভদ্র কায়স্থগণের মধ্যে অনেক দ্বিজাচার এখনও বর্ত্তমান আছে। তথায় গৃহদেবতা এবং অন্যান্য দেব-দেবীর [যেমন দুর্গার] পূজায় ঠাকুরকে অন্ন ব্যঞ্জনাদির ভোগ দেওয়া, কায়স্থদিগের বাটীতে ব্রাহ্মণদিগের অন্নভোজন [অবশ্য ব্রাহ্মণের পাক] এবং বিবাহের কুশণ্ডিকার প্রচলনও আছে। তবে কুশণ্ডিকার মন্ত্রগুলি বরের পরিবর্ত্তে পুরোহিত পড়েন,—যেন তাঁহারই বিবাহ হইতেছে !! আমাদের মনে হয়—"মুঘল সম্রাট আকবর সাহের সময় এবং তাহার পরেও পূর্ব্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে রাজশক্তিসম্পন্ন কায়স্থ রাজা এবং ভূঁইয়াদিগের প্রভাব বিদ্যমান থাকায় ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন প্রথা লোপ করিতে পারেন নাই।" তথায় ভদ্র কায়স্থকে ব্রাহ্মণেরা "শূদ্র" বলেন না। সে দেশে গোলাম কায়েতদিগকে শূদ্র বলে। ক্ষাত্রাচার গৃহীত হওয়ার পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের সদাচারী কায়স্থগণের বিবাহে রীতিমতভাবে যজুর্ব্বেদীয় পশুপতি-পদ্ধতিক্রমে বিবাহ-সংস্কার সম্পাদিত হইতেছে।

বিংশ অধ্যায়

কেবল গোয়ালপাড়া জেলায় নহে, বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানেই বিবাহ-সংস্কারের অতি প্রয়োজনীয় বৈদিকাচারানুমোদিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ বর-কন্যার পরস্পর উভয় উভয়কে 'সমীক্ষণ' (ভাল করিয়া দেখা) এবং সেই সময়ে বর কর্ত্তৃক বৈদিক মন্ত্রপাঠ এবং সদাচারসঙ্গত বধূ-বরের হস্তলেপদান এবং গ্রন্থিবন্ধন বা গাঁইট ছড়া বাঁধার পরিবর্ত্তে সম্প্রদানের সময় কে কোন্ মুখে বসিবেন তাহা লইয়াই অতিশয় বিবাদ বিসংবাদ চলে এবং নিরর্থক অথচ হাস্যকর 'গৌরবচন' লইয়াও আড়ম্বর কম হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে সুসভ্য বৈদিককালে প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুশিক্ষিত দ্বিজ বর তুল্যরূপ প্রাপ্তবয়স্কা এবং সুশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতেন এবং বিবাহ-সংস্কারের যাবতীয় বৈদিক মন্ত্র বর এবং দুই একটা কন্যা স্বয়ং পাঠ করিতেন। উভয়ের শিক্ষাদাতা উপস্থিত থাকিতেন এবং বৈবাহিক কার্য্যগুলি শাস্ত্রসম্মতভাবে সুসম্পন্ন হইল কিনা দেখিবার নিমিত্ত একজন আচার্য্যকে [যিনি চতুর্ব্বেদবিৎ সুপণ্ডিত হইতেন] ব্রহ্মার পদে বরণ (১) করা হইত, কিন্তু বৈবাহিক সংস্কারে পুরোহিতের কোন স্থান (*Locus Standi*) বা প্রয়োজন ছিল না। বর পা ধুইবার সময়ে যে মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া বধূকে কাপড় এবং ওড়না পরানোর সময়ে, শুভদৃষ্টি বা সমীক্ষণের সময়ে, বৈবাহিক হোম, অশ্মারোহণ বা শিলারোহণ এবং ধ্রুবনক্ষত্র * প্রদর্শনাদির সময়ে বধূকে সম্বোধন করিয়া কিংবা দেবগণের

* ধ্রুব নক্ষত্র=শুকতারা (Venus) এবং ধ্রুব নক্ষত্র (Pole Star) এক নহে। ঋগ্বেদীয় পদ্ধতির মতে বধূকে ধ্রুব, সপ্তর্ষি (Great bears) এবং অরুন্ধতী (সপ্তর্ষির একতম বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী) সবই দেখাইতে হয়। রাত্রিতে যে বিবাহ হইতে পারে তাহার প্রমাণ নাই। বাঙ্গালায় তান্ত্রিকাচারের প্রভাবে রাত্রিতে বিবাহ সুরু হইয়াছে। গৃহ্য সূত্রে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইবার পর সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে বধূকে ধ্রুব দর্শন করাইবে।

উদ্দেশ্যে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহাদের অতি গভীর অর্থগুলির বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের গতকালের সভ্যতা এবং সদাচারের পরিচয় লাভের জন্য হৃদয় যেমন একদিকে আনন্দে আপ্লুত হয়; আবার বর্ত্তমানকালে নিরক্ষরপ্রায় পুরোহিতের দ্বারা ঠিক যেন নিরর্থক "সাপের মন্ত্র" পড়ার মত শুধু শুধু একটা নিয়ম রক্ষার জন্য সেইগুলির পাঠ শুনিলে ধর্ম্মপ্রবণ সুশিক্ষিত সাধুজনের মনে তুল্যরূপ গাঢ় বিষাদের ছায়া পতিত হয়! ঐ সকল বৈদিক মন্ত্রের [সায়ণাদি (২) সম্মত ভাষ্যের সাহায্যে] অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, গৃহস্থের ধর্ম্মপালন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণযুবক সুশিক্ষিত বর, তুল্যরূপ পূর্ণযুবতী এবং সুশিক্ষিতা বধূকে বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা নিজের গৃহে রাজ্ঞী বা রাণীর আসনে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে নিজের মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন এবং দাসদাসী, ধনজন ও পশ্বাদি সমুদয় সম্পত্তির সযত্নে পালন পোষণ এবং সংরক্ষণের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করিতেছেন। বৈদিক যে কোন গৃহ্যসূত্রে, তাহাদের ভাষ্যে এবং কালেশি (৩), ভবদেব (৪) এবং পশুপতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রণীত পদ্ধতিগুলিতে পাঠক পাঠিকা হিন্দু-বিবাহ-সংস্কারের সেই প্রকৃত চিত্র দেখিয়া আনন্দিত হইবেন এবং অনেক সুশিক্ষিত সজ্জন এবং মহিলা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। স্থানাভাবে এবং কতক পরিমাণে অবান্তর বোধ হওয়ায়, আমাদের ইচ্ছা থাকিলেও অতি সুন্দর সুন্দর মন্ত্রগুলির অধ্যাহার এবং তাহাদের ভাষ্যসম্মত মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পাদটীকা—

(১) ব্রহ্মবরণ (ব্রহ্মার নিয়োগ) = প্রত্যেক যজ্ঞের যাবতীয় কার্য্য যথাশাস্ত্র যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহা দেখাই ব্রহ্মার কর্ম্ম। বিবাহে বরই স্বয়ং হোমাদির মন্ত্রপাঠ করিবেন—এই নিয়ম ছিল। এখনকার মত বর বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে মূর্খ হইতেন না এবং পুরোহিতেরও কোন আবশ্যক হইত না। 'ব্রহ্মা' বরের কার্য্য কেবল নিরীক্ষণ

করিতেন। কোন বিদ্বান্ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিয়া বস্ত্রাদির দ্বারা সৎকার করত "ওঁ অদ্য ইত্যাদি অমুক গোত্রম্ অমুকপ্রবরম্ অমুক বেদান্তর্গত অমুক শাখৈক দেশাধ্যায়িনং শ্রী অমুক দেবশর্ম্মাণং মদীয় বিবাহ-হোম কর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় এভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ব্রহ্মত্বেন ভবন্তং অহং বৃণে" অর্থাৎ—"অদ্য অমুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুক বেদের অমুক শাখার একদেশপাঠী অমুক দেবশর্ম্মা আপনাকে আমার বিবাহের হোমকর্ম্মের ব্রহ্মার [পরিদর্শকের] কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে পুষ্পচন্দন ও মাল্যাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ব্রহ্মার পদে নিযুক্ত করিলাম।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ব্রহ্মার বরণ করিতে হয়।

(২) সায়ণাচার্য্য=দক্ষিণাপথে ইঁহার নিবাস ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দের দ্বিতীয় পাদে [অনুমান ১৩৩৫ খৃঃ অব্দে] বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মাধবাচার্য্য [যিনি সন্ন্যাস আশ্রমে 'বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর স্বামী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন] অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সায়ণাচার্য্য ইঁহার ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সায়ন ঋক্, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের ভাষ্য করিয়াছেন। [যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার ছিলেন মহীধর, রাবণ এবং উব্বট]

(৩) কালেশি=ইঁহার আবির্ভাব কাল সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভট্টভবদেব এবং যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতিকার পশুপতি পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী নহে। কালেশি আশ্বলায়ন সূত্র [ঋগ্‌বেদীয় গৃহ্যসূত্র] যত্নপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া ঋগ্‌বেদী দ্বিজগণের গর্ভাধানাদি সংস্কারের সুন্দর পদ্ধতি লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজে নারীর শিশুবিবাহ [অরজস্কা বালিকার বিবাহ] প্রচলিত হইবার পর এই পদ্ধতি সঙ্কলিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বারেন্দ্র এবং বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা ঋগ্‌বেদী, তাঁহাদের যাবতীয় সংস্কারের কার্য্য কালেশি পদ্ধতিক্রমে হইয়া থাকে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে প্রায় সকলেই সামবেদীয়; দুই এক ঘর যজুর্ব্বেদীয়ও আছেন; কিন্তু ঋগ্‌বেদীয় কেহই নাই।

(৪) ভবদেব=ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রীয় এবং সিদ্ধল-গ্রামীণ সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার সংকলিত পদ্ধতির নাম" ভবদেব পদ্ধতি"। বঙ্গদেশের সামবেদীয় ব্রাহ্মণেরা এই পদ্ধতির মতানুযায়ী দশবিধ সংস্কার কর্ম্ম করেন। ভট্ট ভবদেব, বঙ্গেশ্বর হরিবর্ম্মা দেবের মহামন্ত্রী ও সান্ধিবিগ্রহিক (Minister for peace and war) ছিলেন। পুরী জিলার ভুবনেশ্বর তীর্থের নৃসিংহ-বাসুদেবের মন্দির এবং বিন্দুসরোবর ইঁহারই কীর্ত্তি।

বধূ-বরের হস্তলেপ

একবিংশ অধ্যায়

হস্তলেপ, সম্প্রদানেরই অঙ্গবিশেষ। ঋগ্‌বেদীয় পদ্ধতির সম্প্রদান সামবেদীয় পদ্ধতির অনুরূপ। পশুপতির পদ্ধতির মতে কন্যাদান-

পঞ্চানন ও পশুপতির পদ্ধতিতে হস্তলেপ-কার্য্যের সময় ভেদ

স্বীকারের পর, বরকর্ত্তৃক কামস্তুতি [ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ। কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈত্তত্তে] পাঠ করিবেন। কিন্তু পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ইহার উল্লেখ নাই। পশুপতি সম্ভবতঃ সাম এবং ঋগ্‌বেদীয় পদ্ধতি হইতে উহা [অর্থাৎ কামস্তুতি] গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত রমানাথ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় বলেন—"পঞ্চাননের পদ্ধতি অনুযায়ী গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ব্রাহ্মণ এবং তদনুগত উচ্চ জাতির বিবাহে কন্যাদাতা কন্যাদান বা সম্প্রদানের প্রতিষ্ঠা-সিদ্ধির জন্য বরকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিলে পর [অর্থাৎ প্রকৃত সম্প্রদান-কার্য্যটী সমাপ্ত হইবার পর] বধূ-বরের হস্তলেপ দেওয়া হয়।" কিন্তু, পশুপতির পদ্ধতিতে হস্তলেপ এবং কুশগ্রন্থি বন্ধনকরা এবং সেই গ্রন্থি খুলিয়া দেওয়ার পর তবে কন্যাদানের সম্পূর্ণতা সাধনের-উদ্দেশ্যে বরকে [সুবর্ণাঙ্গুরী] দক্ষিণা দানের ব্যবস্থা আছে। পশুপতির ব্যবস্থা যে সমীচিনতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোয়ালপাড়া ও কোচবিহার

দশকর্ম্ম পদ্ধতিতে হস্তলেপ সম্বন্ধে উপদেশ

অঞ্চলে প্রচলিত পঞ্চাননের (১) সঙ্কলিত "দশকর্ম্ম পদ্ধতি"তে হস্তলেপ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা:—"ততো দাতা বধূবরয়োর্হস্তেলেপং

---

(১) ইঁহার পূর্ণ নাম পঞ্চানন কন্দলী। ইনি মহামহোপাধ্যায় মদন কন্দলীর পৌত্র। ইঁহার নিবাস স্থান ও পরিচয় এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি গোয়ালপাড়া অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন; যেহেতু কামরূপে পঞ্চাননের পদ্ধতির তেমন প্রভাব নাই।

দধ্না দত্তা বরহস্তোপরি বধূহস্তং স্থাপয়িত্বা গায়ত্র্যা কুশগ্রন্থিং বধ্নীয়াৎ অত্রাচারাদন্যদপি যৌতকত্বেন সুবর্ণরজততাম্রাদিকং কন্যাপিতা যথাসম্ভবং দদাতি অন্যেঽপি বান্ধবাদয়ো যথাসম্ভবং যৌতকং প্রযচ্ছন্তি। ততো গায়ত্র্যা লগ্নগ্রন্থিং বদ্ধা পুনর্গায়ত্র্যা কুশগ্রন্থিং মোচয়েৎ।" ইহার মর্ম্মার্থ—তাহার পর, দাতা দধির দ্বারা বধূ-বরের হস্তলেপ দিয়া বরের হাতের উপর কন্যার হস্ত রাখিয়া কুশ দিয়া গায়ত্রী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে গ্রন্থি বাঁধিবেন। এই সময়ে আচারবশতঃ কন্যাদাতা যথাশক্তি সোনা, রূপা এবং তামা প্রভৃতি যৌতক দেন এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরাও যথাসম্ভব যৌতক প্রদান করেন। তাহার পর গায়ত্রী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে লগ্নগ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়া আবার গায়ত্রী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কুশের গ্রন্থি খুলিয়া দিবে।

[পঞ্চানন তাঁহার দশকর্ম্ম পদ্ধতিতে কেবল দই দিয়া হস্তলেপ দিবার ব্যবস্থা দিলেও লোকব্যবহারে 'দই' এর সঙ্গে 'কলা' মাখিয়া লেপ দেওয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আরও, কন্যাদাতার পরিবর্ত্তে কোন অন্য ব্রাহ্মণের অথবা স্বজাতীয় ব্যক্তির দ্বারা গ্রন্থি-বন্ধনের লোকাচার দেখিতে পাওয়া যায়]।

ভট্ট ভবদেবের পদ্ধতিতে শুধু এই মাত্র আছে যে, পাদ্য, অর্ঘ এবং মধুপর্ক প্রভৃতির যোগে রীতিমত সংকৃত হইবার পর, [কন্যাদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে] বর স্বয়ং [মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণহস্তেন তাদৃশমেব কন্যায়া দক্ষিণহস্তং স্বহস্তোপরি নিদধ্যাৎ] নিজের মঙ্গল ওষধিলিপ্ত দক্ষিণ হস্তের উপর কন্যার সেইরূপ মঙ্গলৌষধিলিপ্ত দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবেন। [মঙ্গলৌষধিকে সর্ব্বৌষধিও বলে]। পশুপতির পদ্ধতিতে বধূ-বরের হস্তলেপের দ্রব্য [মঙ্গলৌষধি], যথা :—"সহদেবা (এক প্রকার উদ্ভিজ্জ

ভবদেবের পদ্ধতিতে হস্তলেপের দ্রব্য

ভেষজ)-ময়ূরশিখা (এক প্রকার উদ্ভিজ্জ ভেষজ)-বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা)

পশুপতির পদ্ধতিতে হস্তলেপের দ্রব্য

শতপুষ্পী (মৌরি)-মোহিনী (অজ্ঞাত) সর্জ্জরস-শিকৃথ (মোম)-কুঙ্কুম (জাফরান্)-চন্দন-গুঞ্জ (কুঁচ)-কর্পূর-মদনকোষ (ধুতরাফল)-মধুপুষ্প (মৌয়াফুল)-কাকোলীলতা, কস্তুরী (মৃগনাভি), জাতিফল, ঋদ্ধি-বৃদ্ধি-কাকোলী মেদ-মহামেদ-জীবকং-ঋষভং চ প্রত্যেকং মাষকপ্রমাণং ঘৃতপিষ্টং জামাতুর্দক্ষিণ হস্তোপরি দত্ত্বা তদুপরি কন্যাহস্তং স্থাপয়িত্বা ইত্যাদি—হস্তলেপের সমস্ত দ্রব্য একালে দুর্লভ হইয়াছে। "ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, মেদ, মহামেদ, জীবক এবং ঋষভ"—এই আটটী ভেষজদ্রব্য অত্যন্ত বলবুদ্ধিমেধাজনক—চরকোক্ত "জীবনীয়গণের" অন্তর্গত এবং আয়ুর্ব্বেদীয় অথবা তান্ত্রিক মতের যাবতীয় রসায়ন ঔষধের [চ্যবনপ্রাশ, কুমার-কল্পদ্রুম ঘৃত, ছাগলাদ্য ঘৃত, মহামাষ তৈলাদির] প্রধান উপাদান বলিয়া বর্ণিত হইলেও অধুনা অপ্রাপ্য বলিয়া সর্ব্বত্রই উহাদের "মধু অভাবে গুড়ের" মত অনুকল্প ব্যবস্থা চলিতেছে।

বর এইরূপ নিজের ডান হাতের উপর, কন্যার ডান হাতখানি রাখিলে এক পুত্রবতী এবং সৌভাগ্যশালিনী (well beloved by her

গ্রন্থি বন্ধন বা গাঁটছড়া বাঁধা

husband) নারী, মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ করিয়া [অর্থাৎ উলুধ্বনি করিয়া] কুশের দ্বারা তাঁহাদের হাত বাঁধিয়া দিবেন। সেই কুশের গ্রন্থি বাঁধার মন্ত্র :—

"ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ।
তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধাতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ॥"

অর্থাৎ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অশ্বিনীকুমার যুগল তোমাদের এই বিবাহ-বন্ধনের গ্রন্থিতে অবস্থান করুন এবং চিরকাল ধরিয়া এই গ্রন্থিকে অটুট অচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করুন।

তাহার পর কন্যাদাতা বর-কন্যার তিন পুরুষের নাম গোত্রাদি উচ্চারণ করিয়া রীতিমত কন্যা-সম্প্রদান, বর কর্ত্তৃক দানগ্রহণ স্বীকার, দানের দক্ষিণা [সুবর্ণ বা তাহার মূল্য] প্রদানাদি এবং যৌতকাদি দান সমাপ্ত হইলে পুনশ্চ পতিপুত্রবতী সুভগা নারী বর কন্যার-কাপড়ে গ্রন্থি [গাঁঠ ছড়া] বাঁধিয়া দিবেন। গ্রন্থিবন্ধনের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্রই ব্যবহৃত হয়। কোন ব্রাহ্মণ বা বর হরিতকী, পানিআমলা, মোনামোনী বহেড়া এবং সুপারি—এই পাঁচ রকম ফল একখানি হলুদে ছোপান গামোছায় পুঁটুলি বাঁধিয়া ঐ পুঁটুলির দুইটা প্রান্ত যথাক্রমে বর এবং কন্যার উত্তরীয়বস্ত্রের প্রান্তের সহিত বাঁধিয়া "গাঁইট ছড়া" বা গ্রন্থি বন্ধন করিয়া থাকেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ইহাকে লগন গাঁঠি বলে। ইহা হইতেছে ৬।৭ দীর্ঘ একখানি বস্ত্র বিশেষ। ইহার মধ্যভাগে একজোড়া পান সুপারি বাঁধিয়া একপ্রান্ত বরের এবং আর একপ্রান্ত কন্যার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। দরঙ্গের উতলা গ্রাম নিবাসী এবং রাজা বলীতনারায়ণের সভাপণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, কামরূপের শিলাগ্রাম নিবাসী ব্রহ্মানন্দ, পশুপতি এবং হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের পদ্ধতি অনুসারে লগ্নগ্রন্থি বা 'লগন গাঁঠি' বাঁধা হয়। সেখানে দেখা যায়, যে ব্যক্তি [সাধারণতঃ কন্যার ভ্রাতা, তদভাবে মন্ত্রদাতা] 'আখে তুলে' অর্থাৎ বর-কন্যার হস্তে খৈ দেয়, সেই ব্যক্তি লগন গাঁঠি বাঁধে। ইহা হইতেছে—একখানি "আনা কাটা" লম্বা গামছা। ইহাতে আতপ তণ্ডুল, দূর্ব্বা, তিল, হরিতকী, তাম্বূল, পান ইত্যাদি বাঁধা থাকে। লগন গাঁঠি সম্বন্ধে গঙ্গাজলে বিশেষ কিছু নাই। এই গাঁঠ ছড়া বাঁধার সময়ে খুব আড়ম্বর আছে।

কামরূপ অঞ্চলে লগন গাঁঠি

উক্ত নারী অথবা কন্যাদাতা গ্রন্থি বাঁধিবার সময় মন্ত্র পড়িবেন :—

"ওঁ যথেন্দ্রাণী মহেন্দ্রস্য স্বাহাচৈব বিভাবসোঃ।
রোহিনী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে।
যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠেচাপ্যরুন্ধতী ॥
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি ॥"

এই মন্ত্র পড়িবার পর সেই নারী এবং কোন এক ব্রাহ্মণের এইরূপ প্রশ্নোত্তর হইবে :—

নারী—কয়োর্গন্থিঃ পততি? (কাহাদের গাঁঠছড়া পড়িতেছ?)
ব্রাহ্মণ—লক্ষ্মীনারায়ণয়োঃ। (লক্ষ্মী-নারায়ণের)
নারী—কয়োগ্রন্থি পততি?
ব্রা—সীতারাময়োঃ। (সীতারামের)
নারী—কয়োগ্রন্থিঃ পততি?
ব্রা—নলদময়ন্ত্যোঃ। (নল-দময়ন্তীর)
নারী—কয়োগ্রন্থি পততি
ব্রাহ্মণ—শ্রী অমুক দেবশর্ম্ম শ্রী অমুকী দেব্যোঃ। [বর-কন্যার নাম করিয়া অমুক দেবশর্ম্মা এবং অমুক দেবীর]

ইহার পরে গায়ত্রী মন্ত্র পড়িয়া বাঁধিবে।

[প্রশ্ন—কে পড়িবে? নারী না ব্রাহ্মণ? নারী হইলে, কেমন করিয়া গায়ত্রী মন্ত্র পড়িবে?—লেখক]। যাহা হউক, এই স্থানে ভবদেবের পদ্ধতিতে "কোনও ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করত গ্রন্থি বাঁধিবে" আছে।

তাহার পর কন্যাদাতা কুশের বাঁধন খুলিয়া দিয়া একখানি কাপড় দিয়া কন্যা-জামাতাকে আচ্ছাদন করিয়া পরস্পর শুভদৃষ্টি করাইবেন। তাহার পর মধুপর্কের গোরু বেচারীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে সম্প্রদান-কার্য্য সমাপ্ত হয়।

কুশণ্ডিকা এবং লাজহোম

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কুশণ্ডিকা বা কুশকণ্ডিকা এবং পাণিগ্রহণ

কুশণ্ডিকা হোম [বৈদিক হোম বিশেষ] এবং পাণিগ্রহণাদি যে কয়েকটী অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবাহে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি কোনও দেশ বা প্রদেশের প্রথা নহে। সংস্কারাঙ্গ হোমকে [সংস্কারের অঙ্গ স্বরূপ হোমকে] কুশণ্ডিকা বা কুশকণ্ডিকা বলে। ইহা সংস্কারাঙ্গ হোমের সাধারণ নাম। জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক বৈদিক সংস্কারেই কুশণ্ডিকা হোম অবশ্য করণীয়। "কুশকণ্ডিকাই প্রকৃত বিবাহ"--এই চলতি কথাটী ঠিক নহে। পরন্তু কুশণ্ডিকা বিবাহের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বটে। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণসহ কৃত কুশণ্ডিকাদি সংস্কার কার্য্যে শূদ্রগণের আদৌ অধিকার নাই; সুতরাং তাঁহাদের বিবাহ, সম্প্রদান অথবা নিজ নিজ দেশ, জাতি অথবা কুলাচার পালনের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া যায়। আর্ষ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে প্রকৃত পক্ষে শূদ্রগণের ধর্ম্মসংস্কারাত্মক বিবাহ আদৌ নাই। তাঁহাদের যৌন মিলন শুধু প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে এবং দ্বিজগণের কার্য্যের অনুকরণে সেই মিলনকে বিবাহ বলা হইয়া থাকে। যাহা হউক, কুশণ্ডিকা হোমের মধ্যেই লাজহোমের অংশ বিশেষের পর পাণিগ্রহণ করিতে হয়। পাণিগ্রহণ বিবাহের প্রধান একটি অঙ্গ। বিবাহের রাত্রিতেই পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কুশণ্ডিকা এবং পাণিগ্রহণ আদি সমাপ্ত হইয়া যায়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বিবাহের রাত্রির পর দিনে বাসি বিবাহ ও কুশণ্ডিকা একত্র সম্পাদন করেন। বাসি বিবাহ কেবল স্ত্রী আচার মাত্র।

অন্বারব্ধ, আঘারাজ্যভাগ, মহাব্যাহৃতি, সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত, প্রাজাপত্য, স্বিষ্টকৃৎ, রাষ্ট্রভৃৎ, জয়া এবং অভ্যাতান ইত্যাদি হোমের পর লাজহোম হয়। লাজ [স্ত্রীলিঙ্গে 'লাজা'] শব্দের অর্থ—ভাজা ধান, যব, গম—ইত্যাদি [আমাদের খৈ]। "লাজঃ হোম কর্ম্মণি হুয়ন্তে" অর্থাৎ—ধান প্রভৃতি শস্যের দ্বারা খৈ করিয়া হোম করা হয় বলিয়া এই ক্রিয়াটীকে "লাজ হোম প্রয়োগ" বলা হয়। "লাজ হোম" বা খই পোড়ান পৃথক্ অনুষ্ঠান। উহা কেবল মাত্র বিবাহ-সংস্কারে কন্যার দ্বারা অনুষ্ঠিত হোম। নিম্নে "লাজহোম" অনুষ্ঠানের বিধি পারস্কর গৃহ্যসূত্র হইতে উদ্ধৃত করা হইল, যথা :—

যজুর্ব্বেদীয় লাজ হোম ও তাহার বিধি

কুমার্য্যা ভ্রাতা শমীপলাশমিশ্রাল্লাঁজানঞ্জলিনাঞ্জলাবাবপতি। ১

তাং জুহোতি স ৺ হতেন তিষ্ঠতী "অর্য্যমণং দেবং কন্যাঽগ্নিমযক্ষত।

সনো অর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতে স্বাহা।

ইয়ন্নার্য্যুপাব্রূতে লাজানাবপন্তিকা।

আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা।

ইমাংল্লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব।

মমতুভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়৺ স্বাহা"* ইতি॥ ২

—পারস্কর গৃহ্যসূত্র ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা

ইহার অর্থ হইতেছে—"কুমারীর ভ্রাতা পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত শমী-বৃক্ষের পাতা এবং খই একত্র মিশাইয়া একখানি কুলায় রাখিয়া তাহা হইতে কিছু নিজের অঞ্জলিতে লইয়া কুমারীর অঞ্জলীতে ঢালিয়া দিবেন। পূর্ব্বমুখে থাকিয়া কুমারী সেই শমীপত্র মিশান খই নিজের

* স্বাহা=অগ্নিদেবের স্ত্রীর নাম স্বাহা। স্বাহা অগ্নির শক্তি। দেবযজ্ঞে যেমন স্বাহা, পিতৃযজ্ঞের মন্ত্র সেইরূপ স্বধা। 'সাহা' দেবপোষিণী এবং 'স্বধা' পিতৃপোষিণী। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এই স্বাহা ও স্বধা মন্ত্রের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ডান ও বাম হাত একত্র করিয়া অঞ্জলী ভরিয়া লইবেন এবং অগ্নিতে হোম করিবেন।"

পঞ্চানন-কৃত দশকর্ম্ম পদ্ধতিতে লাজহোম-বিধির উল্লেখ, যথা :—ততঃ কুমার্য্যা ভ্রাতা শমীপত্রাজ্যমিশ্রান্ শূর্পস্থান্ লাজান্ স্রুবমূলেন চতুর্ধা বিভাজ্য ভাগত্রয়ং পুনস্ত্রিধা বিভাজ্য অঞ্জলিনা ভাগৈকমাদায় বরাঞ্জলিপুটোপরিস্থিতকন্যাঞ্জলৌ দদাতি। ততস্তান্ লাজান্ প্রাঙ্মুখী কুমারী উর্ধ্বস্থিতৈবাঞ্জলিনা জুহোতি। বারত্রয়মিমান্ মন্ত্রান্ পঠতীতি —পশুপতি পদ্ধতৌ, কন্যৈব পঠতীতি হরিহর পদ্ধতৌ।" এই লাজ-হোম বিধি উপরি প্রদত্ত পারস্করের পদ্ধতি, পারস্করাচার্য্যের ভাষ্যকার হরিহর-পদ্ধতি এবং তদনুবর্ত্তী পশুপতির পদ্ধতির নকল মাত্র। ইহার অর্থ হইতেছে—"অনন্তর কুমারীর ভ্রাতা শমীপত্র এবং ঘৃত মিশ্রিত খই কুলায় রাখিয়া 'স্রুব কাষ্ঠের' [হোম করিবার ঘি ঢালিবার কাঠের চামচের] গোড়া দিয়া কুলার উপরই চারি ভাগ করিয়া রাখিবে; উহার তিন ভাগকে পুনরায় (এক এক ভাগকে) তিন ভাগ করিবে এবং উহার এক ভাগ নিজের অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া—[বর-কন্যা দাঁড়াইবার সময়ে বরের সম্মুখে কন্যা দাঁড়াইবে এবং বরের দুইহাত কন্যার কোমর ঘিরিয়া কন্যার সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ থাকিবে এবং কন্যার দুই হাতের অঞ্জলি বরের অঞ্জলির ঠিক উপরে থাকিবে]—বরের অঞ্জলির উপরিস্থ কন্যার অঞ্জলিতে ঢালিয়া দিবে। তাহার পর পূর্ব্বাভিমুখী কন্যা দাঁড়াইয়া অঞ্জলি হইতে [অঞ্জলি অধোমুখ না করিয়া] সেই খই আগুনে হোম করিবে এবং তিনবার নিম্নলিখিত মন্ত্র ["অর্য্যমণং দেবং ইত্যাদি" যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে] পড়িবে। পশুপতি পদ্ধতির মতে বর এই মন্ত্রগুলি পড়িবেন, কিন্তু হরিহর পদ্ধতিতে (১) এই মন্ত্র কন্যাই পড়িবে এরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে।"

---

(১) মূল গৃহ্যসূত্রেই সেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত অম্বারব্ধ, আঘারাজ্যভাগ ইত্যাদি হোম-কার্য্যের পর কুমারী [যাহার বিবাহ হইতেছে, তিনি] নিজে নিম্নোদ্ধৃত প্রথম মন্ত্রটী পড়িয়া অঞ্জলির খইয়ের এক তৃতীয়াংশ ঢালিয়া দিবেন ; দ্বিতীয় মন্ত্রটী পড়িয়া অঞ্জলিতে অবশিষ্ট খইয়ের অধিকাংশ আগুনে ঢালিয়া দিবেন এবং তৃতীয় মন্ত্রটী পাঠের সহিত অঞ্জলিতে অবশিষ্ট সমস্ত খই আগুনে ফেলিয়া দিবেন।

১। ওঁ অর্য্যমণং দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত।
স নো অর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা॥
ইদমর্য্যম্নে, ইদং ন মম।

মন্ত্র ব্যাখ্যা="এই কন্যা অগ্নিস্বরূপ অর্য্যমা দেবকে অর্চ্চনা করিলেন। এই অর্য্যমা দেব আমাকে (এই কন্যাকে) যেমন আজি পিতৃকুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন ; [আমি প্রার্থনা করিতেছি যে] তিনি যেন আমাকে [এই কন্যাকে] পতিকুল হইতে কখনও বিচ্যুত না করেন। এই ঘৃত অর্য্যমাকে দিতেছি, ইহা আমার জন্য উদ্দিষ্ট নহে।

২। ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা।
আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেদ্ধতাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা।
ইদমগ্নয়ে ইদং ন মম।

মন্ত্র-ব্যাখ্যা=আমি [এই কন্যা] প্রজ্বলিত অগ্নিতে এই যে লাজ নিঃক্ষেপ করিতেছি—ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আমার পতি আয়ুষ্মান্ হউন এবং আমার জ্ঞাতিকুল সুসসমৃদ্ধ হউন। এই লাজা অগ্নির উদ্দেশ্যে দিতেছি—আমার উদ্দেশ্যে নহে।

৩। ওঁ ইমাল্লাঁজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব।
মম তুভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ঁ স্বাহা॥
ইদমগ্নয়ে, ইদং ন মম।

মন্ত্র-ব্যাখ্যা=হে স্বামিন্, আপনার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই লাজাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছি; আপনার এবং আমার উভয়ের মধ্যে যে প্রেম আছে, অগ্নিদেব তাহার অনুমোদন করুন।

[এইস্থানে দেখা যাইতেছে—বৈদিক সংস্কারে মেয়েদেরও বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়]

ইহার পর, বর পশ্চিমমুখ হইয়া পূর্ব্বমুখী কন্যার অঙ্গুষ্টসহ দক্ষিণহস্ত স্বকীয় দক্ষিণহস্তে ধরিবেন। ইহাকে পাণিগ্রহণ বলে। তৎকালে বর নিম্নোদ্ধৃত পাণিগ্রহণের ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্র (২) পড়িবেন:—

ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং
ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সঃ।
ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধি-
র্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥ ৩৬

—১০ম মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত

ওম্ অমোহমস্মি সা ত্ব৺ সাত্বমস্যমো অহম্।
সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং
তাবেহি বিবহাবহৈসহ রেতো দধাবহৈ প্রজাং
প্রজনয়াবহৈ পুত্রান বিন্দাবহৈ বহূন্ তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ।
সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সুমনস্যমানৌ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ
শত৺ শৃণুয়াম শরদঃ শতমিতি। ৩

—পারস্কর গৃহ্যসূত্র, ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা

মন্ত্র-ব্যাখ্যা=[বর বলিতেছেন] "হে নারি, আমাদের উভয়ের সৌভাগ্যের উদ্দেশ্যে আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি [এবং প্রার্থনা করিতেছি যে] তুমি আমার সহিত অন্তিম বয়স পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সৌভাগ্য ভোগ কর। আর তুমি আমার গৃহের স্বামিনী হইবে।

(২) সামবেদীয় পদ্ধতিতে এই মন্ত্রের অতিরিক্ত আরও কয়েকটী মন্ত্র আছে।

এইজন্য ভগ, অর্য্যমা, সবিতা এবং পুষা দেব তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করিলেন।

হে বধূ, আমি যেমন প্রাণস্বরূপ, তুমি বাণীস্বরূপ; আমি সামবেদ স্বরূপ, তুমি ঋগ্‌বেদ স্বরূপ; আমি দ্যৌঃ (স্বর্গ) স্বরূপ; তুমি পৃথিবী স্বরূপ; এস আমরা উভয়ে উভয়কে বিবাহ করি, উভয়ে উভয়ের রেত ধারণ করি, উভয়ে মিলিয়া সন্তান উৎপাদন করি, বহুসংখ্যক পুত্র প্রাপ্ত হই, এবং তাহারা দীর্ঘায়ু হউক। আমরা উভয়ের প্রীতিকর, রুচিকর এবং মনোঽভিমত হইয়া শত শরৎঋতু যেন দেখিতে পাই; শত শরৎঋতু ব্যাপিয়া যেন বাঁচিয়া থাকি এবং শরৎঋতুর বর্ণনা যেন শুনিতে পাই, অর্থাৎ—আমরা উভয়ে যেন দীর্ঘজীবী হই।

[স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় স্বকীয় উদ্বাহতত্ত্বে মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাণিগ্রহণ সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝাইয়াছেন, যথা ঃ—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দার লক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥ ২২৭

মনুক্ত "পাণিগ্রহণিকা" ইত্যাদি শ্লোকের রঘুনন্দন-কৃত অর্থ ষোল আনা ঠিক নহে। কেন না,—রঘুনন্দন বলিতেছেন, "সপ্তপদী গমনের চরম বা সপ্তম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-সংস্কারটী সিদ্ধ হইয়া যায়।" পরে আমরা "বিবাহ সংস্কারের সিদ্ধতা" প্রসঙ্গে তাঁহার এই উক্তির আলোচনা করিব। পুনর্ভু বিচার প্রসঙ্গে স্মার্ত্ত স্বকীয় "উদ্বাহ তত্ত্ব" নামক নিবন্ধে কশ্যপ ঋষির যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে "পাণিগৃহীতিকার" উল্লেখ আছে। কন্যাদান এবং তৎপরে কুশণ্ডিকা বা বৈবাহিক হোমকার্য্যের পর "ওঁ গৃভ্‌ণামি" ইত্যাদি মন্ত্রে বর, কন্যার যে পাণিগ্রহণ করেন ততদূর অগ্রসর হইলে তবে সেই কন্যাকে পাণিগৃহীতিকা বলে। তখনও সে কন্যাই (Maid) থাকে। উপসংবেশন হইলে তবে কন্যাভাব গত হয়]।

যাহা হউক, পাণিগ্রহণের পর অশ্মারোহণ অর্থাৎ—বর, কন্যার ডান পা খানি নিজের হাতে লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে রক্ষিত শিলাপট্টের

(পাথরের) উপর আরোহণ করাইবেন এবং সেই সময় নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী পাঠ করিবেন :—

৫। "ওঁ আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্ব৺ স্থিরা ভব।
অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতো ববাধস্ব পৃতনায়ত" ইতি॥

—পারস্কর গৃহ্যসূত্র, ১ম কাণ্ড, ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা

মন্ত্র ব্যাখ্যা—হে পত্নি, এই প্রস্তরের উপর উঠ [এবং আমাদের কুলে] তুমি প্রস্তরের মত স্থির হইয়া থাক [অর্থাৎ—কুলটা হইও না] ; অনিষ্টকামী শত্রুগণের বক্ষের উপর চড়িয়া দাঁড়াও, তোমার পায়ের নীচে তাহাদিগকে পেষণ ও মর্দ্দন করিতে থাক।

তাহার পর কন্যা শিলার উপর আরোহণ করিলে বর [পত্নীর প্রশংসাসূচক] নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক [এবং পৌরাণিকীও] গাথা গান করেন :—

৬। ওঁ সরস্বতি প্রেদমব সুভগে বাজিনীবতি।
যাং ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রগায়ামস্যগ্রতঃ॥
যস্যাং৺ ভূতং সমভবদ্ যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ।
তামদ্য গাথাং গাস্যামি যা স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ।

ব্যাখ্যা—হে সরস্বতি, হে সৌভাগ্যশালিনি, হে অন্নপূর্ণে, লোকে তোমাকে জগতের আদিম জননী বলিয়া থাকেন ; তোমারই ভিতর জগতের যাবতীয় ভূতগণ সূক্ষ্মভাবে অন্তর্নিহিত ছিল ; অদ্য নারীগণের উত্তম যশঃ পরিপূর্ণ গাথা তোমার স্তুতির জন্য গান করিতেছি ; তুমি আমাদের উভয়ের মঙ্গল কর, আমাদিগকে রক্ষা কর।

উপরি ধৃত (৬ নং) মন্ত্রে যে গাথার উল্লেখ আছে, তাহা ব্যতীত বরকে আরও যে সকল গাথা গায়িতে হয়, সেগুলি এই :—

"রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসীন্যোচনী।
সূর্য্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতম্॥ ৬

চিত্তিরা উপবর্হনং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্ যদয়াৎ সূর্য্যা পতিম্ ॥ ৭
সোমোবধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভাবরা।
সূর্য্যাং যৎপত্যৈশংসন্তীং সবিতা মনসা দদাৎ ॥ ৯
মনো অস্যা অন আসীদ্ দ্যৌরাসীদুতচ্ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎ সূর্য্যা গৃহম্ ॥ ১০
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্য্যারোহৎ প্রযতী পতিম্ ॥ ১২

—ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত

মর্ম্মানুবাদ—[সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যা সাবিত্রী নিজের বিবাহের স্তুতি করিতেছেন]। রৈভী (ঋঙ্মন্ত্র) গুলি সূর্য্যার (বধূর) সঙ্গিনী (সখী) এবং নারাশংসী (মনুষ্যের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনাত্মক মন্ত্র) গুলি সেই সূর্য্যার (বধূর) দাসী ছিলেন এবং গাথা (ইতিহাসমূলক মন্ত্র) গুলির দ্বারা পরিস্কৃতা সূর্য্যার সুন্দর বস্ত্র ছিল। ৬। বিচার সূর্য্যার বালিশ, বৃষ্টি তাঁহার চক্ষুর অঞ্জন, স্বর্গ এবং পৃথিবী তাঁহার ধনভাণ্ডার ছিল; যে সময়ে সূর্য্যা তাঁহার পতির গৃহে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই গুলি উপকরণ ছিল। ৭। চন্দ্রদেব বর ছিলেন, অশ্বিযুগল বরের সঙ্গী (বরযাত্রী) ছিলেন। ৮। সূর্য্যা যে সময়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন, মন, রথ দ্যোঃ রথের আচ্ছাদন, সূর্য্য এবং চন্দ্র দুই বলীবর্দ্দ হইয়াছিলেন। ৯। দুই কর্ণ সেই রথের চক্র, ব্যান বায়ু ধুর হইয়াছিল; এই মনোময় রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যাদেবী শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন॥ ১২। —[সায়ণ ভাষ্য সঙ্গত মর্ম্মানুবাদ]।

বৈদিকী গাথা গান করিবার আরও কতকগুলি লৌকিকী বা পৌরাণিকী গাথা গান করারও প্রথা আছে, সে গুলি এই :—

"রাঘবেন্দ্রে যথা সীতা বিনতা কশ্যপে যথা।
পাবকে চ যথা স্বাহা তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥১

অনিরুদ্ধে যথৈবোষা দময়ন্তী নলে যথা।
অরুন্ধতী বশিষ্ঠে চ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ২
সুদক্ষিণা দিলীপে তু বসুদেবে চ দেবকী।
লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যে তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৩
শান্তনৌ চ যথা গঙ্গা সুভদ্রা চ যথার্জ্জুনে।
ধৃতরাষ্ট্রে চ গান্ধারী তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৪
গৌতমে চ যথাহল্যা দ্রৌপদী পাণ্ডবেষু চ।
যথা বালিনি তারা চ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৫
মন্দোদরী রাবণে চ রামে যদ্বত্ত্ জানকী।
পাণ্ডুরাজে যথা কুন্তী তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৬
অত্রৌ যথানসূয়াচ জমদগ্নৌ চ রেণুকা।
শ্রীকৃষ্ণে রুক্মিণী যদ্বৎ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৭
সংবরে তপনী যদ্বদ্ দুষ্মন্তে চ শকুন্তলা।
মেরুদেবী যথা নাভৌ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৮
রেবতী বলভদ্রে চ সাম্বে চ লক্ষ্মণা যথা।
রুক্মিসুতা কৃষ্ণপুত্রে (প্রদ্যুম্নে চ) তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৯
জানকী চ যথা রামে উর্ম্মিলা লক্ষ্মণে যথা।
কুশে কুমুদ্বতী যদ্বৎ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ১০”

[এই গাথাটীতে “অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী, তারা মন্দোদরী তথা” এই প্রসিদ্ধ পঞ্চ কন্যার অতিরিক্ত আরও সীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ তেজস্বিনী এবং আদর্শস্বরূপা এবং আর্য্য নারীর উল্লেখ আছে]।

তৎপরে বর, বধূর সহিত তিনবার অগ্নিকে [অগ্নিকে ডানদিকে রাখিয়া] প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী পাঠ করিবেন :—

“ওঁ তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহন্ সূর্য্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮

—ঋগ্‌বেদ, ৮৫ সূক্ত।

সায়ণভাষ্যসম্মত মর্ম্মার্থ—"হে অগ্নিদেব, জগতের আদি যুগে সূর্য্য-কন্যা সূর্য্যার (৩) পতি চন্দ্রদেব তোমার প্রভাবে সূর্য্যাকে সন্তানোৎপাদনের জন্য নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন; আজ তুমি সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্যে পত্নীকে পতির [আমার] হস্তে দান কর।"

বর এই প্রার্থনা মন্ত্র পড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতীয় বার লাজহোম এবং তৎপরে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ এবং বধূ সহ তিন বার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিবেন। বধূ-বর প্রত্যেক বার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করার সময় কন্যার ভ্রাতা অঞ্জলি ভরিয়া ভগিনীর অঞ্জলিতে খই দিবেন এবং ভগিনী তাহা আগুনে ফেলিয়া দিবেন। [চতুর্থং শূর্পকুষ্টয়া সর্ব্বাংল্লাজানাবপতি ভগায় স্বাহেতি। ৫। ত্রিঃ পরিণীতা প্রাজাপত্যং হুত্বা] (৪) দ্বিতীয় বারের পর লাজহোমের প্রায় শেষ হইয়া যায়। তৃতীয় বার প্রদক্ষিণের পর, কন্যার ভ্রাতা কুলার কোণ দিয়া [কুলাস্থিত] অবশিষ্ট সমস্ত খই ভগিনীর অঞ্জলিতে ঢালিয়া দিবেন এবং ভগিনী

"ওঁ ভগায় স্বাহা—ইদং ভগায়, ইদং ন মম।"

[অর্থাৎ—"ভগদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া এই লাজহোম অর্পণ করিতেছি, ইহা আমার উদ্দেশ্যে অর্পিত হইতেছে না]।

এই মন্ত্র পড়িয়া সমুদয় খই একবারে আগুনে ঢালিয়া দিবেন; এবং তৎপরে, বধূ-বর মৌনী হইয়া চতুর্থ বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলে পুরোহিত মহাশয় ঘৃত দ্বারা "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে" বলিয়া প্রাজাপত্য হোম করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে" বলিয়া লাজহোম শেষ করিবেন।

---

(৩) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে চন্দ্রদেবের সহিত সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যা-দেবীর বিবাহের বর্ণনা আছে। এই সূক্তের কতকগুলি মন্ত্র বর্ত্তমান যুগের দ্বিজগণের বিবাহে পূর্ব্বাপর পঠিত হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে। ঋগ্বেদীয় পদ্ধতিকার কালেশি ভট্টাচার্য্য সম্পূর্ণ সূক্তটী (৪৭টী ঋঙ্ মন্ত্র) নিজ পদ্ধতিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৪) পারস্কর গৃহ্যসূত্রের প্রথম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

সপ্তপদী গমন

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পূর্ব্বকথিত বৈবাহিক কার্য্যগুলির পর 'সপ্তপদী গমন' [অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত একত্রে হাত ধরাধরি করিয়া সাত পা যাওয়া] নামক অনুষ্ঠান করিতে হয়। অন্তিম বার পদক্ষেপ করিবার সময় বর, বধূকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"ওঁ সখে সপ্তপদা ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূঁস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ।" ভাবার্থ—"হে সখি, এইবার তুমি সপ্তম পদে পদক্ষেপ কর, আমার ধর্ম্মের অনুসরণ কর, ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে আমার সহিত একত্র ধর্ম্মপথে চালনা করুন, যেন আমরা দুইজনে বহুসংখ্যক দীর্ঘজীবী পুত্রলাভ করি।" সাতবার পদক্ষেপের সময় ঋগ্‌বেদীয় দ্বিজগণের পড়িবার [কালেশি-পদ্ধতি দ্রষ্টব্য] মন্ত্র, যথাঃ—(১) "ওঁ ইষ এক পদী ভব......। (২) ওঁ উর্জে দ্বিপদী ভব......। (৩) ওঁ রায়স্পোষায় * ত্রিপদী ভব......। (৪) ওঁ মায়োভবায় চতুষ্পদী ভব......। (৫) ওঁ প্রজাভ্যঃ † পঞ্চপদী ভব...। (৬) ওঁ ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদী ভব......। (৭) ওঁ সখে সপ্তপদী ভব......।" প্রত্যেক মন্ত্রে "ভব" শব্দের পরে "স মামনুব্রতা....

পড়িতে হয়।

[ভবদেবের টীকাকার গুণবিষ্ণুর মতে—"১। ইষে=অর্থলাভের উদ্দেশ্যে; ২। উর্জে=বললাভের উদ্দেশ্যে; ৩। ব্রতায়=যজ্ঞকর্ম্মের উদ্দেশ্যে; ৪। মায়োভবায়=সৌখ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে; ৫। পশুভ্যঃ=পশুলাভের উদ্দেশ্যে; রায়স্পোষায়=ধনপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে"—লিখিত আছে]।

---

* রায়স্পোষায়=তৃতীয় পদ গমনে ঋগ্‌বেদীয় এবং যজুর্ব্বেদীয় রায়স্পোষায় [ধনপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে] স্থলে সামবেদীয় 'ব্রতায়' [যজ্ঞকর্ম্মের উদ্দেশ্যে] আছে।

† প্রজাভ্যঃ=ঋগ্‌বেদীয় "প্রজাভ্যঃ" [পুত্র-কন্যালাভের উদ্দেশ্যে] স্থলে সাম এবং যজুর্ব্বেদীয় "পশুভ্যঃ" [পশুলাভের উদ্দেশ্যে] আছে।

গোয়ালপাড়া, কামরূপ আদি আসাম অঞ্চলের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ যজুর্ব্বেদী। এই পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় পশুপতি-পদ্ধতি হইতে যজুর্ব্বেদীয় সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

সামবেদীয় সপ্তপদী গমনের ব্যবস্থা

সামবেদীয় দ্বিজগণের সপ্তপদী গমনের নিয়ম [ভবদেব পদ্ধতি দ্রষ্টব্য] যথা :—"ততো জামাতা প্রাগুদীচ্যাং দিশি বধূং সপ্তভি মন্ত্রৈঃ সপ্তসু মণ্ডলিকাসু সপ্তপদানি নয়েৎ। বধূশ্চ মণ্ডলিকায়াং দক্ষিণপাদং নীত্বাপশ্চাদ্‌বামপদং নয়েৎ। জামাতা চ বধূমিদং ব্রূয়াৎ। "বামপাদেন দক্ষিণং পাদমাক্রমেতি। সপ্তানাং মন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ"।

ইহার বঙ্গার্থ=তাহার পর, জামাতা হোমাগ্নির ঈশান কোণের দিকে আলপনা দেওয়া সাতটী মণ্ডলের উপর দিয়া [আলপনার মণ্ডলগুলি আগেই দেওয়া থাকে] বধূকে লইয়া এক একটী মন্ত্রপাঠের সহিত ক্রমশঃ সাতটী মণ্ডল অতিক্রম করিবেন। বধূ প্রত্যেক মণ্ডলের উপর প্রথমে নিজের ডান পা লইয়া পরে বাম পা লইবেন। জামাতা বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দিবেন, "তুমি আগে ডান পা বাড়াইয়া দাও, পরে বাম পা ডান পায়ের কাছে লইয়া যাও।" এই সাতটী মন্ত্রের ঋষিবিনিয়োগাদি একই প্রকার।

[সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলি প্রায় একপ্রকার,—প্রভেদ যাহা আছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর]

যমবচনে বলা হইয়াছে—"জলস্পর্শ করিয়া কন্যাকে দান করিলে, অথবা বাক্য দ্বারা দান করিলেই, যে গ্রহীতা ঐ কন্যার পতি হইলেন, তাহা নহে ; পাণিগ্রহণসংস্কারপূর্ব্বক সপ্তমপদ পর্য্যন্ত গমন করিলে তবে গ্রহীতা সম্পূর্ণভাবে ঐ কন্যার পতিত্ব প্রাপ্ত হয়েন"। লঘুহারীত বলিয়াছেন,—"বিবাহের পর সপ্তপদ গমন করিলেই কন্যা নিজ গোত্র অর্থাৎ পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয় ; সুতরাং সপ্তপদী গমনের পর তাহার মৃত্যু হইলে পতি গোত্রের উল্লেখ করিয়া তাহার পিণ্ডদানাদি ক্রিয়া (শ্রাদ্ধকার্য্য) করিতে হয়।" সপ্তপদী গমন দ্বারা কন্যার ভার্য্যাত্বের

পরিসমাপ্তি ঘটে কিনা, আমরা তাহা পাণিগ্রহণ প্রসঙ্গে বলিব। যাহা হউক, আমাদের দেশের প্রাচীন প্রবাদ এই,—"দুইজন ভদ্রঘরের নর অথবা নারী একত্রে সাত পা পর্য্যন্ত চলিলেই তাঁহাদের মধ্যে সখ্যতা সম্বন্ধ ঘটে। এই সাত পা একসঙ্গে চলিবার জন্য উৎপন্ন 'সখিত্বের' উপর নির্ভর করিয়া সাবিত্রী দেবী ঘোর বনে এবং গভীর রাত্রিকালে যমরাজের সহিত বহু শিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে তাঁহার প্রিয়তমের প্রাণ ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মিত্রাভিষেক

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গোয়ালপাড়া অঞ্চলের হিন্দু সমাজে, সপ্তপদী গমনের পর, জনৈক ব্যক্তিকে বরের 'মিতর' বা মিত্ররূপে বিবাহ-স্থানে উপস্থিত থাকিতে হয়। সম্প্রতি সেখানকার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথাটীর সমধিক প্রচলন দেখা না গেলেও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে এবং কোচ-বিহারে ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিশেষভাবে ইহার প্রচলন আছে। পঞ্চানন তাঁহার দশকর্ম্ম পদ্ধতিতে—[এমন কি 'আচার' বলিয়াও]—এই প্রথাটীর উল্লেখ না করিলেও, ইহা যে প্রকৃত বৈদিক সময়ের একটী পুরাতন প্রথা, তাহাতে কোন সংশয় নাই। বিবাহের মিত্রদ্বয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হইলে অন্যে তিন রাত্রি মৃতাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। গোয়াল-পাড়া অঞ্চলে মিত্রপুত্র এবং মিত্রকন্যার মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না। গৌহাটীর অন্তর্গত শুক্লেশ্বর নিবাসী শ্রীযুত রামদেব শর্ম্মা মহোদয় বলেন—"কামরূপ অঞ্চলের বহু স্থানে শূদ্র বা নিম্নবর্ণের লোকের বিবাহে এখনও মিত্রপ্রথা আচার হিসাবে চলিতেছে।"

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে মিত্রপ্রথার উল্লেখ

মিত্র বা মিতর ধরার প্রথাটী যে অতি প্রাচীন, তাহার প্রমাণ মহর্ষি পারস্করাচার্য্যের গৃহ্যসূত্রে প্রথম কাণ্ডের অষ্টম কণ্ডিকায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; যথা—"নিষ্ক্রমণপ্রভৃত্যুদকুম্ভং স্কন্ধে কৃত্বা দক্ষিণতোঽগ্নের্বাগ্‌যতঃ স্থিতো ভবতি।৩। উত্তরত একেষাম্‌।৪। তত এনাং মূর্দ্ধন্যভিষিঞ্চতি। 'আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজমিতি।৫।

আপো হি ষ্ঠেতি চ তিসৃভিঃ ।৬।" এই সূত্রগুলির মর্ম্মার্থ-কন্যার পিতা [অথবা কন্যাদাতা] কন্যাকে সম্প্রদান করার পর, বর যে সময়ে বধূর হস্ত ধারণ করিয়া বাহির হইয়া হোমাগ্নির নিকট আসেন, সেই সময় হইতে, কোন এক পুরুষ এক কলস জল কাঁধে লইয়া বর-কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া হোমাগ্নির দক্ষিণদিকে [মতান্তরে উত্তর দিকে] চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং পরে "আপঃ শিবাঃ"— ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ কলসের জল কন্যার মাথায় অভিসেচন করিবে, অর্থাৎ ছিটা দিবে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে দেখা যায়—

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত মিত্রাচার

অভিষেকের কিছু পূর্ব্বে মিত্র স্কন্ধে জল লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। তখন বর তাঁহাকে জিজ্ঞসা করেন—"ভো মিত্র, কিমানীতম্?" তদুত্তরে তিনি বলেন—"তব বিবাহার্থং উত্তমং গঙ্গাজলং [তীর্থজলং বা] আনীতম্।" তখন একব্যক্তি মিত্রের স্কন্ধ হইতে ঐ জল নামাইয়া বরের নিকটে স্থাপন করেন, এবং বর তদ্দ্বারা "আপঃ শিবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যাকে অভিষেক করেন। "আপঃ শিবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের পর "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিনটী মন্ত্রও পড়িতে হয়। ভাষ্যকার হরিহর বলিয়াছেন—"দেশাচার মতে বর আম্রপল্লবাদির দ্বারা ঐ জল কন্যার মাথায় ছিটাইয়া দিবেন।"

পদ্ধতিকার পশুপতিও এই আচারের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি লিখিতেছেন—"ততো বধূবরয়োর্নিক্রমণাদারভ্যাভিষেকং যাবৎ চন্দন-চর্চ্চিতং চূতপল্লবাস্যমুদকুম্ভং কশ্চিৎ স্কন্ধে কৃত্বা বাগ্‌যতস্তিষ্ঠেৎ" অর্থাৎ,— "তাহার পর [বর-কন্যার বস্ত্রের গ্রন্থিবন্ধন সমাপ্ত হইবার পর]; কন্যাদানের স্থান হইতে বর-কন্যার বাহির হইয়া হোম-স্থানে যাইবার সময় হইতে [বিবাহের আবশ্যক কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া গেলে] অভিষেকের সময় পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি [অর্থাৎ যাহাকে মিত্র

বা 'মিতর' ধরা হয়] চন্দনচর্চ্চিত [চন্দন মাখান] আম্রপল্লব মুখে ঢাকা দেওয়া জলপূর্ণ একটী কলস কাঁধে লইয়া মৌনভাবে থাকিবে।"

[পারস্করের মতে মিত্র স্বয়ং (তাঁহার স্কন্ধস্থিত) জল লইয়া বধূর অভিষেক করিবার কথা, কিন্তু পশুপতি তাঁহার দেশাচারমতে বরকে দিয়া বধূর অভিষেক করাইয়াছেন।

তাহার পর, [ব্রহ্মার বরণাদির পর] বৈবাহিক হোম [আঘার আজ্যভাগ, মহাব্যাহৃতি, সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত, প্রাজাপত্য, রাষ্ট্রভৃৎ (১), জয়া, অভ্যাতান এবং লাজহোম] ও সমন্ত্রপাঠ পাণিগ্রহণ সংস্কার সম্পাদন; শিলারোহণ এবং সপ্তপদীগমনাদি অনুষ্ঠানের পর "ততঃ স্কন্ধস্থিত কলসজলেন বধূমভিষিঞ্চতি বরঃ" অর্থাৎ—"তাহার পর সেই [মিত্রের] স্কন্ধস্থিত কলসের জল দিয়া বর বধূকে অভিষেক করিবেন।"

উল্লিখিত অংশ হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে, পদ্ধতিকার পশুপতি পারস্কর গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছেন,—মূল গৃহ্যসূত্রের [১ম কাণ্ডের ৮ম কণ্ডিকার ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ সূত্র] অনুকরণ করেন নাই। এই বিভিন্নতার কারণ দেশাচার বলিয়াই বোধ হয়। কামরূপ রাজ্যে [গোয়ালপাড়া, কোচবিহার এবং রঙ্গপুর প্রভৃতি বঙ্গের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত জেলাগুলিতে] গৃহ্যসূত্রের প্রাচীন প্রথাকেই অনুসরণ করিয়া 'মিতর' বা মিত্রের দ্বারাই [বেদমন্ত্র চারিটী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে] বধূর মস্তকে অভিষেক করানর প্রথা আছে। তবে আধুনিক সময়ে পুরোহিতই সমুদয় মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সেই বৈদিক মন্ত্র চারিটী এই, যথা :—

১। ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাস্তাস্তে কৃণ্বন্তু

---

(১) রাষ্ট্রভৃৎ=ইহা "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে" ও (পৃঃ ২৩১) দেখা যায়। গোয়ালপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা উহার স্থানে যে "রাষ্ট্রকৃৎ" পাঠ করেন, সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ সেই অভ্যাস জন্মিয়াছে।

ভেষজম্ ॥ [পারস্কর গৃহ্যের উল্লিখিত ৫ম সূত্র ; কোন্ বেদ সংহিতা বা ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত, তাহা জানিতে পারা যায় নাই]।

২। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহেরণায় চক্ষসে ॥ ১০।৯।১ ঋগ্‌বেদ ; ১১।৫০ যজুর্ব্বেদ, শুক্ল।

৩। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ১০।৯।২ ঋগ্‌বেদ ; ১০।৫১। ঐ।

৪। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১০।৯।২ ঋগ্‌বেদ ; ১১।৫২। ঐ

ইহাদের মর্ম্মার্থ=জল অতিশয় কল্যাণকারক এবং অত্যন্ত স্নিগ্ধ, ইহা তোমার রোগনাশ করুক। ১। [হলায়ুধ সম্মত ব্যাখ্যা] হে জল, তোমরা সুখের উৎপাদক, তোমরা আমাদের অন্নসংস্থাপন করিয়া আমাদিগকে অন্নপ্রাপ্তির যোগ্য কর এবং তোমরা আমাদিগকে নানাবিধ রমণীয় বস্তু দর্শনের এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত করিয়া থাক। ২। সন্তানের প্রতি স্নেহসম্পন্না মাতা যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাদিগকে স্তন্যপান করান, হে জল তোমরাও তোমাদের যে শুভ এবং সুখকর রস আছে, আমাদিগকে সেই রস ভোগ করিতে দাও। ৩। হে জল, তোমরা আমাদের পাপক্ষালণ করিয়া আমাদের প্রীতি-সম্পাদন করিয়া থাক, সেই পাপক্ষালণের উদ্দেশ্যে এখনই আমরা তোমাকে আমাদের মস্তকে ধারণ করিতেছি [অথবা, যে অন্নের উৎপাদক এবং ধারক ওষধিগুলিকে পোষণ কর, সেই অন্নকে পর্য্যাপ্তরূপে পাইবার জন্য তোমাদের আশ্রয় লইতেছি] ; কিন্তু হে জল, তোমরা আমাদিগকে সন্তানোৎপাদনের সম্যক্ সামর্থ্য প্রদান কর। ৪।—[সায়ণ ভাষ্যসম্মত ব্যাখ্যা]।

[উক্ত প্রথম মন্ত্রটী পারস্কর গৃহ্যসূত্রের এবং আর তিনটী বেদ-মন্ত্রের ; ছন্দ গায়ত্রী ৮।৮।৮। এই চারিটীই জলের স্তুতি (অর্থাৎ জলের গুণ বর্ণনা) এবং উহারা সন্ধ্যা বন্দনায় নিত্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে]।

যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর গৃহ্যসূত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া পশুপতি তাঁহার যে পদ্ধতি [দশকর্ম্ম-দীপিকা] সংকলন করিয়াছেন, গোয়ালপাড়ায় প্রচলিত "পঞ্চাননের পদ্ধতি" তাহারই দেশাচারানুগত সংস্করণ মাত্র ; এবং

পশুপতিরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা কুশণ্ডিকা, লাজহোম, সপ্তপদী গমন এবং মিত্রাভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি। পশুপতির পদ্ধতিতে "মিত্রাভিষেক"ই বিবাহ-সংস্কারের একরূপ চরম অনুষ্ঠান; তাহার পর, কেবল বরকর্ত্তৃক বধূকে সূর্য্য-প্রদর্শন, বধূর হৃদয়দেশ স্পর্শ, সংস্কারকার্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত সমাগত নর-নারীগণের নিকট বধূর শুভকামনাসূচক আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা, [শিষ্টাচারবশতঃ বরকর্ত্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দূরদান *], কোন নিভৃত স্থানে লোহিত বৃষ বা মৃগচর্ম্মের উপর বর-বধূর একত্র উপবেশন, পুনরায় 'স্বিষ্টিকৃৎ' হোম, বধূ-বরের 'সংশ্রব' [হোমশেষ হবির] ভক্ষণ এবং [আচমন করিবার পর] বধূকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখান এবং চতুর্থীহোম মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ঋগ্বেদীয় 'কালেশি-পদ্ধতি' নামক পুস্তকে (আশ্বলায়ন গৃহ্য-সূত্রানুগত) এই "মিত্রাভিষেক" নাই। তথায় সংস্কার-কার্য্যের প্রারম্ভে স্থাপিত কলসের জল লইয়া আম্রপল্লবের দ্বারা বর স্বয়ং নিজের মস্তকের সহিত বধূর মস্তক একত্র করিয়া [ছোঁওয়া ছুঁয়ি করিয়া] উভয়ের মস্তকে একযোগে অভিষেক করার ব্যবস্থা আছে।

সামবেদীয় [গোভিল গৃহ্যসূত্রের অনুগত] পদ্ধতিকার ভট্ট ভবদেবও তাঁহার পদ্ধতি পুস্তকে "মিত্রাভিষেকের" ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে, সপ্তপদী গমনের পর এবং পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে এই অভিষেকের কার্য্য করিতে হয়। সপ্তপদী গমনের পর, বর বিবাহ

---

* সিন্দূরদান=কালেশি-পদ্ধতিতে ঘটস্থাপনায় সিন্দূরদানে এবং অধিবাসের অন্তর্গত সিন্দূর দানেও "ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ"। এই মন্ত্রটি পড়িবার উপদেশ দেওয়া আছে; অথচ বিবাহ-সংস্কারের সময়ে বধূর কোথায়ও সিন্দূর দেওয়ার ব্যবস্থা নাই।

দর্শনার্থ সমাগত নরনারীবৃন্দের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন। তাহার পর, এই 'অভিষেক' করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা আছে, যথা:—"ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতোদককুম্ভধারী জামাতুর্বয়স্তোঽগ্নেঃ পশ্চিমদেশেন সপ্তপদী-স্থানমাগত্য সহকারপল্লবোদকেন মূর্দ্ধ্নি বরমভিষিঞ্চেৎ। জামাতা চ পঠতি। প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিশ্বেদেবাদয়োদেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥ ৪৭॥ পশ্চাদনেনৈব মন্ত্রেণ বধূমপ্যভিষিঞ্চেৎ॥"

অর্থাৎ -"জামাতার কোন বয়স্য [মিত্র, আমাদের 'মিতবর'] আগে হইতেই জলকুম্ভ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সপ্তপদী গমন এবং বরকর্তৃক সমাগত সজ্জনবৃন্দ এবং মহিলাগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, তিনি (সেই বয়স্য বা মিত্র) জলের কলস লইয়া অগ্নির পশ্চিম দিক্ দিয়া সপ্তপদী গমনের স্থানে আসিয়া আম্রপল্লবের দ্বারা সেই কলসের জল লইয়া বরের মস্তকে অভিষেক করিবেন [জলের ছিটা দিবেন]। জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন—(ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৮৫ তম সূক্তের ৪৭ তম ঋঙ্ মন্ত্র]। টীকাকার গুণবিষ্ণুর সম্মত অর্থ, যথা:—"হে কন্যে, বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় নিষ্পাপ করুন; জলদেবতা, বায়ুদেবতা, প্রজাপতি এবং উপদেষ্ট্রী (সরস্বতী) দেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয়কে একীভূত করুন।"

এই মন্ত্রটীর সায়ণ-কৃত ভাষ্য অতি মনোহর। তদনুগত মর্ম্মার্থ এই:—"সর্ব্ব দেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় হইতে দুঃখ-ক্লেশাদি দূর করিয়া [আমাদের হৃদয়দু'টিকে] লৌকিক এবং বৈদিক যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের উপযুক্ত করুন; জলদেবতাও আমাদের উভয়ের হৃদয়কে তদ্রূপ করুন; বায়ুদেব আমাদের উভয়ের বুদ্ধিকে পরস্পরের অনুকূল করুন; ধাতা এবং সরস্বতী দেবী আমাদের উভয়ের হৃদয়কে একত্র সংযোজিত এবং সম্মিলিত করুন।"

বরের মস্তকে অভিষেক সমাপ্ত হইবার পর, উক্ত বয়স্য বধূর মস্তকে অভিষেক করিবেন এবং বর পূর্ব্ববৎ ঋঙ মন্ত্রটী পড়িবেন।"

এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে, সামবেদীয় এবং যজুর্ব্বেদীয় দ্বিজগণের বিবাহ সংস্কারে "মিত্রাভিষেক" অনুষ্ঠানটী অতি প্রাচীন এবং উহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

কলিকাতার সন্নিহিত জেলাগুলিতে বরের সঙ্গে একই যানে ভ্রাতৃ সম্পর্কিত কিন্তু বয়সে ছোট যে বালককে বরের মত সাজসজ্জা করাইয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়, তিনি "বরস্য মিত্রম্" অর্থাৎ বরের মিত্র। সেই সকল স্থানে এই বালককে নিতবর বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নামটী মিতবর [মিত্রবর, বরের মিত্র] হইবে। বর্ত্তমানে এই 'নিতবর' বরের শোভা যাত্রার একটা অঙ্গ-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ইহা যে প্রাচীন মিত্রাচারের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এমন এককাল ছিল, যখন বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাইবার জন্য অনেকেরই লোভ থাকিত এবং বরকে সাহায্য করিবার জন্যই মিত্র (Best man) বা মিতবরের আবশ্যক হইত।

চতুর্থীকর্ম্ম, চতুর্থীহোম

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

চতুর্থীহোম, চরুপাক, চরুভক্ষণ ইত্যাদি এবং অবশেষে সহবাস—এইগুলিকে চতুর্থীকর্ম্ম বলে। সামবেদীয় গৃহ্যকার গোভিল মুনি নগ্নিকা বা অরজস্কা কন্যার বিবাহ শ্রেষ্ঠকল্প বলিয়া অনুমোদন করায় চতুর্থীকর্ম্মকে অন্যান্য গৃহ্যকারগণের মত বিবাহের অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপে গ্রহণ করেন নাই এবং করিতেও পারেন না। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, তিনি পারস্করের বিরোধী নহেন। পারস্করের মতে সপ্তপদী গমনের পর তিন দিন তিন

রাত্রি গত হইলে চতুর্থ রাত্রির অন্তিম সময়ে গৃহাভ্যন্তরে হোমের জন্য পঞ্চ ভূ সংস্কার [অর্থাৎ গোময়াদি লেপন] এবং স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া রীতিমত অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক বধূকে নিজের দক্ষিণভাগে বসাইয়া প্রণীতা [তাম্রকুণ্ড] স্থাপন করিয়া তাহার উত্তরে উদপাত্র [জলপাত্র, কোশা] রাখিবে এবং দক্ষিণে ব্রহ্মাকে [বিদ্বান্ চতুর্ব্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে *] বসাইয়া "আবসথ্য আধানের" মত [সাগ্নিক দ্বিজগণের নিত্য অগ্নি-হোত্রের মত] প্রণীতা প্রণয়ন ও আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কার্য্য [হোম] সমাপ্ত করিবে। আঘার আজ্যভাগ ও মহাব্যাহৃতি হোমের পর চরুপাক, এবং তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিতে হয়।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ব্রাহ্মণেতর উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহেও চতুর্থীহোম হয়। এখানে প্রচলিত পঞ্চানন-কৃত বিবাহ পদ্ধতিতে আছে—"অথ চতুথকর্ম্ম। অত্র বিবাহ দিনাদারভ্য যা চতুর্থী রাত্রিস্তস্যামর্দ্ধরাত্রাদূর্দ্ধং গৃহাভ্যন্তরে পঞ্চভূসংস্কারপূর্ব্বকং বিবাহবদগ্নিং স্থাপয়িত্বা তস্যাগ্নের্দ্দক্ষিণে ব্রহ্মাণমুপবেশ্য প্রণীতাস্থানাদুত্তরে জলপূর্ণতাম্রাদি পাত্রং সংশ্রবস্থাপনার্থং স্থাপয়েৎ। বিবাহদিন এব চতুর্থীকর্ম্ম ক্রিয়তে সোক্তা প্রাক্। ওঁ শিখিনাম অগ্নয়ে নমঃ ইত্যগ্নিং পাদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য দক্ষিণজানুং পাতয়িত্বা কুশেন ব্রহ্মণোঽন্বারব্ধপূর্ব্বকং প্রজাপতিং মনসা ধ্যাত্বা শ্রুবেনাজ্যাহুতির্জুহুয়াৎ।" অর্থাৎ—"তাহার পর চতুর্থীকর্ম্ম। এই কাজটী বিবাহ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া গণনা করিলে যে চতুর্থী রাত্রি হয়, সেই রাত্রিতে দুই প্রহর রাত্রির পর গৃহের ভিতরে গোময়াদি দ্বারা ভূমি সংশোধন ও বেদী নির্ম্মাণান্তে বিবাহ-কার্য্যেরই মত অগ্নি স্থাপন করতঃ অগ্নির দক্ষিণদিকে ব্রহ্মাকে বসাইয়া প্রণীতা

পঞ্চাননের পদ্ধতিতে চতুর্থী হোম

* তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—বরের সংস্কারগুলি যাহাতে নির্ভুল হয়, তাহা দেখা।

স্থাপনের উত্তরে জলপূর্ণ পাত্র [হোমশেষ ঘৃত রাখিবার জন্ত] রাখিবে। বিবাহ দিনের মত কার্য্য হইবে, তাহা আগেই বলা হইয়াছে।

এই কার্য্যে অগ্নিকে "শিখী" এই নামে আবাহন এবং পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া বর দক্ষিণ জানু পাতিয়া ব্রহ্মার সহিত অন্বারম্ভ করিয়া মনে মনে প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া শ্রুবের দ্বারা 'আজ্যাহুতি' বা ঘৃতের দ্বারা হোম করিবেন।

[ত্রিবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই চতুর্থীহোম হয়; তবে, দেশাচার অনুসারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হওয়ায় উপসংবেশন (consummation of marriage) হয় না। প্রকৃত-প্রস্তাবে বিবাহের পর তিন দিন তিন রাত্রি অতীত হইলে চতুর্থ দিবসের রাত্রিতে চতুর্থীহোম করিতে হয়। মুসলমান প্রভাবের ফলে হিন্দু-সমাজে অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের বিবাহ অধিকতররূপে প্রবর্ত্তিত হইবার পর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কুশণ্ডিকা ইত্যাদির পরই নাম মাত্র বা নিয়ম রক্ষা মাত্র ঐ চতুর্থীহোম করা হয়। পঞ্চানন ও "চতুর্থীহোম"কেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সহবাস যখন নাই, তখন চতুর্থীকর্ম্ম বলা ভুল]।

চতুর্থী হোমের অঙ্গস্বরূপ চরুহোমের জন্য রীতিমত শাস্ত্রবিহিত-ভাবে চরু (অন্ন) পাক করিয়া সেই চরু দ্বারা আহুতি দান বা হোম করাকে "চরুহোম" বলে। চরুহোমের পূর্ব্বে বর অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র এবং গন্ধর্ব্ব এই পঞ্চ দেবতাকে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন করিয়া ঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবেন। নববিবাহিতা পত্নীর দেহের অমঙ্গলজনক দোষগুলিকে মন্ত্র এবং হোমের সাহায্যে দূর করিয়া দেওয়াই এই হোমের উদ্দেশ্য। হোমমন্ত্রগুলি এই, যথা :—

চরু হোম

অগ্নে *	...	যাস্যৈ পতিঘ্নীতনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা।
বায়ো *	...	" প্রজাঘ্নীতনূ " " ।
সূর্য্য *	...	" পশুঘ্নীতনূ " " ।
চন্দ্র *	...	" গৃহঘ্নীতনূ " " ।
গন্ধর্ব্ব *	...	" যশোঘ্নীতনূ " " ।

* অগ্নে, বায়ো, সূর্য্য, চন্দ্র এবং গন্ধর্ব্ব ইহাদের পরবর্ত্তী কথাগুলি, যথা :— "প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বাং নাথকাম উপধাবামি।"

প্রত্যেক আহুতির ঘৃতের শেষভাগ উদপাত্রে [কোশার জলে] রাখিয়া দিবে।

এই পাঁচটী প্রায়শ্চিত্ত হোমের পর সেই পূর্ব্বপক্ব চরুপাকের অন্ন লইয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে—ন মম" এই মন্ত্র পাঠ করত অগ্নিতে চরুহোম করিবেন। হোমের আহুতি শেষের হবিঃ মিশ্রিত উদপাত্রের সেই জলের দ্বারা বধূর মস্তকে অভিষেক করিতে করিতে বধূকে সম্বোধন করিয়া "যা তে পতিঘ্নী, প্রজাঘ্নী, পশুঘ্নী, গৃহঘ্নী, যশোঘ্নী নিন্দিতাতনূর্জ্জারঘ্নীং তত এনাং করোমি সা জীর্য্য ত্বং ময়া সহ অসৌ ইতি"—এই মন্ত্রটী পড়িবেন। ['অসৌ স্থলে পত্নীর নাম সম্বোধন করিবেন]। এই প্রায়শ্চিত্ত আহুতি প্রদান এবং মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য :—হোমের ফলে এবং মন্ত্রের বলে (A sort of magical rites) উক্ত দেবগণ বধূর দেহস্থিত স্বামীর, সন্তানের, স্বামীর গৃহের গরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুর, স্বামীর গৃহের এবং পতিকুলের যশঃ বা সুখ্যাতির হানিজনক দোষগুলি দূর করিয়া দিবেন। আর বধূর মাথায় অভিষেক করার [জলপড়া দেওয়ার] সময়ে যে মন্ত্রটী পড়িতে হয়, তাহার মর্ম্মার্থ—"হে নারি (নামোচ্চারণ করিয়া বলিবে, অমুক দেবি) তোমার দেহে স্বামী, সন্তান, স্বামীর গৃহ, গৃহের পশু এবং পতিকুলের সুযশঃ নষ্ট করিবার যে সকল দুর্লক্ষণ বা দোষ আছে বা থাকিতে পারে, সেগুলিকে আমি এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছি যে, সেই দোষগুলি আমার বা আমার বাড়ীর কাহারও কোন হানি না করিয়া যে তোমার প্রণয় প্রার্থনা করিবে [জার হইতে চাহিবে বা হইবে] তাহাকেই বিনষ্ট করিবে এবং তুমি আমার সাধ্বী পত্নীরূপে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জীবন অতিবাহিত করিবে।"

ইহার পর চরুর অন্ন বধূকে খাওয়াইবার সময়েই পারস্কর গৃহ্যের

১।১১।৫ম সূত্রের মন্ত্রটী [ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ৎসংদধাম্যস্থিভিরস্থীনি মা৺সৈর্মা৺সানি ত্বচা ত্বচমিতি"] পাঠ করিতে হয়।

বর-কন্যার সহবাসের আদেশপ্রদান

ঋষি পারস্করের লিখিত গৃহ্য-সূত্রের উক্ত মন্ত্রের পরবর্ত্তী সূত্রে কথিত হইয়াছে—"তামুদুহ্য যথর্তু-প্রবেশনম্।" ৭। "তাহাকে [সেই নারীকে] এই প্রকারে বিবাহ করিয়া ঋতুস্নানের পর যথাকালে সহবাস করিবে।" ৭। কিংবা "যথাকামী বা 'কামমাবিজনিতোঃ সংভবাম' ইতি বচনাৎ।" ৮। অথবা, নারীরা পুরাকালে ইন্দ্রের নিকট যে বর চাহিয়া লইয়া ছিলেন—'সন্তান-প্রসব করার সময় পর্য্যন্তও [গর্ভাবস্থায়] যেন আমরা স্বামি-সহবাস-সুখভোগ ইচ্ছামত করিতে পারি'—সেই বর স্মরণ করিয়া স্ত্রীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে যখন ইচ্ছা তখনই সহবাস করিবে। ৮। তাহার পর [সহবাস করিবার পর] বর পত্নীর দক্ষিণ কাঁধের উপর দিয়া নিজের ডান হাত লইয়া তাহার হৃদয়দেশ [বক্ষঃস্থল] স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা:—

"যত্তে সুসীমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্।
বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম
শরদঃ শত৺ শৃণুয়াম শরদঃ শতমিতি॥ ৯॥

—পারস্কর গৃহ্যসূত্র

অর্থাৎ—"আকাশে চন্দ্রদেবের মত তোমার হৃদয়ে যে চন্দ্রদেব উদিত আছেন, তাহা আমি, ইহাই জানিবে। আমরা যেন শত বৎসর ধরিয়া জীবিত থাকি এবং নানা প্রকার সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হই।"

ইহার পরই চতুর্থীকর্ম্ম সমাপ্ত হয়।

মন্তব্য—গৃহ্যসূত্রকার মহর্ষি পারস্কর বলিতেছেন, যে বেদজ্ঞ দ্বিজ যথাবিধি চতুর্থীহোম এবং পত্নীর অভিষেকাদি কার্য্যগুলি যথাশাস্ত্র করিতে পারেন, তাঁহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিবার জন্য কেহই সাহস করিবে না; সে ভাবিবে যে, ঐরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি

পাছে তাহার শত্রুতে পরিণত হইয়া যান [বিদ্বান্ ব্যক্তি অক্লেশে শত্রুর সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ, সেই ভয়ে কেহই বিদ্বানের স্ত্রীর উপর লোভ করে না]। মূল সূত্রটী এই :—"তস্মাদেবংবিচ্ছোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেদুতহ্যেবংবিৎ পরো ভবতি ।৬।—প্রথম কাণ্ড, একাদশ কণ্ডিকা।

[কালেশির মৌলিক আশ্রয়স্বরূপ অশ্বালয়ন গৃহ্যসূত্রে (বিবাহের পর চতুর্থী কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ পত্নীর সহবাস বিধান থাকায়) গর্ভাধান সম্বন্ধে কোন বিধি নাই। উত্তর কালে শিশু-বিবাহ প্রচলিত হইলে, কোন কোন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ গৃহ্য পরিশিষ্ট (Supplement) লিখিয়া এই গর্ভাধানের বিধান করেন এবং চতুর্থী কর্ম্ম শুধু নামেই পর্য্যবসিত হয়]।

চতুর্থীকর্ম্ম বিবাহের একটী প্রধান অঙ্গ এবং সহবাস (consummation) উক্ত চতুর্থীকর্ম্মের অপরিত্যজ্য অংশ। এই সহবাস দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় এবং পত্নী, পিতার গোত্র হারাইয়া, স্বামীর গোত্র লাভ করেন। পারস্কর গৃহ্যসূত্রের প্রথম কাণ্ডের একাদশ কণ্ডিকার পঞ্চম সূত্রে চতুর্থীকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ স্থালীপাক বা চরুপাক পত্নীকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে পতি উপরিধৃত মন্ত্রটী [ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ৎ-সংদধামি—ইত্যাদি] পাঠ করেন। ইহার অর্থ হইতেছে—"আমার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ, আমার অস্থির সহিত তোমার অস্থি, আমার মাংসের সহিত তোমার মাংস এবং আমার ত্বকের সহিত তোমার ত্বক একত্র সম্মিলিত করি *।" দুই চারিটী মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হস্তস্পর্শ এবং 'সপ্তপদী গমন' [এক সঙ্গে সাত পা গমন] করার জন্য এরূপ গাঢ় সম্পর্ক জন্মে না, যাহাব ফলে এক গোত্রের একটী

(মার্জিনে: বর-কন্যার সহবাস দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বিবাহ সিদ্ধ হয়)

* In consequence of consummation, the blood, flesh and the organ of the one get mixed up with those of the other.

মানুষ, ভিন্ন গোত্রের আর একটী মানুষের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া অপরের নাম বা গোত্র লাভ করিতে পারে। জোড় কলম করিবার নিয়মানুসারে দুইটী গাছের ডাল একত্র জোড়া লাগিবার পর, তবে দুইটী গাছ একত্র হইয়া যায়। চতুর্থীকর্ম্মের শেষে সহবাস হইলে—[অর্থাৎ—একের ত্বক্‌, মাংস, হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়গণ অন্যের ঐগুলির সহিত সম্পূর্ণভাবে একীভূত বা মিলিত হইলে]—তবে সেই গাঢ় সম্পর্ক জন্মিতে পারে। এই জন্যই সহবাস না হইলে খৃষ্টান্‌ এবং মুসলমানদিগের বিবাহও পাকা হয় না। বেহার প্রদেশে নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বালক বালিকার শৈশবে বিবাহ হইত—[অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে সারদা সাহেবের "বাল্য বিবাহ বিরোধ আইন" প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে] এবং তাহার ফলে একটী বিশেষ লোকাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই [custom] টী এই যে, বিবাহিতা বালিকা তাহার রজোদর্শন পর্য্যন্ত মাতা-পিতার নিকটেই থাকিত এবং রজোদর্শনের পর গৌনা বা দ্বিরাগমন নামক সংস্কারের সময়ে—[বাঙ্গালা দেশের "পুনর্বিবাহ" প্রথার অনুরূপ] বরকে শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া সেই 'সংস্কার' [সহবাস] করিতে হইত। যদি কোন বিবাহিতা বালিকার গৌনা বা দ্বিরাগমন সময়ে স্বামী উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য [অর্থাৎ সহবাস-ক্রিয়া] করিতে না পারিত, তাহা হইলে, বালিকার সে পূর্ব্বের বাল্যবিবাহ বাতিল হইয়া যাইত এবং তাহার অভিভাবকগণ অবাধে নূতন বরের হস্তে তাহাকে দান করিতে পারিত।

বেহার প্রদেশে নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুর সহবাস না হইলে বাল্য বিবাহ বাতিল

আধুনিক সুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজের মত হিন্দুসমাজেও যে পূর্ব্বকালে বালিকাদের 'পতিসংযোগসুলভ' বয়সেই (পতি-পত্নীর সহবাসের যোগ্য

বয়সেই) বিবাহ হইত, যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর প্রমুখ ঋষির [যেমন জৈমিনি, বৌধায়ন, হিরণ্যকেশী প্রভৃতির] সঙ্কলিত গৃহ্যসূত্র সমূহের আদিষ্ট এই 'চতুর্থীকর্ম্ম' নামক অনুষ্ঠানটির বর্ণনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যজুর্ব্বেদের আশ্রয়েই অধিক সংখ্যক দ্বিজের সংস্কার হইয়া থাকে। এবং ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণের যাবতীয় দ্বিজের যাবতীয় সংস্কারই যে যজুর্বেদের বিধানমত সম্পন্ন করিতে হয়, [এমন কি আধুনিক পুরোহিত মহাশয়েরা শূদ্রবর্ণের নরনারীর সংস্কারাদি কার্য্যও যজুর্ব্বেদের বিধানমতে করাইয়া থাকেন,—যদিচ শূদ্রবর্ণের বেদানুগত কোনও সংস্কারের আবশ্যকতার বিষয় বা ব্যবস্থা কোন গৃহ্যসূত্র বা প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না] তাহা সকলেই অবগত আছেন এবং "যজুঃ সর্ব্বত্র গীয়তে" এই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রাংশ দ্বারাও তাহা উপলব্ধি হয়। ঋগ্‌বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে এই চতুর্থীকর্ম্মের বিষয় সুস্পষ্টভাবে লিখিত না হইলেও বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ পদ্ধতিকার কালেশি ভট্টাচার্য্য তাঁহার পদ্ধতিতে চতুর্থীকর্ম্মের বিনিয়োগের বর্ণনা করিয়াছেন। সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রকার গোভিলমুনির এবং ছন্দোগপরিশিষ্টের অনুকূল এই চতুর্থীকর্ম্মের বিধান ভট্ট ভবদেবও স্বকীয় পদ্ধতিতে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তবে, প্রাপ্তবয়স্কা এবং স্বামি-সহবাস যোগ্যা বালিকার বিবাহের প্রথা পদ্ধতিকার মহাশয়গণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই অপ্রচলিত হওয়ায় বাঙ্গালায় তিন বেদের পদ্ধতিকাররাই তাঁহাদের পুঁথিতে "চতুর্থীকর্ম্মের" স্থলে "চতুর্থীহোম" লিখিয়া শুধু হোমের বিধানই দিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত "কর্ম্মের" কথা আর কহিতে পারেন নাই। "চতুর্থীহোম" যে অর্দ্ধরাত্রির পর করিতে হয়. সামবেদীয় ভট্টভবদেব এবং ঋগ্‌বেদীয় কালেশি তাহাও লেখেন নাই। কারণ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, পুরোহিত যখন হোম করিবেন এবং 'কচি খুকি ক'নের' সম্বন্ধে 'কর্ম্মের' কোনও সম্বন্ধই যখন নাই, তখন অর্দ্ধরাত্রিতে হোমের বিধান

দিবারও কোন সার্থকতা নাই। তাঁহাদের আদিষ্ট এই "চতুর্থীহোম"ও সদ্যোবিবাহিত দম্পতীর শয়নগৃহে সমাধা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই—যে কোনও মণ্ডপে বা যজ্ঞশালায় তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। আর্য্যসভ্যতার যুগে প্রত্যেক বিবাহিত বরই যে সুদক্ষ শ্রোত্রীয় (বেদজ্ঞ) এবং সংস্কার-কার্য্য সম্পাদনে সুপটু হইতেন, বরকেই যে স্বয়ং এই সকল বৈবাহিক হোমকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত, এবং চতুর্থীহোমের ও হোমশেষে পত্নীর অভিষেকের পর তাঁহাকে স্ত্রীসহবাস-কার্য্য সম্পাদন করিয়া এই "চতুর্থীকর্ম্ম" সমাধান বা শেষ করিতে হইত, পদ্ধতিকার মহাশয়গণ তাহা উত্তমরূপে অবগত থাকিলেও, সময়ানুগত দেশাচারানুসারে সেই সদাচারসমূহ লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়াই নিজ নিজ পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর পশুপতি তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ পারস্কর গৃহ্যসূত্রের আদেশের একান্ত বশীভূত হইয়া দম্পতীর গৃহের ভিতর এবং চতুর্থীরাত্রির "সার্দ্ধপ্রহর-ত্রয়োপরিণ বা তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইবারও অর্দ্ধপ্রহর পরে এই হোমের ব্যবস্থা করিয়াছেন; শুধু দেশাচারের ভয়ে গৃহ্যকারের উপদিষ্ট স্বামি-স্ত্রীর সহবাসের কথাটুকু লিখিতে পারেন নাই।* এই চতুর্থী হোম যে প্রকৃতই শেষ রাত্রিতে এবং শয্যাগৃহের অভ্যন্তরে করিতে হয়, পারস্কর স্পষ্ট ভাষাতেই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা :—"চতুর্থ্যামপররাত্রেভ্যন্তরতোঽগ্নিমুপসমাধায়…… জুহোতি" ।১॥ [প্রথম কাণ্ডে, একাদশ কণ্ডিকা]।

* পশুপতির সময়ে অষ্টবর্ষা 'গৌরী', নবমবর্ষা 'রোহিণী' এবং দশমবর্ষা 'কন্যা'র (অর্থাৎ কচি খুকি মেয়েদের) বিবাহ চলিতে থাকায়, তিনি সেরূপ বয়সের বালিকার স্বামিসহবাসের কথা লিখিতে পারেনও না। এরূপ কার্য্য শুধু পাপজনক নহে, বালিকার প্রাণহানির আশঙ্কাজনকও বটে।

অর্থাৎ—"চতুর্থ দিবাশেষে রাত্রি আসিলে সেই রাত্রির শেষভাগে গৃহের ভিতরে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক……হোম করিবেন।"

সামবেদীয় এবং ঋগ্‌বেদীয় চতুর্থী হোমের মন্ত্রগুলিও প্রায় আমাদের উদ্ধৃত (যজুর্ব্বেদীয়) মন্ত্রলিরই মত, যৎসামান্য ভেদ যাহা আছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—বালিকার রজঃ প্রবৃত্তির পূর্ব্বে বিবাহের ব্যবস্থার অনুকূলে স্মৃতিবাক্যের ন্যূনতা নাই। তবে এই স্মৃতিগুলির সকলই শ্রৌত গৃহ্যসূত্রগুলির এবং মনুসংহিতার অপেক্ষা বয়সে নবীন। অনেক স্মৃতিতে নূতন বচন প্রক্ষিপ্ত করাও হইয়াছে। ছন্দোবদ্ধে লিখিত অনেক স্মৃতিই খৃষ্টাবির্ভাবের পরে রচিত। পরাশর, সম্বর্ত্ত, অঙ্গিরা, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বেদব্যাস, নারদ, শঙখ, প্রজাপতি, লঘুশাতাতপ, এবং বৃহৎ যম প্রভৃতি ঋষির নামে অরজস্কা বালিকার বিবাহের অনুকূলে কতকগুলি শ্লোক রচিত (later day interpolations) দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহ্য সূত্রকারগণের মধ্যে এক সামবেদীয় গোভিল মুনি এই রূপ বিবাহকে ভাল (Recommendatory, but, not mandatory) বলিয়াছেন। মিমাংসা শাস্ত্রের (৮) অভিপ্রায় অনুসারে ঋষিবাক্যের একবাক্যতা (conciliation) করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। Sarda Act এর আগে যে "অনুসন্ধান সমিতি" (Commission) নিযুক্ত হইয়াছিল, উহার Report * পড়িলেই উক্ত সিদ্ধান্তের অনেকটা মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়।

অরজস্কা বালিকার বিবাহের আদেশ

---

(৮) 'মিমাংসা শাস্ত্র' বলিলে বেদব্যাসের এক প্রধান শিষ্য জৈমিনি ঋষি প্রণীত "পূর্ব্ব মিমাংসা" দর্শনকেই বুঝাইয়া থাকে।

* কলিকাতার অনেক 'লাইব্রেরীতে' এই রিপোর্ট পাওয়া যায়।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

মনূক্ত "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের রঘুনন্দন-কৃত অর্থ ষোল আনা ঠিক নহে। কেননা—রঘুনন্দন বলিয়াছেন, "সপ্তপদী গমনের চরম বা সপ্তম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-সংস্কারটী সিদ্ধ বা শেষ হইয়া যায়।" উক্ত শ্লোকের শব্দার্থ বিচার করিলে এই অর্থ পাওয়া যায়—"পাণি-গ্রহণের মন্ত্রগুলি কন্যার 'দার' বা ভার্য্যাতে পরিণত হইবার নিয়ম; [আর] বিদ্বান্ সজ্জনদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, সপ্তপদী গমনের সপ্তম পদ (শেষপদ) গমনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মন্ত্রগুলির পরিসমাপ্তি ঘটে। মন্ত্রের শেষ পংক্তির অন্তর্গত "তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া" অর্থে "তাহাদের নিষ্ঠা (সমাপ্তি) জানিবে" হয়। এই যে, 'তেষাং' (তাহাদের) ইহার অর্থ "পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাণাং" [পাণিগ্রহণ সংস্কারের পাঠ্য মন্ত্রগুলির]; কিন্তু, "বিবাহস্য বা বিবাহকর্ম্মণাম্" [বিবাহের বা বিবাহের কর্ম্মগুলির] নিষ্ঠা (সমাপ্তি) নহে। স্মার্ত্ত গায়ের জোরে "মন্ত্রগুলির সমাপ্তির" পরিবর্ত্তে "বিবাহ সংস্কারের সমাপ্তি" লিখিয়াছেন। বর-কন্যা যে সপ্তপদী গমন করেন, তাঁহাদের সপ্তম বা চরম পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যে মন্ত্র ["সখে সপ্তপদা ভব" ইত্যাদি] পড়া হয়, সেই মন্ত্রটী পড়া হইলেই ঐ [পাণিগ্রহণিকা] মন্ত্রগুলির শেষ হইয়া যায়। ইহার কোথায়ও ভার্য্যাত্বের নিষ্ঠা বা পাকাপাকির কোনও কথা নাই; শুধু মন্ত্রগুলির সমাপ্তির কথা আছে। সুতরাং

বিবাহ-সংস্কারের সিদ্ধতা বা ভার্য্যাত্বের পাকা-পাকির কথা

এই শ্লোকে "ভার্য্যাত্ব (wifehood) পাকা হইয়া যায়" এরূপ অর্থ গায়ের জোরে ভিন্ন করা যায় না। আসল কথা—প্রাচীন কালে যৌবন বিবাহ হইত বলিয়া দম্পতির সহবাসের সহিত বিবাহ সংস্কারের সমাপ্তি ঘটিত। পরে শিশু বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে একটা কৃত্রিম সমাপ্তি স্থির করিতে হইয়াছিল,—তাই এই গরজ।

মন্ত্রের দ্বারা যে ভার্য্যাত্বের 'নিষ্ঠা' বা সমাপ্তি হয় না, পরন্তু স্বামী-স্ত্রীর সহবাস (co-habitation বা consummation) দ্বারাই তাহা হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে একটী প্রমাণই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। বশিষ্ঠ ঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে যে—

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাহথ বরো যদি।
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥ ১
যাবচ্চোদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥ ২
পাণিগ্রহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।
সা চ ত্ব ক্ষত যোনি স্যাৎ পুনঃ সংস্করমর্হতি॥৩

[মাধব পরাশরীয় ভাষ্য এবং নির্ণয় সিন্ধুতেও ইহা ধৃত হইয়াছে]

ঐ শ্লোক তিনটীর বঙ্গানুবাদ, যথা :—"বাক্য দ্বারাই হউক, অথবা জল দ্বারাই হউক, কোনও কন্যার সম্প্রদান কার্য্য হইবার পরে এবং বৈবাহিক হোম, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমনাদি কার্য্য যথাযথ মন্ত্রো-চ্চারণপূর্ব্বক সমাধা হইবার পূর্ব্বে, যদি বরের মৃত্যু হইয়া যায়, সেই কন্যা তাহার পিতার 'কুমারী'ই থাকে।১। কেবল মাত্র সম্প্রদান বাক্য উচ্চারণ করা হইয়াছে, কিন্তু বর কর্ত্তৃক উক্তরূপ বৈবাহিক মন্ত্র পাঠ দ্বারা সংস্কৃতা হয় নাই, এরূপ কন্যাকে বিধিবৎ অন্য বরকে প্রদান করিতে

হইবে, যেহেতু "কন্যা"ও যেমন, ইনিও তেমনই [শাস্ত্রমত বিবাহযোগ্য জানিবে] ২। এমন কি, বৈবাহিক সংস্কারের যাবতীয় মন্ত্রপাঠ এবং কার্য্য সমাপ্ত হইবার পর যদি কোন নারীর বর [পাণিগ্রহণকারী] চতুর্থীকর্ম্ম বা সহবাস করার পূর্ব্বে মরিয়া যায় এবং সুতরাং সে "অক্ষতযোনি' [বা, পুরুষ সহবাস-সম্পর্কশূন্য] থাকে, তাহা হইলে সেই নারী পুনরায় সংস্কারের যোগ্যা [শাস্ত্রমতে বিবাহিতা হওয়ার যোগ্যা] বলিয়া বিবেচিতা হইবে ।৩।"

বশিষ্ঠ ঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্ত "পাণিগ্রহে মৃতে বালা" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা যায়—"পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদী গমনের দ্বারা ভার্য্যাত্বের 'নিষ্ঠা' (পরিসমাপ্তি) হয় না, শুধু স্বামী-সহবাসের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।"

বিবাহিতা কন্যার ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হওন

স্বামি-সহবাসের পর স্বামীর মৃত্যু অথবা নিরুদ্দেশ প্রভৃতি ঘটিলে সেই বিবাহিতা বালার কুমারী-কন্যার (maid) মত আর "ধর্ম্ম বিবাহ" হয় না, অনুকল্প বিধানে বা "পুনর্ভূ' বিধানেই শুধু তাহার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া প্রাচীন সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। বর এবং কন্যার [বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে] সহবাস-কর্ম্মের দ্বারাই বিবাহের স্বাভাবিক সমাপ্তি হইতে পারে এবং প্রাচীন আর্য্য সমাজে তাহাই হইত এবং এখনও সভ্যাসভ্য সকল দেশের সমাজে তাহাই হইতেছে। কালক্রমে অপরিণত বয়স্কা কন্যার বিবাহ এদেশে প্রচলিত হওয়ার ফলে বিবাহ শুধু নাম মাত্র হইত। বিবাহের পর চারিদিন কেন—দুই বৎসরের মধ্যেও সহবাসের সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং স্বাভাবিক বিবাহ সমাপ্তির [সহবাসের] পরিবর্ত্তে একটা কৃত্রিম সমাপ্তির কল্পনা করিতে হইয়াছিল এবং দ্বিজগণের পক্ষে বৈবাহিক হোম [কুশণ্ডিকা], পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদী গমনকেই সেই কৃত্রিম সমাপ্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং দেশাচারের

সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার উদ্দেশ্যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যপ্রমুখ পণ্ডিতগণকে প্রাচীন শাস্ত্রাদেশের নূতন ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের এই নবীন ব্যাখ্যার ফলে ইংরাজের আদালতেও কুশণ্ডিকা, পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদী গমনকেই দ্বিজ দম্পতির বিবাহ-সংস্কারের 'নিষ্ঠা' বা সমাপ্তি গণ্য করা হইতেছে। বিবাহের পর তিন দিন তিন রাত্রি গত হইবার পর চতুর্থ রাত্রির শেষে চতুর্থকর্ম্ম সম্পন্ন না হইয়া গেলে 'বিবাহ' সংস্কারের প্রকৃত পরিসমাপ্তি হয় না। এই চতুর্থী কর্ম্মের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রত্যেক গৃহ্যসূত্রকার এবং পদ্ধতিকার সংবৎসরকাল —[অন্ততঃ তিন রাত্রিও]—ব্রহ্মচর্য্য করিবার—[মৈথুন না করিবার] —জন্য আদেশ দিয়াছেন। তাহার জন্যই ভাষ্যকার হরিহর বলিয়াছেন— "চতুর্থীকর্ম্মের অগ্রে বিবাহিতা কন্যার ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, যেহেতু চতুর্থীকর্ম্ম বিবাহেরই একটী অঙ্গ।" যজুর্ব্বেদীয় হিরণ্যকেশী গৃহ্য-সূত্রের টীকাকার ভট্ট গোপীনাথ দীক্ষিতও বলিয়াছেন—"ইদমুপগমন-মাবশ্যকং স্ত্রীসংস্কারত্বাৎ" অর্থাৎ—"এই সহবাস আবশ্যক, যেহেতু ইহার দ্বারাই স্ত্রী-সংস্কার হয়।" পুনশ্চ,—চতুর্থীকর্ম্মের পর সহবাসের আজ্ঞা—[পত্নীর ঋতুকাল থাকুক অথবা না থাকুক, উভয়ের মৈথুনেচ্ছা হইলেই হইল]—দেওয়া হইয়াছে (১ম কাণ্ড, ১১শ কণ্ডিকায় ৭-৮ম সূত্র)। ইহার পর ৯ম সূত্রে "অথাস্যৈ দক্ষিণাং সমধিহৃদয়মালভতে"— অনন্তর ইহার (পত্নীর) দক্ষিণ অংস বা স্কন্ধের উপর দিয়া নিজের দক্ষিণ হস্ত লইয়া তাহার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে।" সূত্রের ভাষ্যে হরিহর "অথ" (অনন্তর) শব্দের অর্থে "অভিগমনান্তরং" [মৈথুনের পর] লিখিয়াছেন। এই অভিগমন দ্বারাই পত্নীর পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে তাহা ভবদেব ভট্ট প্রমুখ আচার্য্যরা সুস্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এই শাস্ত্র ব্যবস্থা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সহবাস না হইলে আর্য্যদিগেরও বিবাহ সংস্কার সম্পূর্ণ হইত না। বাল্য বিবাহের স্থান নাই।

কুশণ্ডিকা প্রসঙ্গে (পৃঃ ২৬১) আমরা শূদ্রের বিবাহ সংস্কারের পরিসমাপ্তির কথা বলিয়াছি। বিবাহের কোন সংস্কার দ্বারা বিবাহিতা কন্যার পিতৃগোত্র ত্যাগ এবং পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে উহা লইয়া শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে মতভেদ আমরা দেখিতে পাই। রঘুনন্দন 'তত্ত্বকার' লঘুহারীতের নাম করিয়া একটী শ্লোক তুলিয়াছেন :—

বিবাহিতা বালার গোত্রান্তর প্রাপ্তির প্রশ্ন জটিল

স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতি গোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া॥
—লঘুহারীত

অর্থাৎ=“সপ্তপদী গমনের ফলেই বিবাহিতা নারীর পতিগোত্রপ্রাপ্তি ঘটে।”

শূলপাণি, (২) বৃহস্পতির নাম করিয়া তুলিয়াছেন—[একটু আরও আগাইয়া গিয়াছেন] :—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥
—শ্রাদ্ধবিবেক ধৃত

অর্থাৎ—পাণিগ্রহণের সময় উচ্চারিত “গৃভ্ণামিতে সৌভগত্বায় ইত্যাদি” মন্ত্রের ফলেই নারীর পিতৃগোত্রের নাশ এবং পতিগোত্র লাভ হয়।

সামবেদীয় গৃহ্যকার কাত্যায়ণের নিম্নলিখিত বচনে—

“সংস্থিতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্র মূর্দ্ধন্তু পতি পৈতৃকম্॥”

যে উপদিষ্ট হইয়াছে—“বিবাহিত স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সপিণ্ডীকরণ

---

(২) শূলপাণি=ইনি বাঙ্গালী। শূলপাণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বিবেক' নাম দিয়া নানা স্মৃতি নিবন্ধ সংকলন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সময় হইতে কোচবিহারে কোন কোন বিষয়ে শূলপাণির 'বিবেক' চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে সেখানে স্মৃতিসাগর, কৌমুদী, গঙ্গাজল এবং ভাস্কর চলিত—এবং এখনও এই সকল চলিতেছে।

পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য তাঁহার পিতার গোত্রের উল্লেখ করিয়াই করিতে হইবে, তাহার পর হইতে তাঁহার [পত্নীর] পিণ্ডদানাদি কার্য্যে পতির পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিবে।" স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কাত্যায়ণের এই আদেশ "শিষ্টাচার বিরুদ্ধ" বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু তিনি ভট্ট-নারায়ণের (৩) মতানুযায়ী হইয়া বলিতেছেন—সপ্তপদী গমনের পরই বধূ, পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়াই—অর্থাৎ, "কাশ্যপগোত্রাহং ভবন্তং অভিবাদায়" [কাশ্যপ গোত্রীয় স্বামীর অভিবাদন করিবে], কিন্তু ভট্ট ভবদেব বলিয়াছেন—"পিতার গোত্র উল্লেখ করিয়াই তখন [সপ্তপদী গমনের পর কিন্তু চতুর্থী হোম এবং উপসংবেশনের পূর্ব্বে] স্বামীকে অভিবাদন করিবে।" স্মার্ত্ত যদিও ভট্টদেবের প্রায় ৫০০ শত বৎসর পরগামী, তথাচ তিনি "সরলাভবদেবভট্টাভ্যামুক্তং হেয়ম্" বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, কাত্যায়ণ গৃহ্যের উক্ত শ্লোক এবং ভবদেব ভট্টের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেও আমারা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আমরা উক্ত বিবদমান অথবা শাস্ত্র বাক্যগুলির এক বাক্যতা (conciliation) এবং সমাধানের চেষ্টা করিতে চাই। ভবদেবের পূর্ব্বে বয়ঃস্থা বালারই বিবাহ হইত এবং চতুর্থী কর্ম্মের সমাপ্তির পর কন্যার গোত্রান্তর ঘটিত। ভবদেব সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যে উক্ত ব্যবস্থা দিয়া ছিলেন, স্মার্ত্ত ভটাচার্য্য তাহার প্রকৃত রহস্য বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন।

---

(৩) ভট্টনারায়ণ=শিশুপাঠ্য বাঙ্গালার ইতিহাসেও কনৌজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ [পাঁচজন কায়স্থ-ভৃত্য, সহচর অথবা রক্ষী যাহাই হউক সঙ্গে লইয়া] আদিশূরের যজ্ঞে আনীত হইয়াছিলেন বলিয়া যে উপকথা লিখিত আছে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্রের মতে সামবেদীয় শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। স্বয়ং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্বকীয় "উদ্বাহ তত্ত্বে" ভট্টনারায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন (বঙ্গবাসীর দ্বিতীয় সংস্করণ, ১১৪ পৃষ্ঠা)। সম্ভবতঃ ইঁহার সংকলিত কোন পদ্ধতিগ্রন্থ ছিল,—কিন্তু এখন তাহা অপ্রাপ্য হইয়াছে।

যদি চতুর্থীকর্ম্মের—[এবং স্বামী-সহবাসের]—পর বিবাহিতা নারী মাত্রেরই পিতৃগোত্রচ্যুতি এবং পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে, তবে পূর্ব্বোদ্ধৃত কাত্যায়ণের "সংস্থিতায়াস্তু ভার্য্যায়াং ইত্যাদি" শ্লোকের [অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী মরিলে, তাহার সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য পিতৃগোত্রেই করিবে] কি গতি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর গরুর পুরাণ [উত্তর খণ্ড ২১।২২ শ্লোক] দিয়াছেন :—

ব্রাহ্ম্যাদিষু বিবাহেষু যা বধূরিহ সংস্কৃতা।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥ ২১
আসুরাদি বিবাহেষু যা বূ্যঢ়া কন্যকা ভবেৎ।
তস্যাস্তু পিতৃগোত্রেণ কুর্য্যাৎ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্ ॥ ২২

অর্থাৎ—"যে সকল নারীর ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য লক্ষণান্বিত এই চারি প্রকার বিবাহের মধ্যে কোনও একটী মতে বিবাহ হইয়াছে, তাহারই সপিণ্ডীকরণ, পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া হইতে পারে; কিন্তু যাহার বিবাহ আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই চারি প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকারে হইয়াছে, তাঁহার সপিণ্ডীকরণ পিতৃগোত্রেই করিতে হইবে।"

এইরূপ উপদেশ থাকাতে মনে হয়—কাত্যায়ন শেষোক্তরূপ বিবাহিতা নারীরই সপিণ্ডীকরণ "পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া সম্পাদন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

অজ্ঞাত রজস্কা বালিকার বিবাহ আমাদের বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে প্রচলিত হওয়ার জন্যই পুনর্ব্বিবাহ বা দ্বিতীয় সংস্কার নামক প্রথার যে উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। পুনর্বিবাহের সময়েই স্বামী-সহবাসের ফলে বিবাহিতা বালিকার পিতৃ- গোত্রচ্যুতি এবং পতিগোত্রলাভ ঘটে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ভবদেব ভট্ট এবং কোনও কোনও পদ্ধতিকার মনুসংহিতার নাম করিয়া যে দুইটী শ্লোকের অধ্যাহার করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণি- ধানের যোগ্য, যথা :—

বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থে দৃহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে॥
চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্ মাংস হৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্রা সংযুজ্যতে পত্নী তদ্ গোত্রা তেন সা ভবেৎ॥

অর্থাৎ—বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর চতুর্থ দিন গত হইলে, রাত্রিকালে বিবাহিতা কন্যা স্বামীর পিণ্ড, গোত্র এবং অশৌচে একত্ব প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ—স্ত্রী স্বামীর সপিণ্ডতা সগোত্রতা, নির্দ্দিষ্ট অশৌচকাল লাভ করে। যেহেতু চতুর্থকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ চতুর্থী হোমের মন্ত্রের প্রভাবশতঃ [পারস্কর গৃহ্যসূত্রের উল্লিখিত "প্রণৈস্তে প্রাণান্ৎসংদধামি" মন্ত্রের প্রভাবে] পতির ত্বক, মাংস, হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়গণের সহিত পত্নীর ত্বঙ্মাংসাদি সংযুক্ত হইয়া যায়; সেই হেতু পত্নী, পতির গোত্র পাইয়া থাকেন।

এইজন্য প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ স্মৃতি বলিয়াছেন :—

"পাণিগ্রহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্ দেয়া যথা কন্যা তথা হি সা॥

—সপ্তদশ অধ্যায়

অর্থাৎ—যদি কেবল মন্ত্রপাঠ করিয়া [পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ইত্যাদির দ্বারা] কোনও বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে (কিন্তু স্বামি-সহবাস না হয়) এবং সেরূপ বিবাহিতা বালিকার বর মরিয়া যায়, তাহা হইলে কন্যার অভিভাবক অন্য যে কোন বরকে সেই কন্যাকে শাস্ত্রসঙ্গত বিধানমত দান করিতে পারেন, কেননা— 'কন্যা'ও যেমন, সেও তেমন।" [অর্থাৎ—তাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই]।

কেবল বশিষ্ঠ, নারদ (১২শ অধ্যায়), পরাশর (৪র্থ অধ্যায়) নহেন, অক্ষতযোনি বালা বিধবার পুনর্বিবাহ যে সকল আর্য্য ঋষি অনুমোদন করিয়াছেন, এই পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদেরই মতানুবর্ত্তী হইয়াই বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত হিন্দু বিধবা বিবাহ ব্যবস্থার আইন" হইয়াছিল এবং ঐ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই বড়োদা রাজ্যে সে দিন "হিন্দু বিবাহ বন্ধনচ্ছেদ আইন" পাশ হইয়া গিয়াছে। সেই বিখ্যাত ব্যবস্থাটী এই :—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥

—পরাশর স্মৃতি, গরুড় পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড

যাহাহউক, যে কন্যা, পিতার 'পুত্রিকা' [অপুত্রক ব্যক্তি নিজ কন্যাকে পুত্রস্থানীয় করিলে তাহাকে পুত্রিকা বলে এবং 'পুত্রিকা-পুত্র' মাতামহের পুত্রস্থানীয় হইয়া থাকে], তাহার পুত্রজন্মের পর তবে সে পতি-গোত্র প্রাপ্ত হয়—তাহার আগে হয় না। গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে তাহার প্রমাণ, যথা :—

পুত্রিকা পতিগোত্রা স্যাদধস্তাৎ পুত্রজন্মনঃ।
পুত্রোৎপত্তেঃ পুরস্তাৎ সা পিতৃগোত্রং ব্রজেৎপুনঃ ॥৩৯

—ষড়বিংশ অধ্যায়

সুতরাং সহবাস হইলে যদি এক গোত্র হয়, তথাপি বিবাহিতা বালিকার গোত্রান্তর প্রাপ্তির প্রশ্ন জটিল [সরল বা সহজ নহে] ব্যাপার কেন? তাহার উত্তর হইতেছে :—

১। বর্ত্তমান দেশাচারের মতে সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যার গোত্রান্তর প্রাপ্তি ধরিয়া লওয়া হয় এবং কন্যাপক্ষের পুরোহিত মহাশয় বরপক্ষের নিকট হইতে গোত্রান্তরের 'দক্ষিণা' আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকল জাতির পক্ষে সম্প্রদানেই বিবাহ চুকিয়া যায়; সুতরাং যদি তাহাদের গোত্র কিছু থাকে, তাহা হইলে ঐ সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যার পিতৃগোত্র ত্যাগ এবং পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে।

২। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বের মতে [যথা লঘুহারীত—পৃঃ ১১২ বঙ্গবাসী সংস্করণ] সপ্তপদী গমনের শেষেই উক্ত পরিবর্ত্তন ঘটে। ভট্টনারায়ণের মতও তাহাই [বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ১৪৪,]।

৩। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের উদ্বাহ তত্ত্বে উদ্ধৃত শূলপাণি ধৃত [শ্রাদ্ধ-

বিবেক ধৃত] বৃহস্পতির মতে পাণিগ্রহণ মন্ত্রের প্রভাবেই ঐ ব্যাপার ঘটে [বঙ্গবাসী সং ১১৩ পৃঃ,]

৪। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের কথিত এবং তাঁহার টীকাকার বাচস্পতির উদ্ধৃত কাত্যায়ন বচনের মতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত বিবাহিতা নারীর গোত্রান্তর প্রাপ্তি ঘটে না,—পরে ঘটে [উদ্বাহতত্ত্ব, ১১৩ পৃঃ, বঙ্গবাসী]।

৫। ভবদেব ভট্ট এবং গোভিল গৃহ্যসূত্রের সরলা * নাম্নী টীকাকারের মতে—সপ্তপদী গমনের পর উহা হয় না, তখনও বিবাহিতা নারীর পিতৃগোত্রই থাকে; পিতৃ গোত্রের উচ্চারণ করিয়াই তাহাকে পতির অভিবাদন করিতে হয় [পৃঃ ১১৪, বঙ্গবাসী]।

৬। ভবদেব ভট্ট এবং আরও কতকগুলি ভাষ্যকার নিবন্ধকার-গণের মতে চতুর্থ কর্ম্মের (সহবাসের) পর গোত্রান্তর হয় [বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু" ইত্যাদি শ্লোক]।

* [সরলা—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার উদ্বাহ তত্ত্বে ইঁহার উল্লেখ [বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১১৪] করিয়াছেন। স্মার্ত্তের টীকাকার ৺কাশীরাম বাচস্পতি লিখিয়াছেন—"গোভিলীয় টীকা বিশেষঃ।" ইহার অর্থ—"গোভিল ঋষি প্রণীত গৃহ্যসূত্রের কোন টীকাকার [যাঁহার নাম স্বয়ং স্মার্ত্ত এবং কাশীরাম জানিতেন না]। তাঁহার টীকাটি সহজ পাচ্য হইয়াছে ভাবিয়া স্মার্ত্ত সরলা নাম রাখিয়াছিলেন। যেমন বিজ্ঞানেশ্বর, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা লিখিয়া তাহার নাম মিতাক্ষরা এবং মল্লিনাথ কালিদাস কাব্যত্রয়ের টীকার নাম "সঞ্জিবনী" রাখিয়াছিলেন। অনুরূপ রসাল নামের নমুনা, যথা:—"মনোরমাকুচমর্দ্দন"। "মনোরমা" নামক ব্যাকরণের এক রসিক টীকাকার স্বপ্রণীত টীকার ঐরূপ সুন্দর নাম রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লজ্জাবোধ করেন নাই। আবার "মনোরমা'র গ্রন্থকারও কম যান না। তিনি এই পুস্তকের দুই অংশের নাম করিয়াছেন "বালমনোরমা" এবং "পৌঢ়ামনোরমা" [বালা+মনোরমা; পৌঢ়া+মনোরমা; সমাস এইরূপ হয়]।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে চরুহোম পর্য্যন্ত যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়া ও যজ্ঞাদি শেষ হইলে বিবাহ মণ্ডপ হইতে বর-কন্যাকে অন্দর মহলে গৃহ মধ্যে আনিয়া একত্রে উপবেশন করাইয়া প্রণম্যা সধবা নারীগণ বরণডালা হইতে আতপ চাউল লইয়া উভয়ের মস্তকে দুই হস্তে প্রক্ষেপ এবং আম্রপল্লব দ্বারা স্থাপিত মাঙ্গলিক ঘটের জল সেচন করেন। তৎপরে কখন কখন ব্যাপার এরূপ দাঁড়ায় যে, অন্য সধবারা আনন্দাতিশয্যে অবশিষ্ট চাউল দুই অঞ্জলিতে পূর্ণ করিয়া ঘরের চালে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দেন। ঐ সময় ধূপ দীপ দ্বারা বর ও বধূকে নিরঞ্জন করা হয়। অতঃপর উক্ত প্রণম্যাগণ উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া [প্রত্যেককে] টাকা, আধুলি, সিকি, কাপড় এবং অলঙ্কারাদি আশীর্ব্বাদী স্বরূপ প্রদান করেন। ইহাকে "ধূপ চাউল দিয়া" বলে। তৎকালে সধবারা মাঙ্গলিক গীত গাহেন ও উলুধ্বনি করেন। 'ধূপ চাউল' নামক মঙ্গলাচরণটী কেবল মাত্র বিবাহে অনুষ্ঠিত হয় না, অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য কার্য্যেও হইয়া থাকে।

ধূপ চাউল

আংটী খেলা

এই কার্য্যের অব্যবহিত পরে ঐ স্থানে 'ডুনী' (চাউল পূর্ণ পাত্র) মধ্যে বর একটী আংটী লুকাইয়া রাখেন এবং কন্যাকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। তিন বার এইরূপ কার্য্য করা হয়। ইহাকে আংটী খেলা বলে। প্রথম বার চাউলের ভিতর হাত দিয়াই কন্যাকে আংটীটি বাহির করিতে হয়; নতুবা তাহার হার হয়।

এই খেলায় যিনি হারিবেন, দাম্পত্য জীবনে তিনি গৃহের কোন লুক্কায়িত দ্রব্য কিংবা হারাণো জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন না। ইহা গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত নারীজন প্রবাদ।

'ধূপ চাউল' ও 'আংটিখেলা' বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর 'স্ত্রী আচাররূপে অনুষ্ঠীত হয়। এতদ্ব্যতীত ক্ষীর-পরমান্ন বদল করা এবং পাশা খেলা প্রভৃতি আরও কয়েকটী খুঁটীনাটী ব্যাপার আছে। পরে যথাসময়ে বর আহার করেন।

বর ভোজন

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বর বিবাহের দিন রাত্রে কন্যার পিত্রালয়ে অন্ন কিংবা আর কোনও খাদ্যদ্রব্য ভোজন করেন না। বরের বাটী হইতে চাউল, দাইল, প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য তথায় লইয়া যাওয়া হয় এবং বরপক্ষের কোন ব্যক্তি রন্ধন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া থাকেন। বিবাহের পর দিন বর, শ্বশুর গৃহের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রসমাজেও ঠিক এইরূপ আচার প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে [পশ্চিম বঙ্গে] বিবাহের পর, রাত্রিতেই বর নিমন্ত্রিত বরযাত্র এবং কন্যাযাত্র ভদ্রলোকগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ফলাহার [অর্থাৎ—লুচি তরকরী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি] করেন। এমন কি, যদি দৈবাৎ বর অন্তঃপুরে আটকা পড়িয়া যান, তাহা হইলেও তাঁহাকে খুঁজিয়া ধরিয়া আনিয়া পংক্তি ভোজনে বসাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বরের কোনও আত্মীয় বরের নৈশ ভোজনের [জলযোগের] দ্রব্য গুছাইয়া আনেন; বরকে তাহাই গলাধঃকরণ করিতে হয়। বিবাহের রাত্রিতে বরযাত্র খাওয়ানরও ঝঞ্চাট নাই—সে রাত্রি 'বিয়ে বাড়ী'তে সব 'চুপচাপ'। পরের দিন 'বরভোজন' করান হয় এবং বরযাত্রীদিগের বাসা বা Campএ গিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে গলবস্ত্রে, যোড়হাতে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রসমাজে কোনও কোনও বিবাহে বরযাত্রীদিগের সপ্তাহকাল

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রসমাজে বর ও বরযাত্র ভোজন

ব্যাপী Camp বসিয়া যায় এবং বেচারা কন্যাকর্ত্তাকে তাঁহাদের রসদ যোগাইতে হয়। চাউল, দাইল, তরকারী, মাছ, ঘৃত, দধি, ক্ষির, মিষ্টি হইলেই চলিবে না,—বড় বড় খাসী চাই-ই চাই। কোন কোন সমাজে মদ্য এবং সুরাও সরবরাহ করিতে হয়। বৈদিক সময়ে গৃহাগত অতিথিকে বৃষ বা গাভী [অভাবে বড় বোকা পাঁঠা] খাওয়াইতে হইত। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও 'মহাজ' [মহা+অজ=বড় ছাগ, আজকাল পাঁঠা নয়—খাসী] খুব সজোরে চলিতেছে। 'খাসী' না পাইলে বরযাত্রীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

[মন্তব্য—পশ্চিমবঙ্গের রজপুত (রাজপুত), সদ্‌গোপ, কৈবর্ত্ত, আগুরি, সোনার বেণে, দুলে-বাগদী, বাউরি, কাওরা, ধোপা এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক ভদ্রাভদ্র জাতির বৈবাহিক অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া লিখিতে পারিলে খুব মজার এবং শিক্ষাপ্রদ পুস্তক হয়]।

বাসরঘর—বর-কন্যা আহার করিলে মহিলারা উভয়কে বাসরঘরে লইয়া যান। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে কন্যার অধিবাসের ঘরেই বাসরঘর হইয়া থাকে। গোয়ালপাড়াবাসী কোন হিন্দুর বাসরঘরে পশ্চিমবঙ্গের মত অত্যধিক গান, ঠাট্টা এবং তামাসা ইত্যাদির উপদ্রব নাই। কোন কোন বিবাহে সংস্কারের কার্য্যেই রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া যায়। এরূপ স্থলে বর-কন্যার বাসরঘরে অধিকক্ষণ অবস্থান করা ঘটিয়া উঠে না।

কোচবিহার অঞ্চলের ক্ষেণ বা খেন এবং রাজবংশী জাতির বর নিজ নিজ বাটীতে কন্যাকে অনিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন। এরূপ প্রথার কারণ এইরূপ বোধ হয়—প্রাচীনকালে রাজবংশীরাও (১) অন্যান্য পর্ব্বতীয় জাতির মত অশিক্ষিত, অর্দ্ধসভ্য এবং দুর্দ্দান্ত শস্ত্রজীবী ছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের সনাতন প্রথার মতনুবর্ত্তী হইয়া প্রায় ভিন্ন ভিন্ন অথচ

(১) "অধিকারী" উপাধিধারী রাজবংশীরা রাজবংশীদিগের এক প্রকার পৌরোহিত্য এবং গুরুগিরি করেন। ইঁহারা চৈতন্যপন্থী গোস্বামিগণের ও শ্রীশঙ্কর দেবের শিষ্যানুশিষ্যবর্গের এবং কৃপায় শাক্তপ্রধান দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম পাইয়া "অধিকারী" হইয়াছেন।

সমাবস্থ দলে মেয়ে চুরি করিয়া [ছল, বল বা কৌশলপূর্ব্বক হরণ করিয়া] নিজের দলের এলাকায় আনিয়া বিবাহ করিতেন। সেই অভ্যাস (tradition) বা সংস্কারের জন্যই এখনও [অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ] তাঁহাদের সমাজে সেই পুরাতন প্রথা চলিতেছে। এইরূপ বিবাহের প্রথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বযুগে প্রায় যাবতীয় অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য [সুতরাং যুদ্ধজীবী] জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যেও যে রাক্ষস বিবাহের সমাদর এবং প্রচলন ছিল, তাহাও মূলতঃ এইরূপ ছিল। যাহা হউক, বিবাহের পর রাজবংশী জাতির বর-কন্যা 'যোগিনী নিরূপণ' অনুযায়ী একটী ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাহাদের সহিত অন্যান্য স্ত্রী-লোকেরাও সেই ঘরে যান। বর-কন্যা এখানে সাতটী কড়ি লইয়া খেলে এবং এই খেলার পর একই শয্যায় শয়ন করেন। বাসরঘরে সারা রাত্র প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়। রাজবংশীরা এই প্রদীপকে সোহাগ বাতি বলেন। স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীকে প্রথম সোহাগ করা (caressing) উপলক্ষে 'বাতি' জ্বালাইয়া রাখা হয় বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে।

বাসি বিবাহ—গোয়ালপাড়া জেলার শালকোচা প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বিবাহের পর দিন দ্বিপ্রহরে ইহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন সেখানে বাসি বিবাহকে কেশা প্রতিষ্ঠা বা টিকি ধরা বলে। এতদুপলক্ষে কন্যার পিত্রালয়ে আঙ্গিনায় প্রোথিত কদলি বৃক্ষতলে সধবা মহিলারা, বর-কন্যাকে বসাইয়া তাঁহাদের গাত্রে নানা প্রকার অঙ্গরাগ মাখাইয়া নানাবিধ আমোদ-আহ্লাদ, গীত এবং উলুধ্বনির সহিত কলসজল দ্বারা স্নান করাইয়া দেন এবং তাহার পর বর-কন্যাকে পুনরায় বিবাহবেশে সুসজ্জিত ও কন্যার দ্বারা বরকে সপ্তপ্রদক্ষিণ করাইয়া দাঁড় করান। এই সময়ে কন্যাদাতা বর-কন্যার কেশাগ্র একত্র ধরিয়া নানাবিধ পবিত্র দ্রব্য দ্বারা ধৌত এবং ধানের শীষ, সূতার পাঁজি, তিল, তুলসী, হলুদ ও কুশ সহ উভয়ের কেশাগ্র স্পর্শ করিয়া [ইহাকে টিকি ধরা বলে] মন্ত্র

পাঠপূর্ব্বক কিছু দক্ষিণা (সাধ্যমত মোহর, টাকা, সিকি ইত্যাদি) বরের হস্তে দেন। বর সেইগুলি আবার বধূকে দেন। তথায় সূর্য্যার্ঘ্য দান করাও হয় ও কন্যাদাতা বরের কপালে চন্দনাদি নানা দ্রব্যের ফোঁটা দেন। ইহাই হইল বাসি বিবাহ। কোন কোন পরিবারে বাসি বিবাহ কুলপ্রথা-অনুসারে বিবাহ রাত্রিতেই করিতে হয়, পরদিন কেবল স্নান মাত্র বাকী থাকে।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 'বাসি বিবাহের' পর বর-কন্যা জলযোগ করেন। এই দিন দিবাভাগে কন্যাপক্ষের বাটীতে আহারাদির খুব আয়োজন হয়। রাত্রিতে কন্যা-জামাতাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবার পর তাঁহাদিগকে বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য শুভ-বিদায় দেওয়া হয়। তাঁহারা শুভক্ষণে শোভাযাত্রা করিয়া বরের বাটীতে পঁহুছিলে তথায় অত্যন্ত আমোদ-প্রমোদ, স্ত্রী-আচার, যৌতক প্রদান এবং উৎসব-ভোজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শিবসাগর অঞ্চলে পর্ব্বতীয়া গোসাঞীদিগের (২) শিষ্যদিগের মধ্যে বাসি বিবাহটী সম্পূর্ণ সুরুচিসম্মত আচার। কামরূপ জিলার বড়পেটা মহকুমার স্থান বিশেষে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা গোয়ালপাড়ার হিন্দুদিগের অনুকরণে 'বাহি বিয়া' হইয়া থাকে। বাসি বিবাহ বাঙ্গালীদিগের প্রথা বলিয়া গৌহাটী অঞ্চলের অসমীয়া কায়স্থরা ইহার অনুষ্ঠানের যে কিরূপ বিরোধী, নিম্নলিখিত একটী দৃষ্টান্ত হইতে তাহার উপলব্ধি হয়; লেখক নিজে বড়পেটা মহকুমার সরভোগ গ্রামে রায় বাহাদুর শ্রীযুত রজনীকান্ত চৌধুরীর বাটীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের 'বাসি বিবাহ' দেখিয়াছিলেন এবং

(২) পর্ব্বতীয়া গোসাঞী=নদীয়ার মালিপোতার নিকট সিমুলীয়া গ্রামের রাঢ়ী-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ন্যায়বাগীশের নিকট আহোমরাজ রুদ্রসিংহ তান্ত্রিক-মতে গৌহাটীতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি ও ইহার বংশধরগণ কামাখ্যা পাহাড়ে বসবাস করায় পর্ব্বতীয়া গোসাঞী নামে অভিহিত হন।

সেই কথা নলবাড়ীতে মৌজার শ্রীযুত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীকে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। উক্ত রায় বাহাদুর বাঙ্গালীর প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া মৌজাদার মহাশয় অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত তৎক্ষণাৎ বলি-লেন—"তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে।" ইহার কিছুদিন পরে লেখক বিশ্বস্তসূত্রে [নলবাড়ী ও গৌহাটী হইতে] জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ বাসি বিবাহের ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে সামাজিক মনোমালিন্য পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। অতঃপর গৌহাটী হইতে অসমীয়া কায়স্থকুলগৌরব শ্রীযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ঐ বিষয়ের প্রশ্নোত্তরে [৪।৫ খানি পত্র ব্যবহারের পর] লেখককে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গদেশে যে দিন যে সময় বাসি বিবাহ হয়, গৌহাটী অঞ্চলে বরের বাটীতে সেইদিন সে সময় অনুষ্ঠিত ক্রিয়াটী 'বাসি বিয়া' নহে জানিবেন। আমাদের সমাজে [কায়স্থ সমাজে] 'বাহি বিয়া' হয় না। ইহা আমাদের প্রাচীন প্রথা নহে। ভাটী অঞ্চলের বাহি বিয়া উপলক্ষে যে সকল বৈদিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, আমাদের সমাজে বৈবাহিক কার্য্যের শেষভাগে সেই গুলির কতক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বিবাহের পরদিন কিছুই হয় না। কেবল বর-কন্যা বরগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে বরের মাতা [তদাভাবে কোন মাতৃ-স্থানীয়া] তাঁহাদিগকে বরণ করিয়া লইবার পর কতকগুলি স্ত্রী-আচার সম্পন্ন করেন। গৌহাটি অঞ্চলের বাহিরে বড়পেটা অঞ্চলের কামরূপীয় কায়স্থদিগের মধ্যে যদি কেহ 'বাহি বিয়া'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তবে তাহা বাঙ্গালার প্রভাব প্রাপ্ত গোয়ালপাড়ার অনুকরণেই জানিবেন।"

[ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ সূর্য্যাসাবিত্রী সূক্তটি হইতে সেকালের বিবাহের খাঁটি [practical] খবর পাওয়া যায়]।

কালরাত্রি=গোয়ালপাড়া অঞ্চলের হিন্দুরা বঙ্গদেশের প্রথা অনু-যায়ী ইহা পালন করেন না। শ্রীহট্টিয় হিন্দু-সমাজে এবং কোচবিহারে

রাজবংশী জাতির মধ্যে কাল রাত্রির প্রথা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বেহার প্রদেশে ইহাকে মর্য্যাদ বলে। বাঙ্গালা রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বজনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের 'ফুলিয়া' সমাজের রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ এবং ভরদ্বাজ গোত্রের 'ফুলের মুখুটি' বা মুখোপাধ্যায় ছিলেন এবং তিনি আজ হইতে [১৩৩৭বঙ্গাব্দ] প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। কবি কৃত্তিবাস, রাজা দশরথের সহিত তাঁহার তৃতীয় মহিষী সিংহলের রাজকন্যা সুমিত্রা দেবীর বিবাহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতুহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে॥

*   *   *   *   *

গোধূলিতে দুইজনে শুভদৃষ্টি করে।
দোঁহাকার রূপে আলো বসুমতী করে॥

*   *   *   *   *

বাসিবিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ।
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত॥

*   *   *   *   *

বিলম্ব না সহে তাঁর করে ইচ্ছাকার।
রথের 'উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার॥

*   *   *   *   *

বাসিবিয়ার পর দিন হয় কাল কালরাত্তি।
স্ত্রীপুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি॥
কালরাত্রে যে নারীকে করে 'পরশন।
সেই স্ত্রী দুরভগা হয়, না হয় খণ্ডন॥

*   *   *   *   *

হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল রাজার বিষাদ।
কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ॥"

—আদিকাণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা [বঙ্গবাসী ১৩৩২ সালের সংস্করণ]

"বাসি বিয়ার পরদিন কালরাত্রিতে নবদম্পতী পরস্পর মিলিত হইলে বধূ দুর্ভাগা হয়"—বাঙ্গালার এই জনপ্রবাদ যে অতি পুরাতন, তাহা কৃত্তিবাসের উপরি লিখিত বর্ণনা হইতে বিলক্ষণ উপলব্ধ হইতেছে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ফুলশয্যা—গোয়ালপাড়া জেলার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা 'ফুলশয্যা'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোচবিহার (৩) অঞ্চলে কোন জাতির মধ্যে

---

(৩) কোচবিহার—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের অন্তিম পাদে খেণ রাজবংশের পতনের সমসাময়িককালে পশ্চিম কামরূপে কোচরাজবংশের আদি রাজা বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তৎকালে কামরূপে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রভাব চলিতেছিল। মহারাজ বিশ্বসিংহের প্রভাব বশতঃ এই দেশের অনেকগুলি অসভ্য, আরণ্য এবং পর্ব্বতীয় জাতির লোকে ক্রমশঃ আর্য্য বা সভ্য আচার গ্রহণের পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের সময় কোচ, মেচ এবং কচারীগণ—জাতি হিসাবে একই এবং একই সভ্যতার স্তরে অবস্থিত ছিলেন! সেই জন্যই "তুল্য অবস্থার লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ উচিত" এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই সম্ভবত রাজা বিশ্বসিংহ তাঁহাদের গৃহ হইতে কন্যা গ্রহণের আদেশ দিয়াছিলেন [এই পুস্তকের ২১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য]। মহারাজ বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে "রাজ-বংশী" নামক জাতির নাম অথবা পরিচয়ের কোন সংবাদ জানিতে পারা যায় না। যতদূর যানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়—মৌলিক কোচ, মেচজাতির মধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম, সভ্যতা এবং সদাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা উত্তরকালে রাজবংশী জাতির লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

কোচ, মেচ ও রাজবংশী

এই প্রথাটী নাই। কামরূপের বড়পেটা মহকুমার স্থান বিশেষে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এই আচার আছে। এই জেলার অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাটীতে ফুলশয্যার রাত্রিতে কন্যা, বরের পদধৌত করিয়া দেন এবং তৎপরে তাঁহাকে পান-তাম্বূল প্রদান ও প্রণাম করত সে কক্ষ পরিত্যাগ করেন। এইটুকু ভূমিকায় অনুষ্ঠান ব্যতীত বধূ-বরের একই শয্যায় শয়ন করিবার প্রথা কিংবা ফুলশয্যার অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। বিগত ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে গৌহাটীর অন্তর্গত ভরলুমুখ প্রবাসী শ্রীযুত বীরহরি দত্ত বরুয়া, চামটা নিবাসী শ্রীযুত বিহুরাম মজুমদার এবং নলাবাড়ী অঞ্চলের চারিজন অসমীয়া কায়স্থের নিকট জানা গিয়াছিল যে, গৌহাটী মহকুমার কোনও কোনও কায়স্থ পরিবারে কুলক্রমাগত আচারানুসারে ফুলশয্যার রাত্রিতে বধূ-বর এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। মধ্য-আসাম ও উপর আসামের কোন কোন অসমীয়া হিন্দু পরিবারে 'তোলনী বিয়া' [পুষ্পোৎসব] উপলক্ষে ফুলশয্যার আংশিক অনুষ্ঠানস্বরূপ বর-কন্যাকে অন্দর মহলের কোন এক স্থানে [কুসুম সংযুক্ত স্থানে] বসাইয়া "নামতি আইরা" ফুলশয্যার বর্ণনাত্মক গীত গাহিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে বাসর শয্যা ও ফুলশয্যার পরিণাম

বঙ্গদেশে কোনও কোনও বৈবাহিক 'স্ত্রীআচার' কালক্রমে 'অনাচারে পরিণত' হইয়া ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। শাস্ত্রের বিধি উপেক্ষা করিয়া এবং কেবল লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া অন্তঃপুরের অন্তরালে অনুষ্ঠিত 'বাসর গৃহ' এবং 'ফুলশয্যা' প্রভৃতি 'হু-য-ব-র-ল'। (hocus pocus) অনুষ্ঠান নবম অথবা দশম বর্ষেই সেকালে বালিকাদিগের স্বামি-সহবাসের অভ্যাস আরম্ভ করাইয়া দিত এবং ইহার ফলে দ্বাদশ বর্ষে অথবা তাহারও পূর্ব্বে তাহাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে জননীর গুরু দায়িত্ব-ভার নিপতিত হইত। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় এবং অস্বাভাবিক অবস্থা আর কি হইতে পারে!

'ফুলশয্যা' নামক আচারটী আমাদের দেশে [অন্ততঃ কলিকাতার সন্নিহিত চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী এবং নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে] সুপ্রচলিত থাকায় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা দেশের স্বাধীনতার সুখের দিনে স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর যৌবন বিবাহই ভদ্র-সমাজে প্রচলিত ছিল। উপরি উপরি দেখিলে, এই 'ফুলশয্যার' আচারটীকে "বেদবিরোধী অনাচার বিশেষ" বলিয়া মনে হইতে পারে; যেহেতু, আমাদের দেশে বিবাহ রাত্রির পর একদিন, এক রাত্র [অর্থাৎ 'কালরাত্রি'] বাদ দিয়া বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতে ঐ অনুষ্ঠানটি করা হয় এবং নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম সজ্জিত সুন্দর এবং সুকোমল শয্যায় তুল্যরূপ সুরভি কুসুমের নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত এবং চন্দনাদি বিবিধ গন্ধদ্রব্যের দ্বারা সুচর্চ্চিত নবদম্পতি নিভৃতে—[রীতিমত দম্পতির মতই]—শয়ন করেন। বৈদিক গৃহ্যসূত্রগুলি [এবং বাৎস্যায়ণের কাম-সূত্র] একবাক্যে বলিয়াছেন—"নববিবাহিতা দম্পতি বিবাহের পর সমর্থ হইলে [অর্থাৎ অতি প্রবল ইন্দ্রিয়াবেগ বা কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিবার শক্তি রাখিলে] পূর্ণ এক বৎসর দুশ্চর 'অসিধারা ব্রত' বা অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিবেন। তবে যৌবনপ্রাপ্ত নবদম্পতীর মধ্যে কেবল একটী যজ্ঞ-ডুম্বুরের দণ্ড মাত্র—[বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের প্রতীক]—রাখিয়া উভয়ে একই শয্যায় শয়ন করিয়াও পূর্ণ একটী বৎসর অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা [সহস্রের ভিতর একটীও পারেন কিনা, সন্দেহ] সকলের পক্ষে একান্ত অসাধ্য না হইলেও অনেকেরই পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত কঠোর ব্যবস্থার অনুকল্পস্বরূপ ছয় মাস, চারি মাস, এক মাস, বার রাত্রি, ছয় রাত্রি অথবা অন্ততঃ পক্ষে তিন রাত্রি [যে দম্পতির ইন্দ্রিয়সংযমের যতটুকু শক্তি, তাহারই অনুপাতে] ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন আদিষ্ট হইয়াছে। তিন দিন তিন রাত্রির অপেক্ষা ন্যূনতর সময়ের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের [অর্থাৎ, তিন অহোরাত্র গত হইবার

পূর্ব্বে পতি-পত্নীর সহবাসের] কোন আদেশ কোন গৃহ্যসূত্রে নাই। অথচ, বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে বিবাহের রাত্রির পর কেবল একটী মাত্র রাত্রি [উহাকে কালরাত্রি বলিয়া] বাদ দিয়াই ফুলশয্যার অনুষ্ঠান করা হইয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, —"এরূপ ফুলশয্যার অনুষ্ঠানকে আর্য্যশাস্ত্র-সঙ্গত বা বেদাচার-সম্মত সদাচার কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?"

কোনও গৃহ্যসূত্রে তিন রাত্রির অপেক্ষা কম সময়ের জন্য "ব্রহ্মচর্য্য ব্রত" পালনের ব্যবস্থা না পাওয়া গেলেও আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন সদাচার যে, বিবাহিতা কন্যার বয়ঃক্রমের তারতম্যের অনুসারে এই ব্রহ্মচর্য্য পালনের কালেরও ইতরবিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও কোনও সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"বৈদেহেষু সন্তো ব্যবায় এব দৃষ্টঃ" অর্থাৎ, "বিদেহরাজ্যে বা প্রদেশে [প্রাচীন 'মিথিলা' বা আধুনিক তীরহুত' বা উত্তর বিহার বিভাগে] সদ্যঃ বিবাহিতা দম্পতি বিবাহের রাত্রিতেই পরস্পর মিলিত হন, দেখা যায়।" কোনও কোনও বিশেষ সদাচারনিষ্ঠ পণ্ডিত এই সদ্যঃ সদ্যঃ সহবাস করার প্রথাকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, বিবাহকালে কন্যার বয়স যতই হউক না কেন, তাঁহাকে এবং তাঁহার স্বামীকে বিবাহের পর অন্ততঃ অহোরাত্রকাল [বিবাহের পর একটা সম্পূর্ণ দিবারাত্র] ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে। "বিবাহ তত্ত্বার্ণব" সঙ্কলয়িতা শ্রীনাথ চূড়ামণি ব্রহ্মপুরাণের বচন বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় নিজের গ্রন্থে তুলিয়া সেই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন, যথা:—

"অথ তদ্দ্বাদশাহানি ত্রিংশবর্ষেণ সর্ব্বদা।
যদি দ্বাদশবর্ষা স্যাৎ কন্যা রূপগুণান্বিতা॥
দ্বাত্রিংশদ্‌বর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শবার্ষিকী।
লব্ধা তদাহি স্থাতব্যং ষড়্রাত্রং সংযতেন তু॥

বিংশত্যব্দা যদা কন্যা বক্তব্যং তত্র বৈ ত্র্যহম্।
অত ঊর্দ্ধমহোরাত্রং বক্তব্যং সংযতেন তু ॥"

এই তিনটী শ্লোকের মর্ম্মার্থ="যদি ত্রিশ বৎসর বয়সের কোনও বর, রূপগুণান্বিতা—[এখানে 'গুণান্বিতা' শব্দের অর্থ—রজোদর্শনের পর স্বামিসহবাসযোগ্য বয়সপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে]—বারো বৎসরের কোনও কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই দম্পতি বারোদিন বারোরাত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিবেন। যদি বত্রিশ বৎসর বয়স্ক কোনও বর কোনও ষোড়শী কন্যাকে বিবাহ করেন, সে স্থলে ছয় রাত্রি মাত্র সংযম পালন করিলেই হইবে। কন্যার বয়স যদি কুড়ি বৎসর হয়, তাহা হইলে তাহার বরের ব্রহ্মচর্য্য পালনের সীমা তিন রাত্রি। আর যদি কন্যার বয়স বিবাহকালে কুড়ি বৎসরেরও অধিক হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে এক অহোরাত্রিকাল [এক দিন, এক রাত্রি] সংযম পালন করিতে হইবে।"

[ব্রহ্মপুরাণের এই শ্লোক তিনটি দ্বিজ তিন বর্ণের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয় বর্ণের ভিতর প্রাচীন যুগের কোন কালেই শিশু বিবাহের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই; সুতরাং এই শ্লোক তিনটি 'ক্ষত্রিয় বর্ণের উদ্দেশ্যেই রচিত', এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না। হিন্দু স্বাধীনতার এবং হিন্দুসভ্যতার সুবর্ণময় যুগে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ তিন বর্ণের কন্যাদের যে পূর্ণ যৌবনকালে বিবাহ হওয়া কিছুমাত্র বাধা বা নিন্দা ছিল না, স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺শ্রীনাথ চূড়ামণি মহাশয় ব্রহ্মপুরাণের উল্লিখিত শ্লোক তিনটি নিজের বিবাহবিষয়ক নিবন্ধ "বিবাহ তত্ত্বার্ণব" গ্রন্থে তুলিয়া তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ কুড়ি বৎসরেরও অধিক বয়স্কা কন্যাদের বিবাহ দিতেন বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে এদেশের সমাজে বিবাহের পর ঠিক এক অহোরাত্র কাল বাদ দিয়াই ফুলশয্যা অথবা পতি-পত্নী সহবাসের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধঃপতন আসিয়া পড়ায়, কতকগুলি জাতির মধ্যে অতি অকল্যাণজনক এবং সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বনাশকর শিশু বিবাহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল]।

দেখা যাইতেছে যে, ঠিক এক অহোরাত্রকাল সংযমে কাটাইবার

পর আমাদের দেশের নব বিবাহিত দম্পতির ফুলশয্যার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহা হইতে মনে হয় যে, সেকালে কন্যার বয়স কুড়ি পার হওয়ার পরেই বহু ক্ষেত্রেই বিবাহ হইত [যেমন পরে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, মালাবারের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ, ওড়িশার করণ, কণৌজীয়া ব্রাহ্মণ, রাজপুত ইত্যাদি সমাজে চলিতেছে]—এবং সেই জন্যই বিবাহের পরের রাত্রিকেই কালরাত্রি বলিয়া পরিত্যাগ এবং তৃতীয় রাত্রিতে ফুলশয্যার উৎসব প্রবর্তিত হইয়াছিল। সে সময়ে চতুর্থী হোম হয়তো বৈবাহিক হোম বা কুশণ্ডিকার সঙ্গে সঙ্গেই সারিয়া লওয়া হইত। সত্য বটে—যুবক-যুবতীর অনুষ্ঠেয় ফুলশয্যা পরে নিতান্ত অপ-ব্যবহারে পড়িয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে আক্ষেপ এখন করিবারও কারণ নাই, তাহাতে ফলও নাই। নূতন আইনের ব্যবস্থার দ্বারাই যে, রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইয়াছে, তাহা নহে। সামাজিক নর-নারীর শিক্ষা-দীক্ষার এবং সদাচারের আদর্শসমূহের কালোচিত পরিবর্ত্তনের ফলে এবং নানা প্রকার অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক কারণের সমবায়ে সমসাময়িক ভদ্রসমাজে শিশুবিবাহের প্রথা একরূপ লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে।

আচার্য্য সুশ্রুত ভারতীয় নর-নারীর যৌবন প্রাপ্তির, সন্তানোৎপাদনের এবং বিবাহের উপযুক্ত বয়সের সম্বন্ধে কতকগুলি যে অতি মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রত্যেক সামাজিক নর-নারীরই অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ তিনি কত বয়সে সাধারণতঃ পুরুষ এবং নারীর যৌবনোচিত বলবীর্য্যের সমতা ঘটে, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

"পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥"

মর্ম্মার্থ—[প্রশ্ন উঠিয়াছিল—"পুরুষ এবং নারী কি এক প্রকার

বয়সেই তুল্যভাবে যৌবনোচিত শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা এবং বলবীর্য্যের সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ?" রাজর্ষি উত্তর করিলেন—"না, তাহা নহে]--সুবিজ্ঞ বৈদ্যের জানা উচিত, পুরুষেরা পঁচিশ বৎসর বয়সে দেহের এবং মনের যেরূপ অবস্থা এবং যৌবনোচিত বলবীর্য্য প্রাপ্ত হয়, নারীরা ষোল বৎসর বয়সেই সেই রকম দেহ-মনের অবস্থা এবং যৌবনোচিত বলবীর্য্য পাইয়া থাকে।

ইহার পরে, তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন—"অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় ষোড়শবর্ষাং পত্নীমাবহেত। পিত্র্যা ধর্ম্মার্থকাম প্রজাঃ প্রাপ্স্যতী ইতি।" মর্ম্মার্থ—"অতঃপর [রীতিমত বিদ্যালাভের পর] পুত্রের পঁচিশ বৎসর বয়স হইলে ষোড়শবর্ষীয়া কোন সুযোগ্যা বালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিবে। তাহা হইলেই, পুত্র [ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম প্রাপ্ত হইয়া] দেবপূজা এবং পিতৃপূজাদি গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্পাদন এবং উপযুক্ত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।"

ছাপান "সুশ্রুত সংহিতা"র কতকগুলি পুস্তকে "ষোড়শবর্ষাং" কাটিয়া তাহার স্থনে "দ্বাদশ বর্ষীয়াং" ছাপান হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। দেশাচারের অতি ভক্ত কোনও 'পণ্ডিত' পরাশরাদির নামে প্রচলিত [পরন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ] স্মৃতিশাস্ত্রের অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিল রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই অপকর্ম্ম করিয়াছেন—সন্দেহ নাই। এই পরি-বর্ত্তনের দ্বারা কিন্তু সুশ্রুতের উদ্দেশ্যকে চাপা দেওয়ার প্রয়াস সিদ্ধ হয় নাই। যেহেতু, তিনি ষোল বৎসরের কম বয়সের কোনও বালিকার গর্ভাধান করিবার বিরুদ্ধে অতিশয় দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বালিকার গর্ভাধানের উপযুক্ত [অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সহবাসযোগ্য বয়স] বয়স সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট উপদেশ দিতেছেন :—

"ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥

জাতো বা ন চিরং জীবেদ্ জীবেদ্ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাধত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥"

ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকারের ইংরাজী অনুবাদ—If the male before the age of twenty five impregnates the female of less than sixteen years old, the product of conception with either die in the woumb ; or if it is born, it will not be long lived, and even if it lives long, it will be weak in all its organs. Hence the female should not be made to conceive at too early an age (that is, before she attains her sixteenth year at least) [অর্থাৎ রাজর্ষি সুশ্রুত সহবাস সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিতেছেন] "যদি সন্তানের মঙ্গল চাও, কদাপি ষোল বৎসরের কম বয়সের মেয়ের গর্ভাধান করিও না, করিও না।" "বর্ত্তমান কালের য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণও ঠিক তুল্যরূপ উপদেশ দিতেছেন।

[মন্তব্য—বাঙ্গালা দেশে গত দশ বার বৎসর কি তাহারও অধিক কাল লইতে পোনর ষোল বৎসরের আগে ভদ্রঘরের কন্যাদের বিবাহ হয় না বলিলেই চলে। যে সকল তথাকথিত "অর্থদক্ষ" (orthodox) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বাদশ বর্ষ দেশীয় বালিকার গর্ভাধান সংস্কার সম্পাদন করিয়া "ধর্ম্মকে" রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে ইচ্ছা আর ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নানাপ্রকার সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে বালিকার বিবাহোচিত বয়স যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার গতিকে নিরুদ্ধ করার শক্তি কাহারও নাই]।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

পাকস্পর্শ' বা বউভাত, স্ত্রী আচার, কুলাচার অথবা সামজিক একটী শোভন অনুষ্ঠান মাত্র। কোন দূরবর্ত্তী অথবা অপরিচিত ঘর হইতে কন্যা আসিল, তাহার হাতের রান্না ভাত বরের আত্মীয় স্বজন এবং সামাজিক সজ্জনদিগকে খাওয়াইয়া নববিবাহিত বধূ-বরকে সমাজে মিশাইয়া লইতে হয়। প্রাচীনকালে এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশীয় উচ্চ-:শ্রেণীর হিন্দু সমাজে যখন খাওয়া-দাওয়া প্রচুর পরিমাণে মিলিত, পাড়াগাঁয়ের এবং সহরের লোকে সামাজিক কথা লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। কৌলিন্যের ঝাঁক ছিল এবং লোকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য অক্লেশে খাইয়া হজম করিতে পারিত, সে সময়ে কোনও প্রকৃত বা কল্পিত হীনতর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিলে, সমাজের পাণ্ডারা একটা 'ঘুষ' [মর্য্যাদা] না পাইলে অনেকে 'বউভাতের' ভাত পচাইতেন এবং বরের বাপ-মাকে নাকের জলে, চোখের জলে করিয়া ছাড়িতেন।

পাকস্পর্শ বা বউভাত

বাঙ্গালা দেশে সেকালে 'প্রত্যেক 'বৌভাতের' উৎসব উপলক্ষেই সুসজ্জিত নববধূকে কোনও গিন্নিবান্নি আত্মীয়ার সহিত ভোজনশালায় আসিতে হইত এবং নিমন্ত্রিত এবং ভোজনার্থ উপবিষ্ট জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন এবং সামজিক ভদ্রলোকদিগের ভোজন পাত্রে কিছু কিছু অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে হইত; কেবল খুব কচি খুকী বউ হইলেই ভোজনের জন্য প্রস্তুত অন্নাদি স্পর্শ করিলেই বা 'ছুঁইয়া দিলেই' কাজ চলিত। শুধু

সেকালে কেন, বণিয়াদী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে এখনও এই প্রথা চলিতেছে ; কেবল অত্যাধুনিক "ইঙ্গ-বঙ্গ" বা সাহেবীবাঙ্গালী দুই চারি ঘরে এই সনাতন সদাচারেরর ব্যতিক্রম হইয়াছে মাত্র। তথাপি বি-এ, এম্-এ, কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চতর ডিগ্রীধারিণী নব্যা মেয়েকেও বেউভাত উপলক্ষে টক্ টকে আলতা পায় এবং ঝক্‌ঝকে শাড়ী জামা ও গহনা গায়ে ঘোমটা টানিয়া ভাতের থালা হাতে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে রীতিমত পরিবেশন করিতে দেখা গিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে।

একালে প্রায় সকল ভাগ্যবানের ঘরেই "ওড়িয়া ঠাকুরের ভাত" চলিতেছে—'বউভাত' কথার কথা মাত্র হইয়াছে। সহরে যে সকল ঐশর্য্যশালী "বড় মানুষেরা" পাশ্চাত্য সভ্যার অনুকরণ প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও বাটীতে এতদুপলক্ষে 'ডিগ্রী' প্রাপ্ত বধূরা গাউন, 'হুড' এবং ক্যাপ' প্রভৃতি সজ্জায় ভূষিত অথবা ছাটা চুল Bobbed hair), খাটো ঘাগরা (Short shirt) প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া এবং খোজা, বুট প্রভৃতি পরিয়া আসিয়া একবার Dinner Tableএর শোভা সম্পাদ পূর্ব্বক পদ্মহস্তে বিবাহের পিষ্টক (Bridle cake) একখানা ভাঙ্গিয়া দেন—মধ্যে মধ্যে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই—সহরে ও বড় বড় নগরে অধিকাংশ বড়লোকের ঘরে সে কালের ও সকল আপদ চুকিয়া গিয়াছে। আরও ১৫।১৬ বৎসর পরে সম্ভবতঃ বিবাহের প্রথা এবং পুস্তকখানি Archæological কিংবা Anthropological কৌতুহল মাত্র উদ্দীপিত এবং নিবৃত্ত করিবে।

যাহাহউক, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বিবাহের চতুর্থ দিনে বরপক্ষ, জ্ঞাতি ও আত্মীয়বর্গকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং তদুপলক্ষে মৎস, মাংস এবং পরমান্ন প্রভৃতি মুখরোচক বিবিধ খাদ্য দ্রব্যের ভূরি ভোজনের আয়োজন করা হয়। ভোজনের শেষ দিকে অর্থাৎ মৎস্য, মাংসাদি আহারের পরে সুসজ্জিতা নব বধূকে নিমন্ত্রিত সজ্জনসমূহের সম্মুখে একবার আনাইয়া নমস্য ব্যক্তিবৃন্দকে কেবল প্রণাম করান হয়। ইহাকেই এদেশে 'পাকস্পর্শ' বলে। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এই ব্যাপারে কায়স্থাদিরও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে।

গোয়ালপাড় অঞ্চলে বিবাহের অষ্টম দিনে অষ্টমাঙ্গল্য নামে একটী দেশাচার অনুষ্ঠিত হয়। "অষ্টমাঙ্গল্য বঙ্গদেশের সকল সজ্জন সমাজেই প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোনও কোনও স্থানে আছে। উহা বিবাহ-উৎসবের অন্তিম অনুষ্ঠান। এই দেশে অধিবাসের সময় যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়—[অর্থাৎ, বরণ ডালা সাজান, মঙ্গল ঘটস্থাপন, 'আই ও হাঁড়ি' বা 'আগ-হাঁড়ি' এবং শ্রী বা ছিরি প্রস্তুতের অনুষ্ঠান, বর-কন্যার হস্তে মঙ্গল-সূত্র বা কঙ্কণ বাঁধা, ইত্যাদি]—বিবাহের পরের অষ্টম দিবসে ঐ সকল ব্যাপারের 'ইতি' করা হয়। ঐ দিন এয়োরা [আয়ুষ্মতী বা সৌভাগ্যবতী সধবারা] দুধ-আলতা গোলা জলভরা থালায় বর-কন্যা দুই জনেরই হাত রাখিয়া মঙ্গলসূত্র খুলিয়া দেন। অষ্টমঙ্গলার দিন গাঁইটছড়াও খোলা পড়ে। আজকাল অনেক চাকুরীজীবী বর তিন চারি দিনের ছুটি (casual leave) লইয়া বিবাহ করেন এবং তিনি বিবাহের ত্রিরাত্রের পর বা মধ্যেই বাধ্য হইয়া কার্য্যস্থলে দৌড় দিতে বাধ্য হন। একারণ—অনেক আবশ্যক আচার, অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রীয় সংস্কারাদিই যথাযথ সুসম্পন্ন হইতে পারে না—তাই "অষ্ট-মঙ্গল"ও মৃতপ্রায় হইয়াছে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে এই অষ্টমাঙ্গল্য আচারের উপলক্ষে কন্যাপক্ষ, বরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পিষ্টক, লাড্ডু, আট প্রকার বড়া ভাজা ইত্যাদি খাওয়ান। এই প্রথার আনুষঙ্গিক কিছু কিছু স্ত্রীআচারও আছে। এই দিন বরের মণিবন্ধের লাল সূতা [কঙ্কণ] মোচন করা হয়। অষ্ট মাঙ্গল্যের পর পথ ফিরাণি খাওয়া হয়। ইহাও দেশাচার। তদুপলক্ষে বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ উভয়, উভয়কে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান।

অষ্টমাঙ্গল্য ও পথ ফিরাণি খাওয়া

[উল্লিখিত স্ত্রী আচারগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দেশ, কাল এবং পাত্র ভেদে এইগুলির অল্পস্বল্প তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

কামস্তুতি

ত্রিংশ অধ্যায়

কামস্তুতির অর্থ কামদেবের স্তব বা স্তোত্র। কামের অপর নাম প্রজাপতি [সৃষ্টিকর্ত্তা]। গৃহীর ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ পত্নী-মূলক। পত্নী, গৃহীর ত্রিবর্গের সহায়। বিবাহের পূর্ব্বে পত্নীর যে সময় কন্যাভাব থাকে, যে সময়ে কাম বা প্রজাপতিই তাহার অধিদেবতা বা অভিভাবক থাকেন। সেই জন্যই বিবাহের কন্যার অধিষ্ঠাতা দেব প্রজাপতি। কামস্তুতির অন্তস্তলে অতি গভীর বৈদিক রহস্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতির হৃদয়ে কামের বা সৃষ্টি-বাসনার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহার মনে "প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক আমি বহুতে প্রতিভাসিত হইব" এই সংকল্প জাগিয়া উঠিয়াছিল। কি কারণে বরকর্ত্তৃক দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের দেহেন্দ্রিয় সঞ্জাত কামের স্তব পঠিত হইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পরে বলিব।

বিবাহে কন্যাকর্ত্তা, কন্যার, নিজের, নিজের পিতার, পিতামহের এবং অপর পক্ষে বরের ও তাঁহার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের নাম গোত্র এবং প্রবরাদি যথারীতি তিনবার করিয়া উল্লেখ করত "সালঙ্কারাং বাসযুগ্মাচ্ছাদিতাং প্রজাপতি দেবতাকাং অমুকনাম্নীং এনাং কন্যাং ভার্য্যাত্বেন তুভ্যমহং সম্প্রদদে"—[দুই খানি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিতা, নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা সুভূষিতা এবং প্রজাপতি যাহার অধিষ্ঠাতা দেব, অমুক নাম্নী এই কন্যাকে তোমার সহধর্ম্মিণী হইবার উদ্দেশ্যে আমি মন্ত্রদান করিতেছি] এই বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব গৃহীত ফল-কুশ-তিল-জল সহিত কন্যার দক্ষিণ হস্ত বরের দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিবার পর, বর তাহা

'স্বস্তি' * এই বাক্য উচ্চারণ করত দান গ্রহণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই দান গ্রহণের পর গায়ত্রীমন্ত্র এবং "কামস্তুতি" মন্ত্রপাঠ করিবার ব্যবস্থা বঙ্গদেশীয় ঋক্, সাম এবং যজুর্ব্বেদীয় তিনজন পদ্ধতিকারই নিজ নিজ ব্যবস্থা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে [যজুর্ব্বেদীয়] পশুপতি এবং [সামবেদীয়] ভট্ট ভবদেব প্রকৃত 'কামস্তুতি' মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঋগ্‌বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রটী [পশুপতির 'জ্যায়ান্' ভ্রাতা হলায়ুধ পণ্ডিতও উহা তদীয় "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক নিবন্ধে অধ্যাহার করিয়াছেন] পাঠ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা :—

"ওঁ দ্যৌ স্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু।"

—আশ্বলায়ন ৫।১৩।১৪। হলায়ুধ পণ্ডিতের ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব-ধৃত

[ব্রহ্ম বা দ্যৌঃ যেমন জগতের পিতা, কন্যার পিতাও সেই দ্যৌঃ বা ব্রহ্মস্বরূপ। দ্যৌঃ হইতে বৃষ্টিধারা ক্ষরিত হইয়া সর্ব্ব ভূতের আশ্রয় পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে॥ এস্থলে সেই বৃষ্টিধারারূপ দ্রব্যের দাতা দ্যৌঃ এবং গ্রহীতা পৃথিবী। বিবাহকালে বর সেই পরমতত্ত্ব স্মরণে রাখিয়া সম্প্রদত্তা কন্যাকে সম্বোধন করত বলিতেছেন—"হে কন্যে আধারভূতা পৃথিবীস্বরূপ তোমার ভবিষ্যৎ অশ্রয়স্বরূপ আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি"]।

তাহার পর "কামস্তুতি" পড়িবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় তিনখানি পদ্ধতি হইতেই উহা সঙ্কলিত হইতেছে। তন্মধ্যে পশুপতি পণ্ডিতের পদ্ধতি পুস্তকে [যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর গৃহ্যসূত্রানুগত-পদ্ধতি] ধৃত কামস্তুতি এইরূপ, যথা :—

১। "ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ। কামো-দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে।"—বাজসনেয়ী সংহিতা ৭।৪৮॥

ভট্টভবদেবের সঙ্কলিত [সামবেদীয় গোভিল গৃহ্যসূত্রানুগত] পদ্ধতি পুস্তকে ধৃত 'কামস্তুতি' এইরূপ, যথা :—

---

* স্বস্তি=সু+অস্তি=শুভ হউক। ইহা হিব্রু Amen এবং ইসলাম Ameen শব্দের ন্যায়।

২। ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।”

কালেশি ভট্টাচার্য্যের সঙ্কলিত [ঋগ্‌বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রানুগত] পদ্ধতি পুস্তকে ধৃত কামস্তুতি এইরূপ যথা :—

৩। “ওঁ কোঽদাদিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ কামো দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ কন্যাগ্রহণে বিনিয়োগ :—ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে বৃষ্টিরসি দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী প্রতিগৃহ্লাতু।”

উল্লিখিত তিনটী পদ্ধতির তিনটী কামস্তুতির মর্ম্মানুবাদ যথাক্রমে লিখিত হইল, যথা :—

১। [পশুপতি]—(প্রশ্ন) কে এই কন্যাকে দান করিলেন? কাহাকে দান করিলেন? কে-ই বা তাহাকে গ্রহণ করিলেন? (উত্তর) কামই দান করিলেন, কামকেই দান করিলেন। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা; এই দ্রব্য [কন্যা], হে কাম, তোমারই।

২। [ভবদেব]—(প্রশ্ন) কে এই কন্যাকে দান করিলেন? কাহাকে দান করিলেন? কে-ই বা তাহাকে গ্রহণ করিলেন? (উত্তর) কাম, কামকেই দান করিলেন; কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা; কাম সমুদ্রকে আশ্রয় করিলেন। হে কন্যে, কামের ইচ্ছাতেই তোমাকে আমি গ্রহণ করিতেছি; হে কাম, এই দ্রব্য [কন্যা] তোমারই।

৩। [কালেশি পণ্ডিত]—“কঃ অদাৎ” এই মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, দেবতা কাম, বৃহতীচ্ছন্দ এবং কন্যাগ্রহণে বিনিযুক্ত হইতেছে :—(প্রশ্ন) কে এই কন্যাকে দান করিলেন? কে-ই বা তাহাকে গ্রহণ করিলেন? (উত্তর) কাম, কামকেই দান করিলেন; কামই দাতা, কামই প্রতি-

গ্রহীতা ; কাম সমুদ্রকে আশ্রয় করিলেন। হে কন্যে, কামের ইচ্ছাতেই তোমাকে আমি গ্রহণ করিতেছি। হে কাম, এই দ্রব্য [কন্যা] তোমারই ; হে কন্যে, তুমি [কামের] বৃষ্টিধারা সদৃশ, দ্যৌঃ [ব্রহ্ম বা আকাশ] তোমাকে দান করুন এবং পৃথিবী [বৃষ্টিধারার এবং তোমার আশ্রয়স্বরূপ আমার অন্তরাত্মা] তোমাকে গ্রহণ করুন।

আমাদের যাবতীয় শাস্ত্র অদ্বয় ব্রহ্মবাদের দ্বারা ওতঃপ্রোতোরূপে পরিপূরিত। জগতের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের যেরূপ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত স্বাধীন সত্তা নাই। তদ্রূপ 'আমি', 'তুমি' প্রভৃতি ভিন্ন উপাধি দ্বারা পরিচিত ব্যষ্টি জীবাত্মারও কোন স্বাধীন সত্তা নাই, সকলেই সেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্তায় সত্তাবান্ মাত্র। যাহাতে কোনও মানুষের মনে কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমান না জন্মে, যাহাতে কাহারও মনে "আমি দাতা" "আমি ভোক্তা" "আমি কর্ত্তা" ইত্যাকার অহঙ্কারের উদ্রেক না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, এই শুভ-বিবাহে, ঋষি এই 'কামস্তুতি' পাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বিবাহ-ব্যাপারে ব্রহ্মস্বরূপ কাম বা প্রজাপতি, কন্যাদাতা এবং কন্যাগ্রহীতা উভয়েরই প্রেরক। তাঁহার প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়া একজন সংসার পাতিতেছে এবং অন্যজন সংসার বন্ধনের মূলীভূত কন্যা [নারী]কে দান করিতেছে। যাহাতে দাতার মনে দানের কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং গ্রহীতার প্রতিগ্রহণ-জনিত [লোভজনিত] কোনও দোষ বা পাপ না জন্মে, সেই হেতু বর কর্ত্তৃক দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের দেহেন্দ্রিয়সঞ্জাত কামের স্তব পঠিত হইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

সংস্কার

একত্রিংশ অধ্যায়

হিন্দুদিগের মতে বিবাহ-বন্ধন বৈষয়িক চুক্তিমূলক (based on civil contract) নহে ; পরন্তু উহা গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন এবং উপনয়ন প্রভৃতির মত একটী বিশেষ সংস্কার [sacrament]। 'সম্' উপসর্গের যোগে 'কৃ' ধাতুর উপর ভাবে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সংস্কার শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার সাধারণ অর্থ—শুদ্ধিকরণ বা শোধন, শুদ্ধি, সুগন্ধ অথবা সজ্জিত করণ, মার্জ্জন বা নির্ম্মলীকরণ, জীর্ণোদ্ধার [মেরামত করা], পূর্ব্বজন্মের বা অতীত কালের স্মৃতি, শাস্ত্রাভ্যাস জনিত ব্যুৎপত্তি এবং মন্ত্র দ্বারা শোধন, ইত্যাদি।

মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, যাঁহাদের গর্ভাধান হইতে শ্মশানের অন্তিম কার্য্য পর্য্যন্ত ধর্ম্মকর্ম্ম [সংস্কার]গুলি বৈদিক মন্ত্রপাঠ সহকারে করা হইয়া থাকে, তাঁহার সঙ্কলিত সংহিতায় উপদিষ্ট ধর্ম্মকর্ম্মে কেবল তাঁহাদেরই অধিকার আছে, আর কাহারও নাই। দ্বিজ মাত্রেরই জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য বা পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ। মানবের দেহ এবং মনের মলশোধন এবং জীবাত্মাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করাই সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য। মাতাপিতার কর্ম্মফলজনিত যে সকল পাপ বা অশুদ্ধতা সন্তান-সন্ততির দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে, সেইগুলি শিশুর শরীর এবং মন হইতে বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে বৈদিক মন্ত্রপাঠসমন্বিত গর্ভাধান, পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন—এই তিনটি

গার্ভসংস্কার (১) [গর্ভাবস্থায় আচরিত সংস্কার] এবং জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন—এই ছয়টী শৈশব এবং বাল্য-সংস্কার এবং গুরুগৃহে বাস, বেদপাঠ, সমাবর্ত্তন ও গোদান বা কেশান্ত কার্য্যের পর যৌবন-সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়।

কন্যার রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্বে যে বিবাহ হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা [scheme] সামবেদীয় গৃহ্যকার গোভিল মুনি [তাঁহার পুত্র ও শিষ্যাদি] ভিন্ন আর কোনও প্রাচীন গৃহ্যকার মুনি ঋষি করেন নাই। পরন্তু বিবাহের পর তিন অহোরাত্র অতীত হইলে চতুর্থ রাত্রিতে যে চতুর্থীকর্ম্ম [চতুর্থী হোম এবং উপসংবেশন বা স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সহবাস] সম্পাদন করিবার বিধি প্রত্যেক গৃহ্যসূত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার পদ্ধতি পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সহবাসের পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত হোম নামক অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি দেবতার উদ্দেশ্যে [বিবাহিতা বালিকার দেহের পাপস্খলন করিবার জন্য] কতকগুলি আহুতি দিতে হয়। অরজস্কা বালিকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইবার পর [এবং গোভিল গৃহ্যসূত্রের প্রশংসাত্মক (recommendatory) উপদেশের অনুসারে অরজস্কা বালিকার বিবাহ হইলে] উহার আদ্য-ঋতুর পরই [যদিও আয়ুঃশাস্ত্রের অন্যতম আচার্য্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতের এবং আধুনিক য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে এরূপ কার্য্য মাতা এবং সন্তানের উভয়ের পক্ষেই অতিশয় হানিজনক] গর্ভাধান সংস্কার করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রেও গর্ভাধানের পূর্ব্বে উক্ত "চতুর্থীকর্ম্মের" উপদিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি করিতে হয়। অবিবাহিতা

বিবাহের পূর্ব্বে রজঃ দর্শন হইলে প্রাচীন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা

(১) গার্ভসংস্কার—'গর্ভ' শব্দের অর্থ "গর্ভস্থ ভ্রূণ বা শিশু"। শিশুর গর্ভবাসকালে তাহার দেহের পাপ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে গর্ভাধান, পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন—এই তিনটী সংস্কার করা হয়, ইহাদিগকেই 'গার্ভসংস্কার' বলে।

অবস্থায় কোনও বালিকা রজোদর্শন করিলে তাহার কোনও পাপ হইবার সঙ্কেত পর্য্যন্ত প্রাচীন কোনও গৃহ্যসূত্রে অথবা মনুসংহিতাতেও নাই। ঋগ্-বেদীয় গৃহ্যকার মহর্ষি আশ্বলায়ন এবং যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্যকার মহামুনি পারস্করাচার্য্য উভয়ে নারীর যৌবন-বিবাহ মাত্রই অনুমোদন করায় তাঁহাদের উপদিষ্ট চতুর্থীকর্ম্মের [যদি বিবাহিতা বালার রজোদর্শনের পর ষোড়শ নিশা বা ঋতুকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে,—এবং সাধারণতঃ এইরূপ কাল বুঝিয়াই বিবাহের দিন স্থির করা হইত] সহিতই গর্ভাধান সংস্কার একযোগে সম্পন্ন হইত এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের মধ্যে কেহই পৃথগ্ ভাবে গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা করেন নাই। তবে, যদি কোনও বালিকার বিবাহ সংস্কার সম্পাদনের সময়ে [সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা, লাজহোম, সপ্তপদী গমন প্রভৃতি কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই] সহসা রজঃপ্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে তাহাকে বস্ত্রত্যাগ এবং নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া ও বৈবাহিক অগ্নিতে যুঞ্জান নামক আহুতি দেওয়াইয়া উপস্থিত সংস্কারের কার্য্য নিষ্পন্ন করা হইত।

বৈদিক সংস্কারে দ্বিজ তিন বর্ণের সমান অধিকার, কিন্তু ঐ সংস্কারগুলির কোনটীতেই শূদ্রের অধিকার নাই। শূদ্রের পক্ষে বৈদিক মন্ত্রপাঠসহ কৃত নিত্য বা নৈমিত্তিক কোন কার্য্যই ব্যবস্থিত হয় নাই দ্বিজেরা যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শূদ্র স্বয়ং [তাহার পুরোহিত নাই, হইতেও পারে না] নীরবে [মন্ত্র না পড়িয়া] সেই কর্ম্মগুলির অনুকরণ করিতে পারেন,—তাঁহার অধিকার এই পর্য্যন্ত। "শূদ্রের কোন সংস্কারে অধিকার নাই", শ্রীভগবানের স্বরূপ মনু মহারাজের এই বাণী শূদ্রের প্রতি দ্বেষসূচক নহে। ইহার শাস্ত্রসঙ্গত কারণ এই ঃ—"বহু জন্মার্জ্জিত কুকর্ম্মের ফলে জীবাত্মা একান্ত তমোগুণ প্রবল শূদ্রজন্ম লাভ করিয়া থাকে; তমোগুণসর্ব্বস্ব শূদ্রের শরীর [শরীরী জীবাত্মা] এরূপ গাঢ় পাপ কালিমায় আচ্ছন্ন থাকে যে,

সেই জন্মে মনুষ্যসাধ্য কোন সংস্কারের সাহায্যে তাহাকে একেবারে নির্ম্মল, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করিয়া তুলা যায় না। শূদ্রের পক্ষে স্ববর্ণোচিত শুভ-কর্ম্মের দ্বারা তাহার তমোগুণের হ্রাস এবং রজোগুণের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে ভবিষ্য জীবনে সে দ্বিজবর্ণে প্রবেশ লাভ এবং তন্নিবন্ধন বৈদিক সংস্কারের যোগ্যতা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তান্ত্রিক সংস্কারে কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত যাবতীয় জাতির নরনারীই [তিনি মুসলমান, খৃষ্টান বা যাহাই হউন] সমান এবং সম্পূর্ণ অধিকার আছে। উপনয়ন এবং বেদারম্ভ প্রভৃতি বৈদিক সংস্কারের দ্বারা দ্বিজগণের যেরূপ স্ববর্ণোচিত বেদ-বিহিত কর্ম্মে অধিকার জন্মে, তান্ত্রিকী দীক্ষাও তান্ত্রিকী সংস্কার লাভের পর নরনারী ঠিক সেইরূপই তান্ত্রিক কার্য্যের অধিকার পাইয়া থাকেন। তান্ত্রিকী দীক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কোন ব্রাহ্মণ নিজের বা পরের 'কালী' 'তারা' প্রভৃতি মহাবিদ্যার মহাপূজা করিতে পারেন না। 'দীক্ষা'র উপর 'অভিষেক', 'পূর্ণাভিষেক' এবং 'সন্ন্যাস' নামে আরও কয়েকটি তান্ত্রিক সংস্কার আছে। যাহা-হউক বৈদিক পদ্ধতির পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক মতে শুধু 'বিবাহ' কেন—দ্বিজ তিন বর্ণের দশবিধ সংস্কার এবং শূদ্র ও মিশ্র বা সঙ্কর বর্ণের উপনয়ন ব্যতীত অন্য নয়টি সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছে, যথা :—

তান্ত্রিক সংস্কার মধ্যে বিবাহ-সংস্কার

শ্রীসদাশিব উবাচ—

"সংস্কারং বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
না সংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মনি॥"
অতো বিপ্রাদিভির্বর্ণৈঃ স্ব স্ববর্ণোক্ত সংস্ক্রিয়া।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্রহিতেপ্সুভিঃ ॥৩
জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।

জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃ পরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥৪
শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে।
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশস্মৃতাঃ ॥৫

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, পূর্ব্বখণ্ড, নবম উল্লাস [বঙ্গবাসী]

বঙ্গানুবাদ = শ্রীসদাশিব দেবীকে বলিলেন,—হে দেবি, সংস্কার ভিন্ন দেহশুদ্ধি হয় না; অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারে না। এই হেতু ইহলোকে এবং পরলোকে হিতাভিলাষী বিপ্রাদি সর্ব্ববর্ণের সর্ব্বথা বহু প্রযত্নের সহিত স্ব স্ব বর্ণবিহিত সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ—এই দশবিধ সংস্কার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। শূদ্র জাতির এবং শূদ্রা ভিন্ন সামান্য জাতির [মিশ্র বা সঙ্কর জাতির] উপনয়ন নাই; তাহাদের [উপনয়ন ব্যতীত] নয়টী সংস্কার এবং দ্বিজগণের [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের] দশ সংস্কার উপদিষ্ট হইয়াছে।

[এই তন্ত্রের উপদেশ এবং মন্বাদি স্মৃতির উপদেশ দ্বিজগণের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে তুল্যরূপ; কেবল শূদ্রের পক্ষে ব্যতিরেক ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে]

তান্ত্রিক সংস্কারেও কুশণ্ডিকা হোম এবং অন্যান্য সামান্য [common] এবং বিশেষ [special] বিধান, হোমের মন্ত্র, সমিধ্, সংস্কারের মন্ত্র প্রায় সমস্তই বৈদিক সংস্কারেরই অনুরূপ; কেবল কার্য্যের কতকগুলি পদ্ধতি [procedure] বিভিন্ন মাত্র। তান্ত্রিকী পদ্ধতিতে সংস্কারের কার্য্যগুলি করিতে হয়, এইমাত্র প্রভেদ। তান্ত্রিক মতে [মহানির্ব্বাণতন্ত্র নবম উল্লাস দ্রষ্টব্য] শূদ্রগণের সংস্কার অমন্ত্রকই হইবে, যথা:—

"শূদ্র সামান্য জাতীনাং সর্ব্বমেতদমন্ত্রকম্ ॥"১৮৫

বিবাহ সংস্কারের পদ্ধতিও তন্ত্রশাস্ত্র ঠিক বৈদিক গৃহ্যসূত্রের উপদিষ্ট পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কেবল বিবাহ রাত্রিতে হইবে এই ভিন্নতা আছে। [বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিবাভাগে হওয়াই

বিহিত,—রাত্রিকালে কেবল গর্ভাধান এবং জাতকর্ম্ম হইতে পারে, তদ্ভিন্ন বৈদিক কার্য্য রাত্রিতে হয় না ;—বাঙ্গলাদেশে তন্ত্রের প্রাধান্য বশতঃ রাত্রিতে বিবাহ হইয়া থাকে]। আর একটী বিশিষ্টতা এই যে, বেদেরও শাখাভেদ অনুসারে পদ্ধতির ভেদ নাই।

তন্ত্রের আজ্ঞা এই যে, এইরূপে হোম ও মন্ত্রপাঠ [কুশণ্ডিকা কৃত] সহ কৃত যে বিবাহ তাহাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলে, এবং এইরূপ বিবাহজাত পুত্র থাকিতে শৈব বিবাহ জাত পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না। এই বিবাহে সবর্ণা বা সমান জাতীয়া এবং কুমারী কন্যা [ঠিক বৈদিক পদ্ধতির মত] অবশ্যই চাই,—শৈব বিবাহ অসমান জাতীয়া, সধবা [পতিপরিত্যক্তা] অথবা বিধবা যে কোনও স্ত্রীর সহিতই হইতে পারে এবং ঐরূপ বিবাহজাত সন্তান পিতার বা মাতার জাতি না পাইয়া 'সামান্য' (common) সঙ্কর (mixed) অথবা 'পঞ্চম' (the fifth) জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের পাশ্চমস্থ প্রদেশসমূহে [যেমন মদ্র, কেকয়, পারসীক, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে], উত্তর আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ য়ুরোপেও তান্ত্রিকী দীক্ষা, অভিষেক এবং মহাভিষেকের মত অনেকগুলি "সংস্কারাত্মক" আচার প্রচলিত ছিল। এই সংস্কারগুলিকে পরবর্ত্তিকালে য়ুরোপীয়েরা Mystery, Initiation Communion এবং Sacrament প্রভৃতি শব্দের দ্বারা পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। বাহ্লীক এবং মদ্র-পারসিকাদি হইতে গ্রীক ও রোমক দেশে মিত্র দেবের [যিনি সূর্য্যের নামান্তর—পারসিক মিথ্র, লাটিন sol, গ্রীক Helios] এবং ব্যাবিলন, এসিরীয়া, প্যালেষ্টাইন, প্রভৃতি যাবতীয় পাশ্চাত্য দেশে সেই সূর্য্যদেবের এবং মহাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন নামে [Ishtar (ইশ্‌তার), Ashtoreth (আশ্‌তোরেথ), Ardri অথবা Ardri Sura (আদ্রীসুরা), Anahita (অনাহিতা) প্রভৃতি নামে ধর্ম্মদীক্ষা বা Mystery

প্রচলিত ছিল। মিসরে উহাই Osiris এবং Jsisএর Mystery; Phrygia (২) প্রদেশে উহা কাইবিল (Cybele) বা 'রীয়া' (Rhea) নাম্নী মহাদেবীর Mystery নামে পরিচিত ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ Mysteryগুলি আমাদের দেশের পাশুপত, হাদিমত প্রভৃতি নানাবিধ তান্ত্রিক মতের গুঢ় সংস্কারাত্মক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ বিষয়ের বিস্তৃতভাবে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, একদিকে আমাদের দেশের অগাধ অপার আগম, ডামর, এবং যামল প্রভৃতি প্রভৃতি শ্রেণীর নানাবিধ তান্ত্রিক শাস্ত্রগ্রন্থ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ য়ুরোপের [including the Mediterranian Islands) প্রচলিত প্রাচীন কালটুস্ [Cultus—ধর্ম্মরীতি বা পূজারীতি] বা "বরিবস্যা রহস্য" প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ রীতিমতভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়। দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বজনমান্য একখানি 'তন্ত্রগ্রন্থ' [ইহার নামের অর্থ Mystery of worship of the Goddess] এখনও বর্ত্তমান আছে। উত্তর য়ুরোপের Nordic (৩) জাতির এবং প্রাচীন Druid সম্প্রদায়ের তন্ত্রেও 'সংস্কারের' বহু গুহ্য বৃত্তান্ত নিহিত আছে। Dr. Fraser জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে "Golden Bough" নামে যে অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী সঙ্কলন করিয়াছেন, উহাতে এই বিষয়ে অনেক কথা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত আছে।

['পাশুপত' মত=ইহা প্রাচীনকালে কাশ্মীর রাজ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। শ্রীমহাদেব বা শিবকেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের মূলকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া শৈবমতে তাঁহার পূজার্চ্চনা এবং সাধনভজন এবং তদ্দ্বারা ইহলোকে ঐশ্বর্য্য এবং পরলোকে মোক্ষলাভ করাই পাশুপত মতের প্রধান উদ্দেশ্য। আনন্দ গিরি প্রণীত শ্রীশঙ্করদিগ্বিজয়ে এই মতের এবং তন্মতাবলম্বিগণের আচার ও বেশভূষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 'কাদিমত' এবং

---

(২) Phrygia or Pontuo was situated on the south coast of Black Sea [এখন এসিয়া মাইনর নামেই পরিচিত]।

(৩) Nordic—কাহারও কাহারও মতে আর্য্য জাতি, এই জাতির শাখাসম্ভূত।

'হাদিমত' = ইহা তন্ত্রশাস্ত্রের শাখাসম্মত সংহিতা অথবা পদ্ধতি বিশেষ। দক্ষিণাপথের স্থানে স্থানে এই সকল মতের শাস্ত্র এবং সাধকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের পরিধি এত বিশাল যে, আমার (লেখকের) মত মূর্খ লোকের পক্ষে উহাদের বিস্তৃত দূরে থাকুক, নামমাত্র পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব]

ভগবান শ্রীঈশা মসীহ [যীশুখৃষ্ট] প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের 'সংস্কার' গুলিকে সমন্বয় করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট সুসমাচার [Gospelএ] খৃষ্টান-দিগের অবশ্য গ্রহণীয় দুইটী সংস্কার [দীক্ষাস্নান—Baptism এবং খ্রীষ্টের অন্তিম প্রসাদ গ্রহণ—Eucharist] ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান সম্প্রদায় 'সংস্কার'কে Sacrament বলেন। Roman Catholic এবং Greek Churchesএর মতে Sacrament সাতটী, যথা ঃ—১। Baptism, ২। The Lord's Supper or the Eucharist, ৩। Confer mation [ধর্ম্মে নিশ্চল আস্থাস্থাপন], ৪। Penance [পাপ স্বীকার ও প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ] ৫। Holy orders [সন্ন্যাস গ্রহণ], ৬। Matrimoney [বিবাহ] এবং ৭। Extreme Unction [মৃত্যু শয্যায় তৈলাভিষেক গ্রহণ] Protestant church এর মতে প্রথম দুইটী [Baptism এবং Eucharist] সংস্কারই অবশ্য গ্রহণীয়। রোমান ক্যাথ-লিক্ খৃষ্টানগণের মতে 'বিবাহ'ও একটী Sacrament [সংস্কার] হওয়ায় তাঁহাদের সম্প্রদায়ে Divorce [বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ] একেবারে নিষিদ্ধ।

আমাদের দেশের বৌদ্ধ এবং জৈনাদি সম্প্রদায়েরও নিজস্ব 'সংস্কার' আছে এবং বিদেশী যাহুদী এবং মুসলমান সম্প্রদায়েরও (৪) 'খাতনা'

(৪) মুসলমানরা ১। ইমাম, ২। নামাজ, ৩। রোজা, ৪। হজ এবং ৫। জাকাত —এই পাঁচটীকে 'পঞ্চ আরকাণ' অর্থাৎ তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল স্তম্ভ বলেন। নামাজের অঙ্গ বিশেষের নাম 'অজু'। আমাদের শ্রুতি [বেদ] ও স্মৃতির অনুরূপ শাস্ত্র মুসলমানদিগের 'কোরাণ' ও 'হদিস'। তাঁহারা হাজরৎ আব্রাহামের কোরমানী স্মরণ করিয়া এই দুই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পশু 'জবেহ' বা 'জবাই' [আড়াই পোঁচ বলিদান] করেন।

[ত্বক্‌চ্ছেদ] আদি বিশেষ বিশেষ নিজস্ব সংস্কার আছে। যাহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'ত্বকচ্ছেদ [circumcision] প্রচলিত রহিয়াছে। যীশুখৃষ্টেরও এই সংস্কারটী হইয়াছিল এবং ১লা জানুয়ারী এই জন্য একটী খৃষ্টান্ পর্ব্বদিন বলিয়া গণ্য। সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে কোথাও এরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই, যাঁহাদের নিজস্ব কোনও না কোনও সংস্কার বিদ্যমান নাই।

সংস্কারসমূহের সাহায্যে মনুষ্য দেহ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে গর্ভাধানাদি যে দশবিধ সংস্কার দ্বিজ সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, বিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রধান এবং অন্তিম সংস্কার। বৈদিক গৃহ্যসূত্রাবলী এবং তদনুগত পদ্ধতিগুলির মতে দশবিধ সংস্কারের প্রত্যেকটীই স্ব স্ব প্রধান এবং অবশ্য কর্ত্তব্য; কেহই অবহেলার যোগ্য নহে। কোন শাস্ত্রকার বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত [তিনি যে 'বেদীয়' হউন] 'বিবাহ'কে প্রধান সংস্কার বলিতে পারেন না; তবে পত্নী গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান সাহায্যকারিণী বা সহধর্ম্মিনী বলিয়া সেই পত্নী সংগ্রহের মূলস্বরূপ বিবাহকে গৃহীর প্রথম বা প্রধান সংস্কার বলা যাইতে পারে।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা নারীদিগের বিবাহ ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় সংস্কারই অমন্ত্রক [মন্ত্রপাঠ না করিয়াই] সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিবাহ সংস্কার সমন্ত্রক করিতে হয়। এই বিশিষ্টতার জন্য বিবাহকে নারীদিগের প্রধান সংস্কার বলিলে দোষ হয় না। বিশেষতঃ নারীদিগের বিবাহকে মন্বাদি ঋষিগণ পুরুষের 'উপনয়ন' সংস্কারের সমাবস্থ বলিয়াছেন। বালিকারা বিবাহের পরে স্বামীর সহধর্ম্মিনী স্বরূপে [অথবা 'বিধবা' হইলে একা] স্ত্রীজনোচিত ধর্ম্ম-কর্ম্মে অধিকার পাইয়া থাকে। এইজন্য, সামাজিক আচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবিবাহিতা কন্যা দেব-দেবীর ভোগের, পিতৃযজ্ঞের এবং ব্রহ্ম-

ভোজের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে পারে না, এবং শুনিতেও পাওয়া যায়—"বিবাহ না হইলে মেয়ে-মানুষের হাতের জল শুদ্ধ হয় না।"

শূদ্রবর্ণের অথবা শূদ্রাচারী সমাজেও বিবাহকে যে একমাত্র বা প্রধানতম সংস্কার বলা যাইতে পারে, তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত সাঁওতাল, কোল, ভূমিজ, মুণ্ডা এবং ওরাওঁ প্রভৃতি রাঢ় দেশের [পৌরাণিক সুহ্ম দেশের] পশ্চিম এবং উত্তর প্রান্তের অধিবাসীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল জাতির বালিকাগণ বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কোনও জাতির ভাত খায়; কিন্তু, বিবাহ হওয়ার পরক্ষণ হইতেই আর তাহা স্বজাতির ভিন্ন কোনও জাতির [এমন কি ব্রাহ্মণেরও] ভাত খায় না। আরও, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ সকল জাতির কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীগণের পরস্পর মেলামেশা বা মাখামাখি ভাব সমাজ যেন দেখিয়াও দেখেন না; কিন্তু বিবাহের পর উহাদের নরনারী দাম্পত্য-সম্বন্ধকে খুব দৃঢ়তার এবং শুচিতার সহিত প্রতিপালন করিয়া থাকে।

বিবাহ-সংস্কারের এবং তদঙ্গীভূত পতি-পত্নীর একান্ত সংযোগের প্রভাবের ফলে পতি এবং পত্নীর স্বতন্ত্র সত্তা যেন লুপ্ত হইয়া উভয়ের পারিবারিক 'নাম' এবং 'গোত্র'ও এক হইয়া যায়। আমাদের ঋষি-গণের শাসিত সমাজে পত্নীর সত্তা বা অস্তিত্ব যখন পতির সত্তা বা অস্তিত্বের ভিতর লুপ্ত হইয়া যায়, তখন পত্নীর পূর্ব্বের পারিবারিক নামও আর পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না। স্মৃতি শিরোমণি মনুসংহিতা নদী এবং সমুদ্রের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নদীর মিষ্ট জল যেরূপ লবণাক্ত সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হওয়ার ফলে নিজের মিষ্টত্বকে একেবারে হারাইয়া সম্পূর্ণভাবে লবণরসে পরিণত হইয়া যায়, তদ্রূপ পত্নীর স্বভাবও বিবাহরূপ সম্মেলনের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে পতির স্বভাবই প্রাপ্ত হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহমুগ্ধ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বৈদিক সংস্কার-গুলি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৈতা দেওয়া এবং বিবাহ করা এই দুইটী মাত্র এক্ষণে বিকৃত আকারে কোনও মতে বাঁচিয়া আছে। দ্বিজগণের প্রাচীন [১৬টী] ও বর্ত্তমান [১০টী] বৈদিক সংস্কার গুলির নামোল্লেখ করা হইল ঃ—

প্রাচীন সংস্কার	বর্ত্তমান সংস্কার	প্রাচীন সংস্কার	বর্ত্তমান সংস্কার
১। গর্ভাধান	১ম	৯। কর্ণবেদ	৯ম
২। পুংসবন	২য়	১০। উপনয়ন	৯ম
৩। সীমন্তোন্নয়ন	৩য়	১১। বেদারম্ভ	৯ম
৪। জাতকর্ম্ম	৪র্থ	১২। সমাবর্ত্তন (গোদান)	৯ম
৫। নামকরণ	৫ম	১৩। বিবাহ	১০ম
৬। নিষ্ক্রামণ	৬ষ্ঠ	১৪। গৃহাশ্রম	এই গুলি অনেক দিন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।
৭। অন্নপ্রাশন	৭ম	১৫। বানপ্রস্থ	
৮। চূড়াকরণ	৮ম	১৬। সন্ন্যাস (অন্ত্যেষ্টি)	

কর্ণবেদ [৯নং], উপনয়ন [৯নং], বেদারম্ভ [৯নং] ও সমাবর্ত্তন [৯নং]—এই চারিটী উপনয়ন সংস্কারের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক সংস্কার কার্য্য করিবার সময় পৃথক্ পৃথক্ বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়। গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কারসমূহ [পিতা বাঁচিয়া থাকিলে] পিতার কর্ত্তব্য। যে দ্বিজ বালকের উপনয়ন হয় নাই, তাহার পক্ষে কোন বেদমন্ত্র উচ্চারণ, কোন দেব-দেবীর পূজার্চ্চনা বা যাগযজ্ঞে যোগদান এবং কাহারও বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণ ভোজনের [ব্রাহ্মণ বালকের পক্ষে] নিমন্ত্রণ প্রাপ্তি, ইত্যাদি ঘটে না। ইহার ব্যতিরেক বা প্রতিপ্রসব [exception] সম্বন্ধে মনু মহারাজ বলিয়াছেন [২য় অধ্যায়, ১৭২

শ্লোক] অনুপনীত [যাহার পৈতা হয় নাই] দ্বিজ বালকের মাতা-পিতা কিংবা কোন সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে, যদি তাহাকে সেই মৃত আত্মীয় বা আত্মীয়ার শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখন সেই শ্রাদ্ধকালে পঠিতব্য বেদমন্ত্র ['স্বধা' শব্দযোগে যাহা উচ্চারণ করিতে হয়] সে পড়িতে বা উচ্চারণ করিতে পারিবে। ১৪।১৫।১৬ নম্বরের সংস্কারগুলি অনেকদিন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ১৬টী সংস্কারের নিম্নলিখিত ভেদ আছে, যথা ঃ—(১) "গর্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-বিষ্ণুবলি-জাতকর্ম্ম-নামকরণ-নিষ্ক্রামণান্নপ্রাশনচূড়োপনয়ন বেদব্রত চতুষ্টয়সমাবর্ত্তন বিবাহাঃ ষোড়শ সংস্কারাঃ।" *

(২) "গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোজাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়া নিষ্ক্রামণেঽন্নাশনং বপন ক্রিয়া ॥১৩
কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারম্ভ ক্রিয়াবিধিঃ।
কেশান্ত স্নানমুদ্বাহো বিবাহাগ্নি পরিগ্রহঃ ॥১৪
ত্রেতাগ্নি সংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।"

—ব্যাস সংহিতা

বিবাহের পর গৃহাশ্রম সংস্কারের পদ্ধতি আছে। উপরে ব্যাস সংহিতায় ধৃত "বিবাহাগ্নিপরিগ্রহ" অর্থাৎ বিবাহের পর গৃহাশ্রম স্থাপনের জন্য অগ্নিস্থাপন [অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি স্থাপনাদি] করিতে হইত। অধুনা বঙ্গদেশে যে দশবিধ বৈদিক সংস্কার চলিতেছে, তাহাও নাম মাত্র। বেদবিহিত এই সংস্কারগুলির যথাশাস্ত্র সম্পাদন কামরূপ অঞ্চলের কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিছু কিছু আছে, কিন্তু বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই তাহাও নাই বলিলেও চলে।

* বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, ১০ম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যের উপর "বিষ্ণুচিত্তী" টীকা দ্রষ্টব্য।

যবন-জ্যোতিষ অথবা ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে বিবাহে বর-কন্যার রাশি, গণ এবং যোটকাদির বিচার ; বিবাহের উপযুক্ত মাস, বার এবং লগ্নাদি নিরূপণ এবং রাত্রিতে বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[১]

নানা বিদেশী ও অসভ্যতর জাতির আনীত কুসংস্কারের প্রভাবে আমাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে

যে সময়ে ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগ ছিল, যে সময়ে ভারতবর্ষবাসিগণ আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং শিক্ষা-সভ্যতায় প্রকৃতই জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন এবং তাঁহারা অপৌরুষেয় শ্রৌত ধর্ম্মের আশ্রয়ে প্রকৃতই সুখসৌভাগ্যপূর্ণ "স্বারাজ্যম্" ভোগ করিতেন, তখন কুসংস্কার, কদাচার এবং অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকার এদেশে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত না। কলিযুগ প্রবর্ত্তনেরও [বর্ত্তমান কলিযুগ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে আরব্ধ হইয়াছে] প্রায় তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এদেশে প্রাচীন এবং পুণ্যময় শ্রুতি, স্মৃতির উপদিষ্ট এবং অনুমোদিত আর্য্যাচার প্রবল ছিল এবং তখনও নানা বিদেশী এবং অসভ্যতর জাতির আনীত কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় দেশ পরিপূর্ণ হয় নাই। পরে [বিশেষতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের পর হইতে] আর্য্যসভ্যতা এবং আর্য্য-সদাচার বৈদেশিক রাজশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ায়, নানারূপ অজ্ঞান এবং কুসংস্কার সমাজের নানাস্তরে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ এই দুরবস্থা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে হইতে সম্প্রতি আমরা

একেবারে আত্মবিস্মৃতির গভীর পঙ্কে এরূপভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছি যে, আমরা সকলেই আমাদের স্ব বা নিজস্ব হারাইয়া দেহ, মন এবং আত্মাকে একেবারে পরের পায়ে সমর্পণ করত সম্পূর্ণ নূতন জীবে পরিণত হইয়াছি। দারুণ দুরবস্থার ফলে "দাস মনোভাব" আমাদিগকে এরূপভাবে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে যে, আমরা ভূতাবিষ্টের ন্যায় অথবা রাগপ্রাপ্তা ব্রজগোপীর ন্যায় সম্পূর্ণ "পর" হইয়া

"পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর"

এই মন্ত্র জপ করিতেছি। আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, সদাচারকে কদাচার, সুসংস্কারকে কুসংস্কার বুঝিয়া যাহা প্রকৃতই অধঃপাতের পরম কারণ সেই অধর্ম্ম, কদাচার এবং কুসংস্কারকেই মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতেছি।

শ্রীভগবানের আদেশ—"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ" অর্থাৎ, "বেদের যাহা আদেশ তাহাই ধর্ম্ম, বেদে যাহা নিষিদ্ধ, যাহা বেদ-বিরোধী তাহাই অধর্ম্ম"—এই অমৃত আদেশকে অবহেলা করিয়া নানা অশাস্ত্রের উপদিষ্ট উপধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছি। অপর সাধারণ শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত নারী-নরের কথা দূরে থাকুক, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকেই কোনও না কোনও প্রকারে জীবিকাস্বরূপ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাও চারি বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, কল্প, শ্রৌত এবং গৃহ্যসূত্রাদি, প্রাচীন স্মৃতি সংহিতাদির রীতিমত অধ্যয়ন করেন না ; অধিক কি রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরাণগুলি সমগ্র পাঠ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও অতিশয় বিরল। বেদের অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং উপবেদগুলির পঠন-পাঠন নাই বলিলেই চলে। কালেজের (Collegeএর) সাধারণ 'ডিগ্রী'প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীর ন্যায় টোলের 'তীর্থ' অথবা 'রত্নাদি' ও অতি সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান অথচ নভোমণ্ডলস্পর্শী দর্পে আধ্মাত হইয়া বিদ্যামন্দির হইতে বাহির হন। সুতরাং তাঁহারা

বৈদিক সদাচারসমূহের কোনও কথা শুনিলেই যে অতিমাত্র চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

[২]

'যবন-জ্যোতিষ' অথবা 'ফলিত-জ্যোতিষ'

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত নানারূপ কুসংস্কারের মধ্যে "যবন জ্যোতিষ" অথবা "ফলিত-জ্যোতিষের" অপ্রতিহত প্রভাব একটী অতি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। হিন্দুসমাজের নারী-নরের জন্মকাল অথবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে তাহাদের মৃত্যুরও পর পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন এই ফলিত-জ্যোতিষের প্রভাবে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার ফলে আমাদের সমাজের সকলেই নিরুৎসাহ দৈবপরায়ণ এবং নিতান্ত অলস হইয়া পড়িয়াছেন। কথায় কথায় "গ্রহের ফের" এবং "গ্রহের দৃষ্টি" তাঁহাদের সমস্ত জীবনকে জড় এবং অসহায় করিয়া রাখিয়াছে। কলেজের গণিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবং সুদক্ষ অধ্যাপকের উপদেশে সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণের হেতুভূত ভূচ্ছায়া বা রাহু গ্রহকে নিজ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াও এবং তদ্বিষয়ের পরীক্ষায় "প্রশংসার সহিত পাশ করিয়া"ও ছাত্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াই সেই সম্পূর্ণ কাল্পনিক 'রাহুগ্রহের' উদ্দেশ্যে পূজা-পাঠ, মণিরত্নাদি উপহার প্রদান করিতে থাকেন এবং "রাহুগ্রহের কুদৃষ্টি" হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য অমুক জ্যোতিষমার্ত্তণ্ডের প্রদত্ত তাবিজ, মাদুলি অথবা রত্নাঙ্গুরীয় অতি ভক্তির সহিত ধারণ করিতেছেন। বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের কুসংস্কারের দ্বারাই কলিকাতা সহরে প্রায় পঞ্চাশ জন জ্যোতিষী এই দুর্দ্দিনেও "রাজার হালে" জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

[৩]

জ্যোতিষ ব্যবসায়ীর পাতড়া পঠন=বড় বা ছোট, পণ্ডিত বা মূর্খ, যে কোনও জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীর নিকট তাঁহার জীবিকার নিমিত্ত স্বরূপ এই বিদ্যার কথা তুলিলেই তিনি সদর্পে পাতড়া পাড়িয়া থাকেন—

"সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।"

মর্ম্মার্থ—দেখিতেছেন না মহাশয়, জ্যোতিষ শাস্ত্র কিরূপ জাগ্রত, কিরূপ সফল, স্বয়ং চন্দ্র-সূর্য্য ইহার সাক্ষী।—এমন শাস্ত্রে যে অবিশ্বাস করে—ইত্যাদি।

[৪]

বারাণসী ধামে সে কালে ৺বাপুদেব শাস্ত্রী এবং তাঁহার পরে তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র ৺সুধাকর দুবে ভারতপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই কিন্তু ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসায়িগণকে "প্রচ্ছন্ন তস্কর" বলিতেন। ইহার কারণ আছে। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাক্ষী স্বয়ং চন্দ্র-সূর্য্য, উহা বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অথবা গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) এবং উহার সাহায্যে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাদির উদয়াস্ত, অয়ন নির্ণয়, গ্রহাদির গতি এবং গ্রহণাদির গণনা করা গিয়া থাকে, এবং এই জোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যেই অতি প্রাচীনকালের আর্য্য ঋষিরা যজ্ঞাদি সম্পাদানের সমুচিত যথাবিহিত কালের নিরূপণ করিতেন। এই শাস্ত্রই প্রকৃত বা সত্য আর্য্য-জ্যোতিষ শাস্ত্র। প্রাচীন ভারতবর্ষেই উহার জন্ম হইয়াছিল এবং তথা হইতে য়ুরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি, উহার দ্বারা নারী বা নরের জন্ম, বিবাহ, স্থানান্তরে যাত্রা অথবা তাঁহাদের জীবনের কোনও অংশের শুভাশুভ ফলের নির্ণয় হইত না, এবং উহার উদ্দেশ্যও তাহা ছিল না। বৈদিক অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি হইতে যাগযজ্ঞ এবং সংস্কার

৺বাপুদেব শাস্ত্রী ও ৺সুধাকর দুবে বলিতেন—ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসায়ীরা 'প্রচ্ছন্ন তস্কর'

কর্ম্মাদির যথাযথ কাল নির্ণয়ই উহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এখনও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ শাস্ত্রের সেই উদ্দেশ্য অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

[৫]

ফলিত-জ্যোতিষের আদিম জন্মভূমি

মেষ, বৃষাদি দ্বাদশ রাশি; রবি, সোম প্রভৃতি সাত বার এবং উক্ত রাশি এবং বার হইতে কল্পিত বারবেলা, কালবেলা, জাতকের বর্ণ এবং লগ্নাদি নির্ণয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক শুভাশুভ ফলাফল নির্দ্দেশসূচক ফলিত-জ্যোতিষ [অথবা Judicial Astrology] শাস্ত্রের আদিম জন্মভূমি কালডিয়া দেশের বাবিরুষ (Babylon) নামক মহানগর এবং তথা হইতে য়ুনানী (Inonians বা Javans), গ্রীক অথবা যবনেরা এসিয়া, আফ্রিকা, য়ুরোপ মহাদেশের সর্ব্বত্র উহার আমদানী করিয়া দিয়াছিলেন।

[৬]

বরাহমিহির ভারত খণ্ডে ফলিত-জ্যোতিষের আদি প্রচারক

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম রত্ন বরাহমিহির (১) নামক জ্যোতিষী পণ্ডিতের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উক্ত ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রচলন যে আমাদের এই ভারত খণ্ডে আদৌ ছিল, তাহার কোনও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ এবং বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি পুস্তক অপেক্ষা উক্ত বিদ্যার কোন প্রাচীনতর গ্রন্থও অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন

---

(১) বরাহমিহির—দেশের সাধারণ কুসংস্কারের ফলে বরাহ পিতা, মিহির পুত্র এবং খনা মিহিরের বিদুষী পত্নী—এই ভাবের আষাঢ়ে গল্প রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছে এবং অনেকে সেই উপকথাকেই সত্য ইতিহাস মনে করিয়া কত উচ্ছ্বাসময়ী রচনায় দেশ ভাসাইয়াছেন।

পণ্ডিতগণের মতে—বিক্রমাদিত্য খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৬ অব্দে সংবৎ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি বৈদিক অবৈদিক মতের নয় জন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। কিন্তু আধুনিক [অর্থাৎ য়ুরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত] অনেক পণ্ডিতের মতে—নবরত্ন এবং তাঁহাদের আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এই উভয়বিধ মতের মধ্যে যে কোনও মতই গৃহীত হউক, তাহাতে বিশেষ আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু একথা নির্ব্বিবাদ সত্য যে, বরাহমিহিরাচার্য্য গন্ধার এবং বাহ্লিক (Modern Afganistan including Balkh) দেশের যবন জাতীয় এক বা ততোঽধিক আচার্য্যের নিকট হইতে উক্ত অভিনব ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহা ভারতখণ্ডে প্রচলিত করিয়াছেন এবং এই কথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে [প্রকৃত পণ্ডিতের মত] লিখিয়াছেন যে, "যবনেরা ম্লেচ্ছ হইলেও পরম পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহারাও ঋষিগণের মত পূজার যোগ্য।" যবনদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া ইহার নাম "যবন-জ্যোতিষ" এবং ফলের আদেশ আছে বলিয়া "ফলিত-জ্যোতিষ" হইয়াছে।

[৭]

লগ্ন, কালবেলা, জাতকের রাশি, গণ এবং বিবাহের যোটকাদি বিচার

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র, মহাকাব্য অথবা মহাপুরাণেতিহাস [যেমন রামায়ণ এবং মহাভারত প্রভৃতির] প্রভৃতির মৌলিক মেষ, বৃষাদি দ্বাদশ রাশি; রবি, সোমাদি সপ্ত বার এবং তাহাদের সমবায়ে উদ্ভূত লগ্ন, জামিত্র, বারবেলা, কালবেলা, কুলিকরাত্রি, জাতকের রাশি, গণ এবং বিবাহের যোটকাদি বিচার প্রভৃতি সমন্বিত মহা-বিস্তৃত এবং জটিল এই যবন-জ্যোতিষ অথবা ফলিত-জ্যোতিষের কোনও

কথা নাই। যে সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের পুস্তকে এই নূতন শাস্ত্রের এবং সেই শাস্ত্রোল্লিখিত বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই অংশ আমাদের মতে—খৃষ্টজন্মের পরে [আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে—খৃষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে] প্রক্ষিপ্ত অথবা সংযোজিত হইয়াছে। কালিদাসের রচিত কুমার-সম্ভবাদি কাব্যেই ফলিত-জ্যোতিষ সংক্রান্ত কথা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার অপেক্ষা প্রাচীনতর [প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীনতর, প্রক্ষিপ্তাংশ পরিপূর্ণ অথবা নকল পুথি নহে] কোনও শাস্ত্রে অথবা কাব্যাদিতেও রাশি, লগ্নাদির উল্লেখ নাই।

[৮]

যে কোন পঞ্জিকার যে কোনও সংক্রান্তির বর্ণনার সংশ্রবে রাশি-চক্রের (Zodiacal Circleএর) চিত্র মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রাশিগুলির নাম যাবনিক শব্দ হইতে অনুবাদিত

আমাদের বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অথবা গণিত জ্যোতিষ সম্মত ভ চক্রকে [সপ্তবিংশ নক্ষত্র মণ্ডলকে] অবলম্বন করিয়া ২৭ নক্ষত্রের ২¼ সপাদ দ্বিনক্ষত্র লইয়া মেষাদি যে এক রাশি কল্পিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সৌরমাস ও বৎসর যে উক্ত দ্বাদশ রাশির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মেষ, বৃষাদি রাশির যে নামগুলিও যে যাবনী ভাষায় [গ্রীক্ এবং তৎসম্ভূত লাতিন ভাষার] শব্দ হইতে আমাদের দেশে যথাযথভাবে গৃহীত এবং অনুবাদিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও সুবিদিত; যেমন, মেষ = Aries, বৃষ = Taurus, মিথুন = Gemini, কর্কট = Cancer, সিংহ = Leo, কন্যা = Virgo, তুলা—Libra, বৃশ্চিক = Scorpion, ধনু = Sagittarius, মকর = Capricorn, কুম্ভ = Aquarius এবং মীন = Pisces. যাহা হউক, রাশি চক্রের চিত্র খুলিলেই

দৃষ্ট হইবে যে, মেষরাশির চিত্র, চক্রের সর্ব্বোর্দ্ধ স্থানে রহিয়াছে

লক্ষণ দ্বারাই ফলিত-জ্যোতিষের যাবনিক জন্ম নির্ণীত হইয়াছে

এবং বৃষাদি একাদশ রাশির চিত্র 'মেষ' হইতে দক্ষিণাবর্ত্তের পরিবর্ত্তে বামাবর্ত্তে [অর্থাৎ আর্য্য সভ্যতানুমোদিত লিপির পদ্ধতি মত ক, খ ইত্যাদি লেখার গতির মত বাম হইতে ডাইন দিকে না হইয়া, সেমিটিক হিব্রু, আরবী ইত্যাদি লিপির প্রথামত ডাইন হইতে বাম দিকে] অগ্রসর হইয়াছে। এই বিপরীতভাবে রাশিচক্র সন্নিবিষ্ট করার হেতু অনুসন্ধান করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র [আড়াই হাজার] বৎসর পূর্ব্ব হইতে কাল্‌ডিয়া এবং এসিরিয়া [বাবিরুষ বা Babylon, নিনেভা বা নাইনিভা প্রভৃতি নগরে] দেশে সেমিটিক সভ্যতা, শিক্ষা এবং লিপির প্রচলন হইয়াছিল এবং কাল্‌-ডিয়া দেশেই রাশিচক্রের চিত্র প্রথমে লিখিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। আরও একটা অতি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রের মতে—সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহসকলেই পুরুষ, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী অথবা য়ুরোপীয় যে কোনও ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন—সে দেশের লোকের মতে চন্দ্র বা Moon পুরুষ নহেন, পরন্তু স্ত্রী,—He নহেন, পরন্তু She। চন্দ্রের এই লিঙ্গবিপর্য্যয় যবন জ্যোতিষসম্মত। দেখুন সেই সাংঘাতিক বচন—

"পুংসাং সূর্য্যারবাগীশা যোষিতাং চন্দ্রভার্গবৌ।"

অর্থাৎ, সূর্য্য, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি [যথাক্রমে The Sun, Mars এবং Jupiter] পুরুষ; আর চন্দ্র এবং শুক্র [The Moon এবং Venus] স্ত্রীলিঙ্গের অধিপতি! এই মত গৃহীত হইলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের জন্মের বৈদিক ঐতিহ্য এবং অসুর-গুরু মহাকবি শুক্রাচার্য্যের যশোরাশির আখ্যান, এমন কি সুবিখ্যাত "তারকাময়" মহাযুদ্ধের হেতুভূত বৃহস্পতির

পত্নী তারার সহিত দ্বিজরাজ চন্দ্রের প্রণয়ব্যাপার এবং বৈদিক পুরুরবার পিতা বুধের জন্মেতিহাস প্রভৃতি সবই পরিত্যাগ করিতে হয় এবং "ব্রাহ্মণগণের রাজা ["সোমো রাজা ব্রাহ্মণানাম্"] চন্দ্র",—এই বেদ-বাদকে নস্যাৎ করিয়া চন্দ্রদেব এবং ভার্গব শুক্রাচার্য্যকে শাড়ী, সেমিজ অথবা গাউন বনেট প্রভৃতি পরিয়া "মেয়ে মানুষের সমুচিত" ব্যাপারে যোগদান করিতে হয়!! সে যাহাই হউক, রাশিচক্রের চিত্রে মেষাদি রাশির চিত্র বামবর্ত্তে লিখিবার প্রথা এবং চন্দ্র ও শুক্রাচার্য্যের স্ত্রীত্ব এই উভয় লক্ষণের দ্বারাই ফলিতঃ-জ্যোতিষের সেমিটিক অথবা যাবনিক জন্ম ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

[৯]

প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির "জ্যোতিষবচনার্থ" নামক অংশে যে সকল ছন্দোময়ী রচনা সংবলিত শ্লোক "প্রমাণস্বরূপ" অধ্যাহৃত হইয়াছে,

প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির ছন্দোময়ী শ্লোক

সেগুলি ভারতখণ্ডে মুসলমান প্রবেশের পূর্ব্ব-তর কালে রচিত হয় নাই এবং উহাদের *অধিকাংশই [শতকরা ৯৯] খলজীকুলভূষণ বখ্‌তিয়ার নন্দন মোহাম্মদ* কর্ত্তৃক গৌড় বিজয়ের শতাধিক বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। এই

বৈদিক গ্রন্থে ও রামায়ণ, মহাভারতে বারের উল্লেখ

পরিচ্ছদের প্রথমে যে বার প্রকরণ লিখিত হইয়াছে [এবং আজকাল আমরা যে "শনি, মঙ্গলবারের" নামে অভিভূত!] সেই রবি সোমাদি বারের নামোল্লেখ বৈদিক গ্রন্থের কথা দূরে থাকুক, রামায়ণ, মহাভারতেও নাই। বারের সম্বন্ধে যে কথা, মেষ, বৃষাদি রাশির সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে,—অর্থাৎ, খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের কোনও গ্রন্থে উহাদেরও উল্লেখ নাই। যদি রাশি এবং বারগুলিকে যবন বলিয়া আমাদের শুদ্ধাচারী সমাজের "পংক্তি" হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই রাজমার্ত্তণ্ড

জ্যোতিস্তত্ত্ব, তাজক [এই কথাটী ফরাসি ভাষার] এবং মুহূর্ত্ত চিন্তামণি প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থাবলীর বর্ণিত লগ্ন, জাতকের রাশিগণ এবং যোটকাদির এবং বার-বেলা, কালবেলা ও কুলিকরাত্রি প্রভৃতির বিভীষিকা বা আপৎ সবই স্বয়ং দূরীভূত হইয়া যায়। আরও এই যে বঙ্গদেশে প্রায় এক সহস্র বৎসর হইতে চারিবর্ণ এবং "ছত্রিশ জাতি"র হিন্দু সমাজে নৈশ বিবাহের [রাত্রিতে বিবাহের] প্রথা চলিয়া আসিতেছে এবং বেদসম্মত দিবা বিবাহের অমূলক নিন্দাবাদ ঘোষিত হইতেছে, তাহারও মূলচ্ছেদ হয়।

[১০]

দিবাভাগে বিবাহ—পঞ্জিকায় "জ্যোতিষবচনার্থের" মধ্যে একটী অতি ভয়ানক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

"বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্র বর্জিতা।
বিবাহানল [বিরহানল] দগ্ধা সা নিয়তং স্বামিঘাতিনী ॥"

"অস্যার্থঃ—[পি, এম, বাক্‌চির পাঁজিতে] দিবাভাগে বিবাহ হইলে কন্যা পুত্র বর্জ্জিতা ও বিরহানলদগ্ধা এবং স্বামিঘাতিনী হয়।" পি, এম, বাক্‌চির পণ্ডিতেরা প্রাচীনতর এবং রঘুনন্দন সম্মত "বিবাহানলদগ্ধা" [বিবাহের উপলক্ষে যে আগুন জ্বালান হয়, তাহাতেই স্বামীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ হন—কিংবা স্বামীকেই করেন] পাঠটীকে বদলাইয়া "বিরহানলদগ্ধা" করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন যে সম্পূর্ণ অহৈতুক নহে, তাহা পরে দেখা যাইবে। "শ্রীশ্রীবটতলা সম্মত" পাঁজিগুলিতে "জ্যোতিষবচনার্থ" পয়ারচ্ছন্দে লেখা হইত [বোধ করি এখনও হয়]। উহাতে উক্ত শ্লোকের অন্তিম দুই পাদের অনুবাদে ছিল ঃ—

"রক্তবস্ত্র পরিধান কান্দিতে কান্দিতে।
স্বামীরে দহিতে যায় শ্মশান ভূমিতে॥"

কি সর্ব্বনাশ! বিবাহের উদ্দেশ্যই পুত্রের উৎপাদন; যদি দিনের বেলা বিবাহ দিলে মেয়েটি বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা হয়, চিরকাল স্বামি-বিচ্ছেদাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় [কিংবা বৈবাহিক অগ্নিতেই মৃত স্বামীর সহিত সহমৃতা বা সতী হয় কিংবা তাহাকে স্বামীর মুখাগ্নি করিতে হয়] এবং নিশ্চয়ই স্বামিঘাতিনী হয়, তবে কে ঐ সর্ব্বনাশের কার্য্যে অগ্রসর হইবে, অথবা কে-ই বা ঐরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ কাঁধে লইয়া বিবাহ করিবে, বল?

লেখকের মন্তব্য

যাহা হউক, এই সাংঘাতিক শ্লোকরচয়িতা পণ্ডিত মহাশয়ের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? যদি সত্যযুগ হইতে এই দেশে হিন্দু সমাজে নৈশ বিবাহ প্রথার একচ্ছত্র রাজত্বই ছিল, "দিনের বেলা বিবাহ হয়"—এরূপ কথাও যদি সেকালে একান্ত অশ্রুত এবং অপরিচিত ছিল, তবে এই বাগ্‌বজ্রের সৃষ্টির তো কোনই প্রয়োজন উপলব্ধি হয় না। যে দেশে সাপই নাই, সে দেশে সাপের ওঝা কিংবা সর্পদংশনের প্রতিষেধক বা মন্ত্রৌষধের কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না; এবং যে দেশে চুরি, ডাকাতি নাই, সে দেশে উহা নিবারণের জন্য কোনও আইনও থাকে না। আমাদের তো সুস্পষ্ট মনে হয় যে, শ্রৌত-স্মার্ত্ত শাস্ত্র শাসিত ভারতীয় হিন্দুসমাজে দিবা বিবাহই সনাতন প্রথা ছিল [এখনও ওড়িশা দেশের ব্রাহ্মণসমাজে আছে], এবং কোনও কারণে সেই প্রথা রহিত করার কোনও বিশেষ আবশ্যকতা উপস্থিত হওয়ায় সাধারণকে পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথানুসরণ হইতে নিবৃত্ত করণের উদ্দেশ্যেই ঐ বিষম বিভীষিকাময় শ্লোকটির সৃষ্টি হইয়াছিল।

ঠিক তুল্যরূপ কারণেই সুসভ্য সমাজের সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত সনাতন

(universal) যৌবন বিবাহ (puberal marriage) প্রথার পরিবর্ত্তে

সুপ্রাচীন কালে বিবাহের লগ্ন বিচার এবং দিবাভাগে বিবাহ

শিশু বিবাহের (Anti-puberal marriage) প্রথার প্রবর্ত্তন আবশ্যক হওয়ায় কন্যার জনক বা অভিভাবকবর্গের অনভ্যস্ত বিষয়ে রুচি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে "যুবতী কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখিলে পিতা, পিতামহ অথবা ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ জীবিত অবস্থায় সমাজচ্যুত এবং পরলোকে ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন পিতৃপুরুষগণের সহিত নরকস্থ এবং তথায় তাঁহাদিগকে অতি বিকট ও বীভৎস পানীয় বিশেষ নিয়ত পান করিতে হইবে" ইত্যাকার কতকগুলি শ্লোক রচিত এবং প্রাচীনতর ঋষিগণের সঙ্কলিত শাস্ত্রের ভিতর প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল এবং সেই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া রঘুনন্দনাদি নব্য স্মার্ত্তেরা ভীষণাধিক ভীষণ ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের বিবাহ একটী প্রধান বৈদিক সংস্কার, বেদ অথবা বেদসম্মত শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে নৈশ বিবাহের কোনও ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য, এবং তুল্যরূপ আরও অনেক কারণে, বেদকেই অধঃকৃত করিয়া "বর্ত্তমান যুগে বৈদিক মন্ত্র বিষহীন সর্পের ন্যায় এবং বৈদিক বিধান ষণ্ড পুরুষের ন্যায় নিষ্ফল এবং তাহার পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক মন্ত্রাদি এবং তান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাই সদ্যঃ ফলপ্রদ, ইত্যাকার বহু শ্লোক [প্রধানতঃ অনুষ্টুভ বৃত্তের] রচিত হইয়াছিল।

[১১]

যাহা হউক, দিবাবিবাহ প্রতিষেধ এবং সুতহিবুক লগ্নাদি ভিন্ন বিবাহ-সংস্কার অকর্ত্তব্য ইত্যাদি ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিলে কি ফল হইয়া থাকে, তাহার পরীক্ষা করা আবশ্যক। মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের মত শাস্ত্রজ্ঞ এবং সদাচারনিষ্ঠ রাজ্য সেকালে আমাদের 'প্রাচ্য' প্রদেশে যে আর দ্বিতীয় ছিলেন না, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

তাঁহার সমসাময়িক মহর্ষি বাল্মীকি, রামচরিত অবলম্বনপূর্ব্বক যে অনুপম রামায়ণ কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ সত্য ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে, সংশয় নাই। বাল্মীকি, রামায়ণের [বঙ্গবাসী সংস্করণ] আদি কাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম সর্গে মহারাজ দশরথের পুত্র চতুষ্টয়ের সহিত রাজর্ষি জনকের দুই কন্যা [সীতা ও ঊর্ম্মিলা] এবং তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীর [মাণ্ডবীর ও শ্রুতকীর্ত্তির] শুভ-বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত সর্গের ১নং [যস্মিংস্তু দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্] হইতে ৩৬নং [······যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধি পূর্ব্বকম্] সংস্কৃত শ্লোকাবলী এবং তাহাদের মর্ম্মানুবাদ যিনিই মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং শতানন্দ প্রমুখ অতি প্রসিদ্ধ মহর্ষিগণের তত্ত্বাবধানে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ [উভয়েই সূর্য্যকুলজাত ; কবি কৃত্তিবাস ভ্রমে পড়িয়া জনককে 'চন্দ্রবংশজ' বলিয়াছেন] দুই আদর্শ নরপতি নিজ নিজ পুত্র-কন্যার বিবাহ-সংস্কারের আদ্যোপান্ত দিনের বেলায় সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত [ত্রিসপ্ততিতম] সর্গের অষ্টম শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, প্রভাতকালে রাজা দশরথ তাঁহার চারি কুমারকে সঙ্গে লইয়া কন্যাদাতা রাজা জনকের দানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সম্প্রদানের এবং সংস্কার-কার্য্যের যাবতীয় উপাদান আয়োজন প্রস্তুত করিয়া জনক তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং বরপক্ষের শুভাগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই বৈবাহিক অগ্নি প্রজ্বালন এবং প্রাথমিক হোম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে একে একে বর চতুষ্টয়কে কন্যাচতুষ্টয়ী সম্প্রদান এবং আনুষঙ্গিক অগ্নি পরিক্রমা প্রভৃতি সংস্কারের যাবতীয় কার্য্যই [সম্ভবতঃ অপরাহ্নের পূর্ব্বেই] একই দিনে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই আদর্শ বিবাহের বর্ণনা [১ হইতে ৩৬নং শ্লোক] পড়িয়া দেখিতে পাওয়া গেল ঃ—

১। বর-কন্যার রাশি, গণাদির বিচারের কোনও সংবাদ নাই।

২। বিবাহ দিবাভাগে হইয়াছে।

৩। কোন লগ্ন নির্দ্দিষ্ট করিবার সংবাদ নাই; বরঞ্চ একে একে চারি ভ্রাতার বিবাহ হওয়ায় কোনও লগ্ন নির্দ্দিষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ—সাগ্নিক ক্ষত্রিয়ের ক্রমে ক্রমে চারিটী বিবাহ-সংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারে। এরূপ সুদীর্ঘ লগ্নকাল কোথায় পাওয়া যাইবে? তবে, এই ৭৩ সর্গের পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১ এবং ৭২ সর্গে লিখিত আছে যে, এই চারিটী বিবাহ ভগদৈবত উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে সুসম্পন্ন হইবার কথা-বার্ত্তা স্থির হইয়াছিল। আমরাও জানি—আর্য্য জ্যোতিষে নক্ষত্র মণ্ডলের অস্তিত্ব এবং কার্য্য বিশেষে শুভাশুভ এবং স্ত্রী পুং ভেদে নক্ষত্রবিচার পূর্ব্বে ছিল। ক্যালডিয়া দেশে প্রথমে রাশিচক্রের কল্পনা গৃহীত হয় এবং তৎপরে রাশি হইতে যবন জ্যোতিষীরা লগ্নাদির আবিষ্কার করেন।

রামায়ণ

যাহা হউক, রামায়ণের (২) আদিকাণ্ড বা বাল-কাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গে [বঙ্গবাসী] শ্রীরামচন্দ্রাদির জন্ম বিবরণে তাঁহাদের চারি ভ্রাতার জন্মলগ্ন [এবং জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুতের উপাদান] প্রদত্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল অংশ পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

[১২]

কেবল বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণেই যে শ্রীরামচন্দ্রাদির বিবাহ দিবা-ভাগে এবং লগ্নাদি নির্ণয় ও বর-কন্যার রাশিগণাদির বিচার না করিয়াই

(২) বাল্মীকি রামায়ণের পুঁথির প্রথমতঃ 'গৌড়ীয়' [বাঙ্গালা দেশের—উহাতে মাত্র ছয় কাণ্ড আছে,—সপ্তম বা উত্তরকাণ্ড নাই। উহা ইটালীদেশে 'গোরেশিও' কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল; কলিকাতায় পুনর্ম্মুদ্রিত হইতেছে] দ্বিতীয়তঃ 'উদীচ্য' [কাশ্মীর দেশের] এবং তৃতীয়তঃ 'দাক্ষিণাত্য' [মহারাষ্ট্র দেশের,—বঙ্গবাসী সংস্করণ উক্ত দাক্ষিণাত্য পুঁথি হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত] —এই তিন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। দাক্ষিণাত্য সংস্করণে প্রক্ষিপ্তাংশ সর্ব্বাপেক্ষা যে অধিক, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

নিষ্পন্ন করিবার একমাত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। মহাভারতে [জরৎকারুর বিবাহ প্রথম এবং বিরাট দুহিতা উত্তরার বিবাহ অন্তিম] যে এগার বারটি বিবাহের বর্ণনা আছে, তাহাদের মধ্যে কোনও টিতেই বর-কন্যার রাশিগণাদির [যোটক] বিচার, 'সুতহিবুকা'দি লগ্ন নির্ণয় অথবা রাত্রিবিবাহের প্রথা অনুসৃত হয় নাই; এবং প্রাচীন মহাপুরাণ [বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণু এই তিনখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন] গুলির একখানিতেও আমরা ফলিত জ্যোতিষের কোনও আদেশ প্রতিপালনের দৃষ্টান্ত পাই নাই। আর, এরূপ অদ্ভুত বিষয় পাইবার কোনও সম্ভাবনাও নাই।

[১৩]

আমাদের স্বাধীনতার এবং স্বারাজ্যের সুবর্ণময় যুগে পূর্ণযৌবনে নরনারীর বিবাহ হইত এবং ক্ষত্রিয় বীরজাতির মধ্যে দৈব, গান্ধর্ব্ব, প্রাজাপত্য এবং রাক্ষস [মিশ্র বা অমিশ্রভাবের] বিবাহের এবং ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে দৈব এবং প্রাজাপত্য বিবাহের সমধিক প্রচলন ছিল। এই বিবাহগুলির মধ্যে গান্ধর্ব্ব এবং প্রাজাপত্য বিবাহে বর-কন্যার পরস্পর অনুরাগসঞ্চার এবং মনোনয়ন পূর্ব্বেই ঘটিত। উহাদের পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে, গান্ধর্ব্ব বিবাহে কন্যার অভিভাবকের অনুমতির কোনও অপেক্ষা থাকিত না; প্রাজাপত্য বিবাহে বর-কন্যার মনোনয়নের বিষয় কন্যার অভিভাবককে জানান হইলে, তিনি সম্মতি দিয়া বলিতেন,—"হাঁ, তোমরা উভয়ে একত্র বিবাহবন্ধনে সংযুক্ত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর।" রাক্ষস বিবাহে বর বা বরপক্ষের লোকে ডাকাতি করিয়া কন্যাকে লইয়া যাইত। দৈববিবাহে কন্যার অভিভাবক [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য; সেকালে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত থাকায় ব্রাহ্মণ, দ্বিজমাত্রেরই কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন] কোনও বৈদিক যজ্ঞ করিবার সময়ে, নিজের যুবতী

কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া যজ্ঞবেদিতে আনিয়া সেই যজ্ঞের কোনও ঋত্বিক্‌কে [পুরোহিতকে] যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতেন। রাজা মহারাজাদের পূর্ণযৌবনা কন্যারা স্বয়ংবর করিতেন এবং প্রায় প্রত্যেক স্বয়ংবরেই [যেমন সীতার, দ্রৌপদীর, ইত্যাদি] বরের বীর্য্য পরীক্ষার একটা আয়োজন থাকিত। আসুর বিবাহ বৈশ্য-শূদ্রদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। উহা কেবল উচিত বা অনুচিত মূল্যে কন্যা কিনিয়া আনার ব্যাপার। আর, পৈশাচ বিবাহ জঘন্য বলাৎকার মাত্র, এবং উহা কোল, ভীল এবং শবরাদি অসভ্য সমাজেই প্রচলিত ছিল। রাজাদের মধ্যে রাজ্যশুল্কমূলক বিবাহও চলিত। এই বিবাহগুলির মধ্যে একটিতেও বর-কন্যার রাশিগণ এবং যোটকাদি বিচার করিবার এবং লগ্নাদি নির্ণয় করিবার সুদূর সম্ভাবনাও ছিল না।

[১৪]

কালদোষের বিভীষিকার সৃষ্টি

কেবল রামায়ণ এবং মহাভারতাদিতে যে ফলিত-জ্যোতিষের আদিষ্ট বা উপদিষ্ট বৈবাহিক অথবা যাত্রিক রাশিগণ, লগ্ন এবং বারবেলা কালবেলা প্রভৃতির কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, তাহা নহে; বৈদিক গৃহ্যসূত্র এবং মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের কোথায়ও বর-কন্যা নির্বাচনের সময় তাহাদের বংশমর্য্যাদা, বংশপরম্পরাগত ধার্ম্মিক সদাচার, শারীরিক এবং মানসিক গুণাবলী ভিন্ন তাহাদের রাশি, গণ অথবা বর্ণাদি মেলনের কিংবা কোনও 'লগ্ন' ধরিয়া অথবা রাত্রিকালে বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা দূরে থাকুক, উহাদের সম্বন্ধে একটা কথাও নাই। অধিক কি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের "উদ্বাহতত্ত্বে" [৯০ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাসী] বাৎস্যায়নের নামের দোহাই দিয়া" বিবাহে নিষিদ্ধ মাসগুলির [আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ এবং চৈত্র এইগুলি নিষিদ্ধ] তালিকা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ আছে, এবং যে সেই "আষাঢ়ে

ধনধান্য ভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে" ইত্যাদি শ্লোকটি পঞ্জিকাগুলি যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিংবা উদ্বাহতত্ত্বের [৯২ পৃষ্ঠায়] রাজমার্ত্তণ্ড নামক নিবন্ধবিশেষের "বার মাসের মধ্যে শুধু পৌষ এবং চৈত্র ব্যতীত অবশিষ্ট দশমাসই প্রশস্ত" এই মর্ম্মের শ্লোক [অরক্ষণীয়া কন্যার সম্বন্ধে] উদ্ধৃত হইয়াছে, কিংবা পঞ্জিকায় বারদোষ, যুতবেধ, যামিত্রবেধ এবং সপ্তশলাক প্রভৃতি আরও যে সকল কালদোষের বিভীষিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাদের একটিও বৈদিক গৃহ্যসূত্রে কিংবা মনুসংহিতা প্রমুখ প্রামাণ্য [বেদসম্মত] স্মৃতিশাস্ত্রেও নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "বিবাহে নিষিদ্ধ মাস"গুলির প্রমাণস্বরূপ যে বাৎস্যায়নের নাম করিয়াছেন, কামসূত্রকার প্রসিদ্ধ বাৎস্যায়ন মুনির কামশাস্ত্রের মধ্যে বৈদিক বৌধায়নাদি গৃহ্যসূত্রসম্মত অনেক বৈবাহিক বিধি-ব্যবস্থা আছে, কিন্তু স্মার্ত্তের অধ্যাহৃত শ্লোক অথবা ঐ মর্ম্মের কোনও সূত্র তাহার কোনও স্থানেই নাই। ফলতঃ কোনও বৈদিক গৃহ্যসূত্রে [এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রে] অরক্ষণীয়া কন্যার কোনও কথাই নাই।

[১৫]

পঞ্জিকায় উদ্বাহতত্ত্বের স্থান এবং গৌড়মণ্ডলে পাঠান রাজশক্তির প্রভাব

এইবারে আমাদের দেশাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রণীত গ্রন্থগুলির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন। পঞ্জিকায় যাবতীয় বিভীষিকা আছে, তাহাদের অনেকগুলির জন্মস্থান স্মার্ত্তের "উদ্বাহতত্ত্ব"। গৌড়মণ্ডলে পাঠান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দুইশত বৎসর পরে খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে সময়ে দাসত্ব-জর্জ্জরিত হিন্দুসমাজ একদিকে অজ্ঞানের অন্ধকারে এবং অপর দিকে কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া "ত্রাহি ত্রাহি" রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল। নববলদৃপ্ত পাঠান রাজশক্তির প্রভাবে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজ কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, অবিবাহিতা

অনূঢ়া কন্যা গৃহে রাখা কিরূপ সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল, দিনের বেলা প্রকাশ্য সভা করিয়া এবং বাদ্যভাণ্ডাদির উৎসব সহকারে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কিরূপ অতি সাহসের কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা সমসাময়িক বৈষ্ণবসাহিত্য, কুলগ্রন্থের মেল-বিবরণ এবং নূতন নূতন সঙ্কীর্ণ আচারের প্রাচীর নির্ম্মাণাদি হইতে বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যায়। বিবাহিতা কন্যার স্বামীকে বধ না করিলে তাহাকে "নেকা" করার উপায় ছিল না; কিন্তু অবিবাহিতা এবং বিধবা নারীরা বৈদেশিক কোনও কোনও বীরপুরুষের অতি লোভনীয় "আমিষ" বলিয়া গণ্য হইতেন। ভারতীয় সমাজে আরবীয় সভ্যতার মহাপ্লাবন আসিবার পর, হিন্দুর ছোট বড় সমস্ত জাতির মধ্যে শিশুকন্যার বিবাহ, প্রদেশবিশেষে শিশুকন্যার প্রাণবধ, বিধবা নারীকে স্বামীর চিতায় দগ্ধ করা প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ, আর্য্যসদাচার বিরুদ্ধ এবং জগতের সভ্যতা এবং শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কদাচারগুলি সহসা এরূপ দ্রুতগতিতে যে বাড়িয়া গেল, তাহার কি কোনও হেতু নাই? উহার হেতু অতি সুস্পষ্ট এবং স্বাভাবিক। প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলের আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ সকল সঙ্কীর্ণ "কূর্ম্মনীতি"র উদ্ভব হইয়াছিল। দেখুন, বাঙ্গালার প্রতিবেশী প্রদেশ ও ওড়িশায় পাঠান অথবা মুঘল প্রভুত্ব স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই,—ঐ প্রদেশে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দিবা বিবাহের প্রথা লুপ্ত হয় নাই এবং করণ ও খণ্ডায়েত [বাঙ্গালার কায়স্থ ও রাজপুতের সমশ্রেণী] জাতির মধ্যে কন্যার যৌবনবিবাহ প্রথাও লুপ্ত হয় নাই।

[১৬]

বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে দেখিলেন, রামচন্দ্রাদির বিবাহ দিনের বেলায় হইয়াছিল এবং তথায় 'লগ্নে'র কোনও কথাই নাই; অথচ স্মার্ত্তের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বগামী কৃত্তিবাস কবির রামায়ণের মূল

ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরই নিহিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত বলিতেছেন—রাম-সীতার বিবাহের অতি উত্তম লগ্ন স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষিই নির্ণীত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই লগ্নে বিবাহ হইলে রাম-সীতার মধ্যে বিচ্ছেদ হইত না। দেবতারা দেখিলেন যে, রাম-সীতার বিচ্ছেদ না হইলে সীতাহরণ হয় না, রাবণও মরে না; সুতরাং রাম অবতারের ষড়যন্ত্র সবই যে মাটি হইয়া যায়! দেবতারা বশিষ্ঠদেবকে বোকা বানাইবার জন্য এক বুদ্ধি আঁটিয়া বিবাহ রাত্রির মজলিসে [বাঙ্গালাদেশে তখন দিবা-বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে কিংবা উঠি উঠি করিতেছে,—কাজেই কবি কৃত্তিবাস রাম সীতার বিবাহ রাত্রিতেই দিয়াছেন] নৃত্য করিবার জন্য চন্দ্রদেবকে পাঠাইয়া দিলেন। বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা এবং তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই চাঁদের সেই নৃত্যের ভাবে একেবারে মশগুল, চিকের আড়ালে রাণীদেরও তদবস্থা, কাজেই বশিষ্ঠের গোরু খোঁজা সাধের "লগ্ন" ভস্ম হইয়া গেল আর রাম-সীতার কুলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল! দেবতাগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, ইত্যাদি।

কবি কৃত্তিবাসের কল্পিত ব্যবস্থা

[১৭]

ভক্ত কবি তুলসীদাস স্মার্ত্ত রঘুনন্দনেরও অনেক পরবর্ত্তী। তাঁহার রামায়ণে রামচন্দ্রাদির যে নৈশবিাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বাভাবিক। যে সকল নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহার রাময়ণের ভিতর বহু "ক্ষেপক" [প্রক্ষিপ্তাংশ] প্রক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা আবার আধুনিক গণক ঠাকুরদের নকলে রামচন্দ্রের জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া এবং পদ্ধতি-পুথির নকলে সীতার বিবাহে জনক কর্তৃক সঙ্কল্পবাক্য পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়া সাধারণের কুসংস্কার ষোলগুণ বাড়াইয়া দিয়াছেন।

[১৮]

বিবাহ বৈদিক সংস্কার। গর্ভাধান ব্যতীত কোনও বৈদিক কার্য্য

রাত্রিতে করা নিষিদ্ধ। অধিক কি, কোনওরূপ বৈদিক 'দান'ও নিষিদ্ধ। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সেই "দায়" হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার "উদ্বাহতত্ত্বে" [১৫৯ পৃষ্ঠা] মহাভারতের নাম করিয়া "অভয়দান, বিদ্যাদান, দীপদান, অন্নদান, আশ্রয় দান এবং কন্যাদান—এই কয়টি ভিন্ন আর অন্য দান নিষিদ্ধ" এরূপ মর্ম্মের একটি অনুষ্টুপ্‌ছন্দের শ্লোক তুলিয়াছেন। মহাভারতে একটিও নৈশ-বিবাহের দৃষ্টান্ত নাই দেখিয়া, উক্ত শ্লোকের মৌলিকতায় সন্দেহ জন্মে। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বাঙ্গালার সামবেদীয় এবং ঋগ্‌বেদীয় ব্রাহ্মণেরা রাত্রিতে সম্প্রদানটুকু সারিয়া পরদিন [অথবা তাহারও পরে] দিনের বেলা বৈদিক সংস্কারাত্মক কাজ করিয়া বৈদিক বিধান এবং দেশাচার [স্মার্ত্তসম্মত এবং পঞ্জিকার উপদিষ্ট] উভয়ের মধ্যে এক প্রকার আপোষ বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু যজুর্ব্বেদীয়দিগের সম্প্রদানের পূর্ব্বেই হোমাগ্নি জ্বালিতে হয়; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এই আবরণটুকুরও আশ্রয় নাই।

দায়ে পড়িয়াই ইচ্ছামত ব্যবস্থা

যাঁহারা উক্তরূপে আপোষ বন্দোবস্তের দ্বারা রাত্রিতে সম্প্রদান করিয়া দেশাচারের অথবা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সম্মান রক্ষা এবং পরে দিবাভাগে বৈবাহিক হোম, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি সংস্কারাত্মক কার্য্য করিয়া বৈদিক পদ্ধতির মান রক্ষা করেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য,—(১) শুধু সম্প্রদানের দ্বারা দ্বিজগণের বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং দিবাভাবে কুশণ্ডিকাদি সপ্তপদী গমনান্ত সংস্কারাত্মক কর্ম্ম করিলে "রাত্রিতে বিবাহ হইয়াছে" বলা বৃথা। (২) সম্প্রদানের পর বর-কন্যার 'পতি-পত্নীসম্বন্ধ' ঘটে না। সুতরাং তাহাদিগকে বাসরঘরে একত্র রাখেন কোন্ যুক্তিতে?

[১৯]

আমরা যতদূর দেখিলাম, তাহাতে বুঝা গেল:—

১। ফলিত জ্যোতিষের উপদিষ্ট জন্মপত্রিকা প্রস্তুত বা তাহা হইতে বর-কন্যার রাশিগণের বিচার এবং বৈবাহিক লগ্ন নির্ণয়াদি শ্রৌত স্মার্ত্ত-শাস্ত্রসম্মত সনাতন প্রথা নহে; উহা খৃষ্টপর যুগে এবং বিশেষতঃ বৈদেশিক প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। রাত্রিকালে বিবাহের প্রথা বিশেষ কারণে জন্মিয়াছিল।

৩। উত্তরায়ণ কাল, শুক্লপক্ষ এবং শুভ নক্ষত্রে বিবাহের প্রশস্ত সময় বলিয়া গৃহ্যসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে; ইচ্ছামত যে কোনও কালে এবং দিনে হইতে পারে, তাহাতেও বাধা নাই; যথা—ঋগ্‌বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে—"উদগয়ন আপূর্য্যমাণ পক্ষে পুণ্যে নক্ষত্রে চৌলকর্ম্মোপনয়ন গোদান বিবাহাঃ ॥১॥ সার্ব্বকালমেকে বিবাহম্ ॥২॥"

যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর গৃহ্যসূত্রে—

"উদগয়ন আপূর্য্যমাণ পক্ষে পুণ্যাহে কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ।৫। ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষু ।৬। স্বাতৌ মৃগশিরসি রৌহিণ্যাং বা ॥৭॥"

সামবেদীয় গোভিল এবং শৌনক গৃহ্যসূত্রে—

"পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুর্ব্বীৎ। লক্ষণ প্রশস্তান্ কুশলেন।" ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, [মাঘ মাসে উত্তরায়ণ আবদ্ধ হওয়ায়] মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাস বিবাহের প্রশস্ত সময়। যাহা হউক, কেবল শুভাশুভ নক্ষত্র বিচার ভিন্ন আর কোনও বার বা লগ্নাদির বিচার প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থে নাই।

বর্ত্তমান কালে বিবাহ-সভা হইতে কন্যাকে সহসা ছিনাইয়া লইয়া যাইবার আশঙ্কা যখন নাই, তখন শাস্ত্রোক্ত বৈধ দিবা-বিবাহের প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা পরামর্শসঙ্গত বোধ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীর প্রগাঢ় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী নিজের কন্যার বিবাহ দিনের বেলায় দিয়া শাস্ত্রের এবং স্বকীয় বিদ্যার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

অসমীয়া হিন্দুদিগের সম্বন্ধসূচক নামাবলী

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ-স্থাপনের পর হইতে সংসারে মানুষের সহিত মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সেই হেতু পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ অথবা মাতা, মাতুল, মাতামহ এবং প্রপিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন, শ্যালক, ভগিনীপতি, সহোদর, বৈমাত্রেয় অথবা খুড়তুতো, জাটতুত, মামাত, মাসতুত এবং পিসতুত প্রভৃতি সমান স্তরের এবং পুত্র-কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি অধস্তন সম্পর্কের নানাবিধ নিকট বা দূঢ়তর আত্মীয়বর্গের বিবাহ-সংস্কার-জাত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অসংখ্য শ্রেণীর আত্মীয় এবং আত্মীয়গণের সম্বোধন বা উল্লেখ বা পরিচয় দিবার জন্য প্রত্যেক সভ্য বা অসভ্য সমাজে নানাপ্রকার ভিন্নতা বোধক সম্বন্ধসূচক নামের অস্তিত্ব আছে। যে যে দেশে একান্নবর্ত্তি পরিবারের প্রভাব অধিক, সেই সেই দেশে ঐ সকল সম্বন্ধসূচক নামাবলীর পরিধি অতি দূর বিস্তৃত। শিবসাগর অঞ্চলের অসমীয়া হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যবহৃত ঐ প্রকার নামগুলির [Terms of relationship] একটী তালিকা [নামাবলীর ইংরাজী তালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ হইতে লেখককে প্রদত্ত] নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

1. Relations through the Father.

1. Born of the father's elder wife—ভাই বা ককাই দেউ।
2. " " " " younger wife—ভাই বা ককাই দেউ।
3. Father's elder brother's son—ভাই বা ককাই দেউ।
4. " " " son's wife—ন বৌ বা বৌ দেউ।
5. " elder brother's daughter—বাই বা ভনি।
6. " " " daughter's husband—ভিনিহি বা বৈনাই।

7. Father's younger brother's son—ককাই বা ভাই।
8. „ „ „ daughter—বাই বা ভনি।
9. „ elder sister's son—ককাই বা ভাই।
10. „ „ „ daughter—বাই বা ভনি।
11. „ younger sister's son—ককাই বা ভাই।
12. „ „ „ daughter—বাই বা ভনি।
13. Father [বাবা]—বোপাই, পিতাই বা দেউতা।
14. Step father—দদাই।
15. „ mother [সৎ মা]—মাহি দেউ।
16. Father's elder brother—বর পিতাই বা বর দেউতা।
17. „ younger brother [কাকা বা খুড়া]—দদাই, খুড়া।
18 „ elder brother's wife—বর বৌ বা বর মা।
19. „ younger brother's wife—খুড়ি দেউ।
20. Father's elder sister [বড় পিসি মা]—জেঠাই দেউ।
21. „ „ Sister's husband—জেঠপা।
22. „ *younger' sister* [পিসি]—পেহি দেউ।
23. „ younger sister's husband—পেহি দেউ।
24. Father's father—ককা দেউতা।
25. „ mother—আই দেউতা, বুঢ়ী আই বা আইতা, আবু।
26. Father's father's brother—[দাদামশাই]—ককা দেউতা।
27. „ „ brother's wife—আইতা।
28. „ „ sister—আইতা বা বুঢ়ী আই।
29. „ „ brother's son—ককাই বা ভাই।
30. „ „ daughter—বাই দেউ।
31. „ „ sister's son—দদাই দেউ বা বর পিতা।

32. Father's father's sister's daughter—পেহি দেউ।
33. Father's father's father—আজো ককা দেউতা।
34. „ „ mother—আজো বুঢ়ী আইতা।
35. „ brother's son's son—ভতিজা।
36. „ „ „ wife—ভতিজা বোৱারী।
37. „ „ daughter's son—ভাগিন।
38. Father's brother's daughter's son's wife—ভাগিনা বোৱারী।

II. Relations through the Mother.

1. Mother [মা]—আই বা বৌ।
2. Mother's elder sister—জেঠাই দেউ।
3. „ „ sister' husband—জেঠপহা দেউ।
4. Mother's younger sister [মাসী মা]—মাহি দেউ।
5. „ „ sister's husband—মোহা দেউ।
6. Mother's sister's son—ভাই বা ককাই দেউ।
7. Mother's sister's daughter—বাইদেউ বা ভনি।
8. „ brother [মামা]—মোমাই দেউ।
9. Mother's brother's wife—মাইদেউ বা মামি।
10. „ brother's son—ভাই বা ককাই দেউ।
11. „ „ daughter—বাই দেউ বা ভনি।
12. „ father—ককাই দেউতা।

III. Relations through the Brother and Sister

1. Elder brother [বড় দাদা]—ককাই দেউ।
2. „ brother' swife [বউদিদি]—বোদেউ বা নবৌ।

3. Elder brother son [ভাইপো]—ভতিজা পো।
4. „ „ daughter—ভতিজা জী।
5. Younger brother—ভাই।
9. „ brother's wife—[ভাই] বোৱারী।
7. „ „ son—ভতিজা পো।
8. „ brother's daughter—ভতিজা জী।
9. Sister [বোন]—বাই বা ভনি।
10. Sister's husband [বোনাই]—ভিনিহি বা বেনাই।
11. „ son—ভাগিন।
12. „ daughter—ভাগিনি।
13. Younger brother's son's son—নাতি: লরা।
14. „ „ „ daughter—নাতি ছোৱালি।

IV. Relations through the Wife of a man.

1. Wife [বউ, স্ত্রী]—তিরুতা, ঘৈনিয়েক।
2. Wife's brother [শালা]—জেঠেরি বা খুলখালি।
3. „ brother's wife—বোৱারি বা জে শাহু।
4. „ „ son—ভতিজা পো।
5. „ brother's daughter—ভতিজা জী।
6. „ elder sister—জে শাহু।
7. „ „ sister's husband—শালপতি।
8. Wife's elder sister's son—ভগিনী।
9. „ younger sister [শালী]—খুলখালি।
10. „ „ sister's husband—শালপতি।
11. „ „ son—ভতিজা পো।

12. Wife's younger sister's daughter—ভতিজা জী।
13. „ father [শ্বশুর]—শহুর।
14. Wife's mother [শাশুড়ী]—শাহু।

V. Relations through the Husband of a Woman.

1. Self [মাগ, বউ, স্ত্রী]—ঘৈনীয়েক।
2. Husband [ভাতার]—গিরিয়েক।
3. Husband's other wife—সতিনি।
4. Step son—সতিনি পো।
5. Step daughter—সতিনি জী।
6. Husband's elder brother [ভাসুর]—বরজনাক।
7. „ brother's wife—জাক।
8. „ elder brother's son—ভতিজা পো।
9. „ „ „ daughter—ভতিজা জী।
10. „ younger brother [ঠাকুর পো]—দেওর।
11. „ „ brother's wife—জাক।
12. Husband's younger brother's son—ভতিজা পো।
13. „ „ „ daughter—ভতিজা জী।
14. Husband's sister [ঠাকুর ঝি]—ননদ।
15. „ sister's husband—ননদি জোৱাই।
16. „ „ son—ভতিজা পো।
17. „ „ daughter [ভাগ্নী]—ভতিজা জী।
18. Husband's father—শহুর।
19. „ Mother—শাহু।

VI. Relations through the Son.

1. Son [ছেলে]—পুতেক।
2. Son's wife [বউ মা]—পো বোৱারী।
3. „ wife's father [বেহাই]—বিয়ৈ।
4. „ „ mother—বিয়নি।
5. Son's son—পো-নাতি।
6. „ Son's wife—নাতিনি বোৱারী।
7. „ „ son—আজো নাতি।
8. „ „ daughter—আজো নাতিনি।
9. „ daughter— নাতিনি।
10. Son's daughter's husdand—নাতিনি জোৱাই।
11. „ „ son—আজো নাতি।
12. „ „ daughter—আজো নাতিনি।

VII. Relations through the Daughter.

1. Daughter [মেয়ে]—জীয়েক।
2. „ husband [জামাই]—জোৱাই।
3. Daughter's husband's father—বিয়ৈ।
4. „ „ mother [বেন]—বিয়নি।
5. „ son—নাতি।
6. „ son's wife—নাতি বোৱারী।
7. Daughter's daughter—নাতিনি।
8 „ daughter's husband—নাতিনি জোৱাই।

সমাপ্ত

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতির সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

* নগাঁও জিলার ৺জখলাবন্ধা সত্রের শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী (Pleader) মহোদয়ের প্রতিবাদপত্রখানি বিগত ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার "কায়স্থ সমাজ" পত্রিকায় (পৃঃ ৬০১) তাঁহারই অনুরোধে প্রকাশ করিয়াছি।